সাহিত্য-দীপিকা

কলিকাতা সিটি কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক
শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী, এম-এ

জে, এন, চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, [illegible]

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

মূল্য : সাত টাকা মাত্র।

কৃতী অধ্যাপক শ্রীবিভূতি চৌধুরী

সুহৃদ্বরেষু—

নিবেদন

অনেকদিন হইতেই সাহিত্য-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার ইচ্ছা মনে মনে ছিল। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধু পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় ইচ্ছা ফলপ্রসূ হইল। গ্রন্থ রচনায় ইচ্ছার উদয় হওয়া সহজ, তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা অত্যন্ত দুরূহ। বিশেষতঃ সাহিত্য-তত্ত্বমূলক আদর্শ (standard) গ্রন্থ রচনায় যে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও উদ্যমের প্রয়োজন, তাহাতে তাহাকে দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করার প্রয়াসের সহিত তুলনা করা চলে। সাধ্যাতীত কার্য্যটি যে সম্পন্ন হইল জগজ্জননীর অপরিসীম কৃপাই তাহার কারণ।

এই গ্রন্থে সাহিত্যের বিবিধপ্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। আই-এ, বি-এ, বি,টি ও অন্যান্য উচ্চমানের ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি সতর্কতার সহিত এই বিষয়গুলির অবতারণা করা হইয়াছে : (১) সাহিত্য-প্রসঙ্গ : সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, উপাদান, উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ; (২) কাব্যের ছন্দ : ছন্দের সংজ্ঞার্থ, মূলপ্রয়োজন, ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ ও পরিচয় এবং ছন্দো-বিশ্লেষণ : (৩) সাহিত্যের অলঙ্কার : অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার ও অলঙ্কার-বিচার এবং (৪) ধ্বনিবাদ ও রসতত্ত্ব।

গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় বাঙলা সাহিত্য হইলেও, প্রসঙ্গতঃ সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের বিষয়ও ইহাতে বিচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙলা সাহিত্যের যে তুলনামূলক পাঠক্রম (Comparative study) প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে এই গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। সাধারণ পাঠকও ইহা হইতে সাহিত্যের মূল তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন। ইংরাজিই হউক কিংবা সংস্কৃতই হউক, যেখানে যেখানে গ্রন্থমধ্যে মূলকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সেখানে যথাসম্ভব নিষ্ঠার সহিত মূলের আনুগত্য রক্ষা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি অনেকের নিকট হইতেই নানারূপ সাহায্য পাইয়াছি। তন্মধ্যে সিটি কলেজের সংস্কৃত-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ, এম-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ এবং মণীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক

বন্ধুবর শ্রীশচীনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবিধ জটিল তত্ত্ব ভেদ করিতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি। এই পুস্তকের শব্দ-নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছে আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান সুখেন্দু পুরকায়স্থ (সিটি কলেজ), তাহার ছাত্র-জীবন উজ্জ্বল হউক এবং ভবিষ্যৎ-জীবন কৃতিত্বপূর্ণ হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। গ্রন্থ-রচনার প্রেরণামূল বন্ধুবর পশুপতি চট্টোপাধ্যায়: তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইবার মত ভাষা আমার নাই। গ্রন্থ প্রকাশে শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আগ্রহ, যত্ন ও সতর্কতার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

সিটি কলেজে যোগদান করিবার পর হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীবিভূতি চৌধুরী মহাশয়ের রুচিবোধ, বৈদগ্ধ্য, অমায়িকতা ও সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে: বিমুগ্ধ-প্রীতির স্মারক হিসাবে এই গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছি।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি। গ্রন্থখানি রচনা করিতে দুঃসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। তৎসত্ত্বেও ভ্রম-প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সহৃদয় সুধীবর্গের মিত্রসম্মিত উপদেশ ও নির্দ্দেশ অবশ্যই গৃহীত হইবে এবং বন্ধুভাবে উপদেশ দিয়া তাঁহারা আমাকে কৃতার্থ করিবেন, ইহাই আশা করি। যে ছাত্র-সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া এই পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ রচিত হইল, ইহা দ্বারা তাহারা উপকৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। গ্রন্থোক্ত কোন বিষয়ে কোন ছাত্র জিজ্ঞাসু হইয়া ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইলে বা পত্রদ্বারা জানাইলে, সাধ্যমত সে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে যত্ন করিব।

মহালয়া—১৩৬৪
সিটি কলেজ, কলিকাতা

নিবেদক—
শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥

—চৈতন্য চরিতামৃত

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

মানুষের মনে কৌতূহলের সীমা নাই। তাহার চারিদিকে সৃষ্টির বিচিত্র লীলা, অনন্ত রহস্য—এই দৃশ্যমান জগৎ, এই জীবন্ত মানব-হৃদয়, ওই রহস্য-ঘন অধ্যাত্মলোক। মানুষ এগুলিকে দেখিতে চায়, জানিতে চায়, অনুভব করিতে চায়। এই কৌতূহলবশে মানুষের মনে যে লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন পুঞ্জীভূত হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতি 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা', 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। সাহিত্য বা কাব্য-জিজ্ঞাসারও[১] মূল কৌতূহল।

বহির্জগতের মত কাব্যেরও একটি জগৎ আছে। বহির্বিশ্বের মতই সে জগৎ রূপে, রসে, গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে অতুলনীয়; তাহাও 'বিরাট, বিপুল, বিস্ময় মহান'। মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য এই জগতেরই প্রকাশ। ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা 'রূপকথা'য় ইহাকে রূপ দেন, পাঁচালিকার পয়া'র প্রবন্ধে বা নাচাড়ী ছন্দে ইহাকে রূপায়িত করেন। গ্রাম্য কবির 'পল্লীগীতি', রাখালের 'রাখালিয়া সঙ্গীত', কথকের 'কথকতা', নীতিবিদের 'আর্য্যা', কবির 'তরজা' —এমন কি 'লড়াই' পর্য্যন্ত এই জগতের কথায় পূর্ণ। মানুষ প্রাণ ভরিয়া ইহার রস আস্বাদন করে; আস্বাদন করিয়াও তৃপ্ত হয় না, প্রশ্ন করে, 'কিমিদম্'—ইহা কি?

সাহিত্য কি,—এই প্রশ্নের উত্তরকে এক কথায় কোন সূত্রে অথবা সংজ্ঞায় নিবদ্ধ করা কঠিন। সাহিত্য প্রতিপাদ্য নয়, ইহাকে প্রমাণ করার প্রশ্নও অবান্তর। অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের মত ইহার তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্'—অতএব ব্রহ্মের মতই ইহা 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'। তাহা ছাড়া, সাহিত্যের জগৎটা একজনের সৃষ্টিও নয়; ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্য

১ 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' শব্দ দুইটি ব্যাপকভাবে সমার্থবোধক। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও শব্দ দুইটিকে সমার্থক জ্ঞান করিয়া 'কাব্যাদর্শ' (দণ্ডী) বা 'সাহিত্য-দর্পণ' (বিশ্বনাথ) রচনা করিয়াছেন।

রচিত হয়। ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌ ও রোমান্টিসিজ্‌ম্‌, ভাবতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র, নীতিবাদ ও নেতিবাদ—সব কিছুই সাহিত্যজগতে একস্থানে আসিয়া ভিড় করে। সাহিত্য রচনা ও বিচারের ক্ষেত্রেও নানাপন্থী লোক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বহুবিচিত্র কলতানের মধ্যে ঐকতান, অনেক মতানৈক্যের মধ্যে মতৈক্য আবিষ্কার করা দুরূহ। তথাপি সাহিত্যের সহৃদয় বিচারক ইহারই মধ্যে একটি চিরন্তন সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিতে ব্রতী হন। দুরূহ ব্রতানুষ্ঠানের ফলে এদেশে ও বিদেশে কাব্য-মীমাংসা-বিষয়ক কত গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল আলোচনা হইতে কাব্য কি, সাহিত্য কি—তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

শিল্প ও সাহিত্য

কাব্য-সাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গে ইউরোপে যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিরই আরম্ভ শিল্প বা আর্টের পরীক্ষা লইয়া। 'আর্ট' শব্দটি বহুব্যাপক। স্থূলভাবে তক্ষণ, বয়নশিল্প, মৃন্ময় মূর্ত্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্য—সবই আর্ট। প্রাচীন বাঙলার 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর', ঢাকাই 'মসলিন', কৃষ্ণনগরের ঘট, কালীঘাটের পট, বববুদরের মন্দির, অজন্তার চিত্র, তানসেনের গান, বাল্মীকির রামায়ণ—সবই শিল্পের নিদর্শন। কিন্তু শিল্প হইলেও ইহাদের মধ্যে ইতর-বিশেষ আছে।

যে-কোন সৃষ্টির পশ্চাতেই দুই প্রকারের তাগিদ দেখা যায়: প্রথমতঃ প্রয়োজনের তাগিদ, দ্বিতীয়তঃ আনন্দের তাগিদ। মানুষ যে নৌকা সৃষ্টি করিয়াছে, বস্ত্র প্রস্তুত কবিয়াছে—ইহাদের প্রেরণা-মূল প্রয়োজন। এই প্রকার শিল্প-সৃষ্টিকে বলা হয় কারুকলা (Mechanical Arts); উৎকর্ষ-বিচারে এ-হেন শিল্প-কৃতির স্থান নিম্নে। তক্ষণ, বয়ন প্রভৃতি শিল্প প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জন্য সৃষ্ট বলিয়াই মানুষের উদরের ক্ষুধা মিটাইতে তাহাদের শক্তি ব্যয় হইযা যায। অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে পারে না।

কিন্তু স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্য?- এগুলি মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রেরণায় জন্মলাভ করে না। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া ইহারা হৃদয়ে আনন্দ পরিবেশন করে। এগুলি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের পর্য্যায়ভুক্ত। Oscar Wilde বলিতেন, "The only beautiful things are things that do not concern us"; রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া'। এইরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যের সঙ্গেই

মানুষ অন্তরের যোগ, আনন্দের যোগ অনুভব করে। ইহাদিগকেই বলে চারুশিল্প বা ললিতকলা (Fine Arts)।

চারুশিল্পেরও আবার সূক্ষ্ম বিভাগ আছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া সুন্দরকে বোধগম্য করায়, তাই ইহাদিগকে বলা হয় দৃশ্যশিল্প (Art of tho eye); মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, পাহাড়পুরের ভাস্কর্য্য নয়ন-সুখকর বলিয়াই আনন্দদায়ক। আবার, সঙ্গীত ও সাহিত্যের আনন্দ হৃদয়ে অনুভূত হয় শ্রুতির সাহায্যে। এগুলি নয়ন-বিমোহন নয়, কর্ণামৃত। সঙ্গীত ও সাহিত্যের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করার জন্য, ইহাদিগকে শ্রব্য-শিল্প (Art of the ear) নামে অভিহিত করা হয়।

যাবতীয় শিল্পকলার মধ্যে সাহিত্য শিল্পের শিরোমণি, 'শিল্পশোভার সার'। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত – সকলের সারসমুচ্চয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি। বৈষ্ণব রসসিদ্ধান্তে যেমন ক্রমানুসারে 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়'—এবং 'শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে',—তেমনই অন্যান্য ললিতকলার সমস্ত গুণ সাহিত্যে বর্ত্তমান থাকে। স্থপতি-নির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম্য, ভাস্কর-খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি, চিত্রশিল্পীর রঙীন রূপরেখা, সঙ্গীতের অনির্ব্বচনীয় গতি-সৌন্দর্য্য ধ্বনিযুক্ত শব্দের কৌশলে মুহূর্ত্তমধ্যে সাহিত্যে রূপায়িত হইতে পারে। মনে করি, মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদ-কাননের কথা,—

> 'বৈজয়ন্ত ধাম-সম পুরী,—
> অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
> হীরাচূড়।' (প্রথম সর্গ)

—এখানে স্থপতির স্থপতি-বিদ্যা যেন কয়েকটি মাত্র শব্দাশ্রয়ে অপরূপ স্থাপত্যরূপ লাভ করিয়াছে। শব্দের কৌশলে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে অলিন্দ, স্বর্ণস্তম্ভ, প্রমোদ-ভবনের হীরার চূড়া। কবি শব্দের পর শব্দ গাঁথিয়া এই নয়ন-বিমোহন প্রমোদ-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শব্দমন্ত্রের সহায়তায় সাহিত্য পাষাণ-ফলকে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিকেও রূপ দিতে পারে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ললিতগিরির ভাস্কর্য্য বর্ণনা করিতেছেন,—

> 'দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধ
> সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের
> সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি।' (ললিতগিরি)

—যেন সত্যই কোন ভাস্কর হাতুড়ি বাটালি দিয়া প্রস্তরগাত্রে পৌরুষ-লাবণ্য-দীপ্ত এই পুরুষ-মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছেন।

চিত্রের বর্ণাঢ্য রূপমূর্ত্তিও চিত্রাত্মক শব্দ-সৌন্দর্য্যে সাহিত্যে অঙ্কিত হয়। মনে পড়ে, 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের 'আলেখ্য-দর্শন' অধ্যায়ের কথা। অন্তঃসত্ত্বা সীতার মনোরঞ্জনার্থে চিত্রকর প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী-তটের প্রস্রবণ-গিরির চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ভাষা-চিত্রে সেই চিত্রকে রূপায়িত করিতেছেন,—

> 'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি, এই গিরির শিখরদেশ আকাশ-পথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরপটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'

—এখানে গ্রন্থকার নিজেই চিত্রকরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া শব্দদ্বারা চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এ যেন, একটি আলেখ্যের আর একটি আলেখ্য। অঙ্কিত চিত্রের প্রস্রবণ-গিরি, কৃষ্ণ মেঘের গাঢ় নীলিমা, এমন কি সঞ্চরমাণ জলধর ও গোদাবরী-তরঙ্গের প্রবল বেগ পর্য্যন্ত শব্দ-কৌশলে রঙে, রেখায়, গতিতে জীবন্ত হইয়া উঠিযাছে।

সঙ্গীতের অধরা সুষমাও সাহিত্যে বিধৃত হয়। সুরের মোহময় আবেশ সৃষ্টি করিয়া ছন্দের স্পন্দনে সঙ্গীত কথাতীত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ব্যক্ত করে; ধ্বনির ব্যঞ্জনা, স্বরের উত্থান-পতন বাচ্যাতিরিক্ত ভাবকে হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সঙ্গীতের 'বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর' ঝঙ্কারে চিত্ত তন্ময় হইয়া যায়। সঙ্গীতের এই অদ্ভুত ক্ষমতা সাহিত্যেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সঙ্গীতধর্ম্মী সাহিত্য 'বিশ্বপ্লাবিনা অমৃতউৎসধারায়' হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করে। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' সঙ্গীতের মতই উপভোগ্য। সঙ্গীতের দ্রুত অথবা ধীর লয়, উদারা-মুদারা-তারা গ্রামের স্বর কি ভাবে কাব্যের ছন্দপ্রবাহে সঞ্চরণ করে, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি তাহার প্রমাণ,—

> 'নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে। যথা,—

মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে,
সরিৎ প্রবাহিল সঙ্গীত বাদনে,
রুণুরুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।

আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে, তখন কবির ভাষাও সেই সপ্তমের অনুকরণ করিতেছে,—

'ক্রমে গুরুগর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া।' ১

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিল্পকলার মধ্যে সাহিত্যই 'শিল্পশোভার সার'। সাহিত্য একাধারে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র ও সঙ্গীতের গুণ-বিশিষ্ট। কতকগুলি শব্দমাত্র অবলম্বন করিয়া সাহিত্য কারুকলা অথবা চারুকলার যে-কোন সৌন্দর্য্য-সুষমাকে রূপায়িত করিতে পারে। আর্টের জগতে কাব্য-সাহিত্য সার্ব্বভৌম সম্রাট। এই সাহিত্য কি?

২

সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটি সূত্রে সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা সহজ নয়, কারণ, 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'। দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সাহিত্যের নির্ব্বচন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, কালে কালে ইহার বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি। বৈদিক যুগের সাহিত্য হইতে বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাব ও রূপ পৃথক; বিদেশের সাহিত্য হইতে এদেশের সাহিত্যের ধারা স্বতন্ত্র। সাহিত্যের জগতে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হয় নাই, হইবেও না, হওয়া উচিতও নয়।

তথাপি প্রতি দেশের সাহিত্যে, প্রত্যেক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা গিয়াছে। এই সাধারণ লক্ষণ ধরিয়া সাহিত্যের বিচারকবৃন্দ সাহিত্যের চিরন্তন স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞার্থের উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

---

১ 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধ—সমালোচনা সংগ্রহ (কঃ বিঃ); প্রবন্ধটি কবি হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা; সমালোচকের নাম অজ্ঞাত।

[ক] পাশ্চাত্ত্য মত

পাশ্চাত্ত্য-জগতে কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে গ্রীক দার্শনিক Plato-Aristotle-এর যুগ হইতে। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই দুইজন মনীষী শিল্প-কৃতির যে নির্ব্বচন নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, প্রতীচ্যের পরবর্ত্তী প্রায় সকল আলোচনাই তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগধর্ম্ম অনুসারে সংজ্ঞার্থের ভাষা রূপান্তরিত বা প্রসাধিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু মূল বক্তব্য সর্ব্বত্রই প্রায় এক প্রকার। কেবল ইউরোপে কেন, বাঙলা দেশেরও আধুনিক সাহিত্যালোচনার আসরে Plato-Aristotle-এর উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। Plato বলেন, আর্ট বস্তুসত্যের অনুকৃতি। জগতে ও জীবনে যাহা ঘটে, তাহাই 'সত্য'। এই সত্যের মধ্যে যাহা মহৎ, যাহা নীতিসম্মত, যাহা কল্যাণকর, যাহা পরম সুন্দর ও আদর্শের দ্যোতক —তাহার প্রতিকৃতিই শিল্প বা সাহিত্য। সাহিত্য 'সত্যের আর্শি'। কিন্তু তৎকালপ্রচলিত গ্রীক-সাহিত্যে Plato নিজ-অভিপ্রেত এই সত্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার বিখ্যাত Republic গ্রন্থে কবিদের বিরুদ্ধে সুতীব্র অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ রাষ্ট্রচেতনাদ্বারা পরিচালিত হওয়াতে সাহিত্যকে রাষ্ট্রের অনুগত ভাবিয়া Plato ইহাকে বস্তুসত্যের প্রতিকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সাহিত্য সুন্দর শিবময় সত্যের প্রতিরূপ।

মনীষী Aristotle, Plato-র শিষ্য। তিনি তাঁহার বিখ্যাত Poetics গ্রন্থে আর্ট তথা সাহিত্য সম্পর্কে সুচিন্তিত মতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। Aristotle মনে করেন, আর্টমাত্রই অনুকরণ (Imitation) :

> Epic and tragic composition, also comedy. The writing of dithyrambs *, and most branches of flute and harp-playing, are all, if looked as a whole, imitation. †

অনুকরণ-প্রবৃত্তি জীবের সহজাত আদিমতম প্রবৃত্তি। মানুষের মধ্যেই অনুকরণের প্রবৃত্তি প্রবলতম, man is the most imitative ; অনুকরণে

*. Dithyrambs = A hymn connected with the worship of Bacchus.
†. Poetics (Translated by E. S. Bouchier).

তাহার যেমন প্রবল ঝোঁক, তেমনই আনন্দ। অনুকরণের প্রবৃত্তিবশেই মানুষ শৈশব হইতে মাতাপিতার আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়, ভাষা শিক্ষা করে। শিল্পকর্ম্ম এই অনুকৃতির ফল। সহজাত অনুকরণ-বৃত্তির প্রেরণায় শিল্পী তাঁহার শিল্পকর্ম্মে বস্তুবিশ্বের বর্ণ, সঙ্গীত, ছন্দ ও ভাষাকে অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই Aristotle-এর অভিমত।

Plato ও Aristotle উভয়েই আর্টকে অনুকরণাত্মক বলিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল 'Truth' কথাটির বোঝাপড়া লইয়া। কাব্য যে কবির 'সৃষ্টি', Plato সে-বিষয় লক্ষ্য না করিয়া কাব্যকে হুবহু 'বস্তুগত সত্যের প্রতিলিপি' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।. Aristotle সেখানে বলিয়াছেন,—

> It is not the poet's function to tell of real events, but of such as might happen, and of things possible, according to probability or necessity. ‡

অতএব Aristotle-এর মতে, কাব্যসাহিত্য বস্তুগত সত্য নয়, সম্ভাব্যসত্যের অনুকৃতি। বস্তুসত্য বা তথ্যগত সত্য ইতিহাসের বিষয়; সাহিত্যের 'সত্য' ইহা হইতে পৃথক। যে 'সত্য' ঘটে নাই, কিন্তু ঘটিতে পারিত, সেই 'সত্য'ই সাহিত্যের 'সত্য'। সাহিত্যের 'সত্য' (Literary truth) ইতিহাসের 'সত্য' (facts) হইতেও অধিকতর সত্য :

'Poetry is more philosophical and higher than history.'

Plato এবং Aristotle প্রচারিত, বিশেষ করিয়া Aristotle-এর নির্দ্দেশিত সাহিত্যের সংজ্ঞার্থই বহুদিন পর্য্যন্ত ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। সাহিত্য সত্যের অনুকৃতি—এই নির্ব্বচনটি প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই 'সত্য' তথ্যগত সত্য, না অন্য কিছু—ইহাই ছিল বিতর্কের বিষয়। সাহিত্য-সৃষ্টি যে একটা মানস-ব্যাপার, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। Aristotle-এর 'সম্ভাব্য সত্য' কথাটির মধ্যে মনন-ক্রিয়ার ইঙ্গিত থাকিলেও, তিনিও স্পষ্টভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উল্লেখ করেন নাই। তাহা করিবার কথাও নয়, কারণ, মনস্তত্ত্বের নিরীখে মানুষের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে রেণেসাঁর যুগ (Age of Renaissance) হইতে। রেণেসাঁর মধ্যে ইউরোপের পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়াছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া জগৎ-সন্দর্শন, নূতন চিন্তার আলোকে বস্তুর

‡. Ibid.

বিচার, নূতন বুদ্ধির দীপ্তিতে সৃষ্টির বিশ্লেষণ—রেণেসাঁর ফল। নবলব্ধ জ্ঞানের পথে নব নব অনুসন্ধিৎসা ইউরোপীয় জীবনের মর্ম্মমূলে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অনুসন্ধিৎসা ইউরোপকে যেমন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে, নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে প্রেরণা দিয়াছিল, তেমনই আবার নব পদ্ধতিতে মানুষের মনকে বিশ্লেষণ ও আবিষ্কার করারও অদ্ভুত প্রেরণা দিয়াছিল। Descartes, Hobbes, Locke প্রভৃতির রচনাবলী তাহার নিদর্শন।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ধারায় সাহিত্যকে নূতন করিয়া বিচার করিবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতে সাহিত্যের একটি নবতর সংজ্ঞার্থ পাওয়া গেল সুধী সমালোচক Addison-এর আলোচনায়। তিনি ছিলেন 'Spectator' নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। ইহাতেই তাঁহার 'Essay on the Pleasures of Imagination' নামক প্রখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি শিল্প-সাহিত্যকে 'Pleasures of Imagination' বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, স্মরণ-মনন, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনা এক মনেরই বিভিন্ন ক্রিয়া। মানসিক কল্পনার সাহায্যেই শিল্পী শিল্প-সৃষ্টি করেন, মানসিক কল্পনার দ্বারাই দর্শক সেই সৃষ্ট শিল্প হইতে আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব শ্রেষ্ঠ শিল্প বা সাহিত্য কল্পনার আনন্দ-বিধায়ক ঃ

> 'The talent of affecting the Imagination is the very life and highest perfection of poetry.'

Addison-এর এই সিদ্ধান্ত তৎকালীন 'Doctrine of association of ideas'—মনোবিশ্লেষণের এই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনঃসমীক্ষার পট-ভূমিকায় সাহিত্যের এই সংজ্ঞার্থটি আধুনিক সাহিত্যালোচনার নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

Addison-এর মতবাদকে ভিত্তি করিয়া ইউরোপে ইহার পরে ক্ষুদ্র, বৃহৎ অনেক সাহিত্যিক নির্ব্বচন নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নাই। অভিনবত্ব দেখা দিয়াছে ফরাসী-বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে। রেণেসাঁর মত ফরাসী-বিপ্লবও ইউরোপের মর্ম্মমূল আন্দোলিত করিয়াছিল। ধর্ম্মের গোঁড়ামি, রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার ও অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচারের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া এই বিপ্লব পীড়িত মানুষের জীবনে মুক্তির প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া ইহা মানুষের অধিকার সম্পর্কে

মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য এই বিপ্লবের খারাপ দিকও ছিল, কিন্তু ইহার ভাল দিকটি উপেক্ষণীয় নয়। ফরাসী-বিপ্লব হইতেই ইউরোপে মানব-অধিকারবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া দরিদ্র, শোষিত মানুষের মর্য্যাদা স্বীকৃত হইযাছে।

মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার এবং রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষেরই সৃষ্ট কতকগুলি চুক্তির অধীন—ফরাসী-বিপ্লববাদের এই মূলমন্ত্রগুলি, কেবলমাত্র ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন সূচনা করিযাছিল। সাহিত্যের বিচারকবৃন্দ বুঝিয়াছিলেন, সাহিত্য একদিকে যেমন লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, অপরদিকে লেখকও তেমনই যুগচেতনার অধীন। শিল্প শিল্পীসত্তার অভিক্ষেপ (Projection of self), শিল্পকর্ম্ম যুগ-জীবনের প্রতিলিপি (Transcript of the contemporary societies); সাহিত্য কোনক্রমেই যুগের ধারাকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিশেষ যুগের ভাবরূপ উপাদান লইয়াই শিল্পীকে শিল্পরচনায় অগ্রসর হইতে হয়। সর্ব্বোপরি উপায় যাহাই হউক, সাহিত্য জীবনকেই প্রকাশ করে, কোন-না-কোন ভাবে ইহা জীবনেরই সমালোচনা করিয়া থাকে।

সাহিত্য-সৃষ্টিতে জীবন-সমালোচনের এই প্রাধান্য অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সমালোচক Matthew Arnold-প্রদত্ত সাহিত্যের সংজ্ঞার্থে। Arnold গতানুগতিক পদ্ধতিতে সাহিত্য সমালোচনায় ব্রতী না হইয়া, বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন কবির কাব্যালোচনা করিতে করিতে সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন, সাহিত্যের মধ্যে যুগপৎ কবির ব্যক্তিত্ব (Personality) এবং যুগধর্ম্ম প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেন,

> 'For the creation of a master-work of literature two powers must concur, the power of the man and the power of the moment and the man is not enough without the power of the moment.'*

সাহিত্য-সম্পর্কে Arnold সুতীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ সংহত একটি সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: উক্তিটি নানাদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মতে,

> 'It is important, therefore, to hold fast to this : That poetry is at bottom a criticism of life; that greatness

*. **Function of criticism at present time (Essays in Criticism)**

of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life—to the question how to live .' †

এই প্রসঙ্গে বিশ্রুত সমালোচক Ruskin-এর নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আর্ট-সমালোচনা 'Modern painters', সমালোচনার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার মতে, মানব-মনই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। মানুষের মন এবং তাঁহার আশা-কামনাকে (human passion and human hopes) রূপায়িত করাই শিল্পের লক্ষ্য। যে শিল্প বিপুল আনন্দসঞ্চার করে বা প্রচুর শিক্ষাদান করে, তাহাকে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্প বলেন না। তাঁহার মতে, যে শিল্পকৃতি দর্শকদের হৃদয়ে অধিক সংখ্যক ভাব (greatest number of greatest ideas) উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ শিল্প। এই প্রকার আর্টের মূল্য অসাধারণ, শক্তিও অপরিমেয়।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবন-জিজ্ঞাসার প্রাধান্য সূচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর উপরে সমাজ ও রাষ্ট্রগত কতকগুলি গুরু দায়িত্বও আরোপিত হইয়াছিল। অতিমাত্রিক রাজনৈতিক ও বস্তুচেতনা ছিল এই বিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্টতা: বিশেষজ্ঞগণ বলেন, The French Revolution took a political and practical character (Arnold).

ইহার প্রতিক্রিয়ায় একশ্রেণীর লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রগত যে-কোন দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া ইঁহারা সাহিত্যে নির্বাধ মুক্তি ও অবাধ কল্পনার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং ঘোষণা করেন, 'Freedom of Art'—এই নীতি। Oscar Wilde, Swinburne প্রমুখ শক্তিশালী লেখকবৃন্দ প্রচার করিলেন, সাহিত্যের কোন বাঁধাধরা লক্ষ্য নাই, সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, 'Art for art's sake' ; সাহিত্য বা শিল্প নীতি, কল্যাণ, ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন দায়িত্বই পালন করে না, নিছক রসসৃষ্টিই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাহিত্যের এই সংজ্ঞার্থটি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বিপুল উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতা হইতে সাহিত্যের আরও একটি সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হইয়াছে। মাত্রাতিরিক্ত বাস্তববোধ (Sense of fact)--ইহার মূল। বিপ্লবের ব্যর্থ পরিণামও ইহার অন্যতম কারণ। যে পরিপূর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠার আশায়,

† **Essays in Criticism II.**

একটি নূতন জগতের স্বপ্নে ফরাসীবিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, বিপ্লব সে আশাকে পূর্ণ করিতে পারে নাই। 'মরণের মুখে মারণের বাণী' ছিল এই বিপ্লবযজ্ঞের মূলমন্ত্র। এ বিপ্লব অনেক কিছু ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে নাই, তাই ইহার পরিণামে জাগ্রত হইয়াছে—ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, ক্ষুব্ধতা। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ইহার প্রতিফলন দেখা দিয়াছে নগ্ন বাস্তব-বোধের রূপায়ণে। কতিপয় শিল্পী মানবজীবনের নগ্নতা, কদর্য্য কামনা ও আসঙ্গলিপ্সাকে বাস্তবতার চূড়ান্ত মনে করিয়া সাহিত্যে বস্তুপরতন্ত্রতার কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্য নগ্ন বাস্তবের রূপায়ণ।

সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিতে যাইয়া ইউরোপের অধিকাংশ লেখক সত্য (Truth), জীবন (Life), বস্তু (Matter) কথাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। Plato-Aristotle হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের সমালোচক পর্য্যন্ত সকলেই 'বস্তু'র মহিমাকে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা Art for art's sake-নীতি প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বাস্তববোধ (Sense of fact) ক্রিয়াশীল। ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গীই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এইজন্য বস্তুকে কেন্দ্র করিযাই তাঁহাদের আর্ট-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাস্তবই তাঁহাদের নিকট সত্য (Truth); এই সত্যই সুন্দর, ইহারই রূপমূর্ত্তি শিল্প বা সাহিত্য। অবশ্য অত্যধিক বস্তুপরতন্ত্রতার মোহে কোন কোন সাহিত্যিক বস্তুর কদর্য্য দিকটাই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সুন্দরের পূজারী শিল্পী বস্তুর মধ্যেই সত্য এবং সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক Keats অনবদ্য ভাষায় সত্যের এই সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিকে রূপ দিয়াছেন :

> Beauty is truth, truth beauty,—that is all
> Ye know on earth, and all ye need to know.

সত্যের রূপমূর্ত্তি এই যে সুন্দর—ইহার প্রকাশই সাহিত্য, ইহাই চিরন্তন আনন্দের উৎস। Keats বলেন, 'A thing of beauty is a joy for ever.'

আর্ট যে সুন্দরেরই প্রকাশ—এই মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ইতালীয় দার্শনিক Benedetto Croce-এর দান অসামান্য। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Æsthetic*; এই গ্রন্থে সৌন্দর্য্যবোধের ভিত্তিতে তিনি ললিতকলা বা আর্টের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্ট ও সুন্দর হরিহরাত্মা, আর্ট সুন্দরেরই অভিব্যক্তি।

এই সুন্দর কি? একটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত বাক্যে Croce 'সুন্দরে'র সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, 'Beauty is expression'; কিন্তু expression বলিতে যে স্থূল প্রকাশ বুঝায়, তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করেন নাই। তিনি বলেন, মানুষের জানার ক্রিয়া দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়: প্রথমতঃ মানুষ মন দিয়া অনুভব করে, ইহাকে বলা যায় অনুভূতি বা আত্মাববোধ (Intuitive knowledge), তারপর মানুষ জানে বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি-তর্ক দিয়া—তাহাকে বলে অবগতি (Logical knowledge): প্রথম প্রকারের জানার ক্রিয়া হইতে জ্ঞাতার মানসপটে বিচার-নিরপেক্ষ যে প্রতিচ্ছায়া পড়ে, তাহা চিচ্ছায়া বা Image; এই চিচ্ছায়াই বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের দ্যোতক, তাই ইহা সুন্দর (Beauty):

> Beauty is the mental formation of an image (or a series of images) that catches the essence of the thing perceived. Beauty rather belongs to the inward image than to the outward form in which it is embodied. *

বুদ্ধিতে স্থূলরূপ গ্রহণের পূর্ব্বে দ্রষ্টার মানসপটে সুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি যে চিচ্ছায়ার উদ্ভব হয়, তাহা অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ-ব্যঞ্জনাময়। Croce তাই বলেন, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি অবিচ্ছেদ্য; আত্মাববোধের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার প্রকাশ-ধর্ম্মিতা আত্মপ্রকাশ করে:

> Every true intuition is expression.·· ···To no intuition expression is wanting, because it is an inseparable part of intuition. †

এইভাবে Croce প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'Beauty is expression'—তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্বে Intuition (অনুভূতি), Image (চিচ্ছায়া), Expression (প্রকাশ) এবং Beauty (সুন্দর) এক হইয়া গিয়াছে। আর্টকেও তিনি সুন্দরের সহিত এক করিয়া দেখিয়াছেন, কারণ সুন্দরের অভিব্যঞ্জক চিচ্ছায়াই শিল্প-নির্ম্মিতির প্রধান অবলম্বন। তাই Croce বলেন,

> Art is ruled uniquely by imagination. Images are its only wealth.

আর্টের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এইরূপে ইউরোপে সাহিত্যের সংখ্যাহীন সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

---

* *Benedetto Croce*—Will Durant † *Æsthetic*

[খ] সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মত

ইউরোপে যেমন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পণ্ডিত সাহিত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন যুগে কাব্য-সাহিত্য বিচার করিয়া ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট ভারতীয় সমাজে সাহিত্য-সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের অভিমতই অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। আমরা Aristotle, Arnold, Croce—প্রভৃতির মতবাদের সহিত বেশি পরিচিত। তাঁহাদের বিচারপন্থাতেই আমরা সাহিত্য বিচার করিয়া থাকি এবং যে সাহিত্য সেইরূপ বিচারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করি। ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত নিবিড় পরিচয় না থাকার জন্যই এই প্রমাদ। সাহিত্য সম্পর্কে ভারতীয় মনীষীবৃন্দ যে সকল সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের যে-কোন কাব্য-বিচারে তাহা গ্রহণীয়।

'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা আচার্য্য ভরত ভারতীয় আলঙ্কারিকদের আদিগুরু। তিনি বৈদিক ঋষির মর্য্যাদায় ভূষিত, কারণ, ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' এদেশীয়দের মতে একপ্রকার বেদ, তাহার নাম গান্ধর্ব্ববেদ। এই বেদের ঋষি আচার্য্য ভরত। প্রধানতঃ নাট্যকে অবলম্বন করিলেও, তিনি তাঁহার 'নাট্য-শাস্ত্রে' প্রসঙ্গতঃ শ্রব্যকাব্যের বিষয়ও আলোচনা করিয়াছেন। যে রসতত্ত্ব এদেশে কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতত্ত্বরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, আচার্য্য ভরত সেই রস-প্রস্থানের প্রবর্ত্তক। রসকেই তিনি সাহিত্য-বৃক্ষের বীজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

> যথা বীজাদ্ ভবেদ্‌বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
> তথা মূলং রসাঃ সর্ব্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥[১]

—বীজ হইতে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি, বৃক্ষ হইতে ফুল-ফলের উদ্ভব, তেমনই রসবীজ হইতেই কাব্যের উৎপত্তি, এই কাব্যের ফুল-ফল (ভাব, অলঙ্কার প্রভৃতি) এই রসেরই স্ফূর্ত্তি।

---

১ নাট্যশাস্ত্র—৬ষ্ঠ অধ্যায়

আচার্য্য ভরত কাব্যের মূলীভূত তত্ত্বরূপে 'রস'কে প্রধান আসন দিলেও, কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিধায়ক অলঙ্কার, গুণ, রীতি প্রভৃতির কথাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রসসৃষ্টির তুলনায় এ সকলই বাহ্য, রস ব্যতীত অন্য সবই অর্থহীন। এমন কি তিনি বলেন, রস ব্যতীত কোনও অর্থের প্রবর্ত্তনাও সম্ভব হয় না—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে।' কাব্যে রসতত্ত্বের এই প্রাধান্যকে ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তীকালে বহু আচার্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আচার্য্য বিশ্বনাথ প্রণীত 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—কাব্যের এই বহুব্যবহৃত নির্ব্বচনটি আচার্য্য বিশ্বনাথেরই রচনা।

এদেশে কাব্যের এই সংজ্ঞার্থটিই প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। যে-কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া ভারতীয় ঋষিগণ বিষয়টির মূলকেই অনুসন্ধান করিয়াছেন। আত্মানুসন্ধিৎসাই ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা। কাব্যের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়াও বাক্যরূপ কাব্যের আত্মাই এদেশের গবেষণার প্রধান বিষয় হইয়াছে। আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া অবশ্য কোন কোন আচার্য্য দেহকেও অস্বীকার করেন নাই। যেমন ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিষয়ে দেহবাদ আলোচনার বিষয়ীভূত হইযাছে, তেমনই কাব্য-জিজ্ঞাসার বিষয়েও কোন কোন পণ্ডিত কাব্য-দেহের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কাব্যের আত্মা রস, কিন্তু যে রসাত্মক বাক্য বা বাক্যসমষ্টি লইয়া এই রস-প্রতীতি হয়, তাহা কতগুলি শব্দার্থময় পদ। শব্দার্থময় এই পদগুলিকে পৃথক করিয়া লইলে রসেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। চার্ব্বাক দর্শনকেও যেমন আমরা হাসিযা উপেক্ষা করিতে পারি না, কাব্যবিচারে এই মতবাদকেও তেমনই উপেক্ষা করা যায় না।

আচার্য্য ভামহ (সপ্তম শতাব্দীর আলঙ্কারিক) তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের রাজযোটককেই কাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, 'শব্দার্থে ৌ সহিতৌ কাব্যম্।' শব্দার্থময় বাক্যকে কাব্যসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া তিনি কাব্যরচনায় অলঙ্কারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। অলঙ্কার-প্রস্থানের প্রবর্ত্তক হিসাবে ভামহের নাম বিখ্যাত। তিনি বলেন, সুন্দর হইলেও, অলঙ্কার ব্যতীত প্রেয়সীর মুখখানিও শোভাকর বলিয়া মনে হয় না,—'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বণিতামুখম্।' তাঁহার মতে 'রস'ও কাব্যের অলঙ্কার। কাব্যই একমাত্র অলঙ্কার্য্য: অলঙ্কারের যোগ-হেতুই কাব্যের কাব্যত্ব।

'কাব্যাদর্শ' প্রণেতা আচার্য্য দণ্ডীও অলঙ্কার-প্রস্থানের সমর্থক। অভীষ্ট অর্থসমন্বিত পদসমুচ্চয়কেই তিনি কাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'শরীরং তাবদিষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।' ১

শব্দ ও অর্থ—এই দুইটি কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইলেও, ইহা যে কাব্যের আত্মা নয়, বহিরঙ্গ—একথাটি অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শব্দার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া যে-সকল কাব্য-সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছিল, কালক্রমে অনেকেই তাহা সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, অলঙ্কার কাব্যের আত্মা নয়, গূঢ়তর অন্য কিছু কাব্যের আত্মা। অলঙ্কার ব্যতীত কাব্যের অন্য কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'কাব্যালঙ্কার সূত্র' প্রণেতা আচার্য্য বামন বিখ্যাত। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, অলঙ্কার দ্বারাই কাব্য গ্রাহ্য হয় বটে, কিন্তু এই অলঙ্কার বহিঃশোভা-কর উপমা, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার নয়। তিনি বলিলেন, সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার —'সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ'। সৌন্দর্য্যই কাব্যের অঙ্গীভূত রূপলাবণ্য; বাইরের ভূষণ (উপমাদি অলঙ্কার) সেই সৌন্দর্য্যের শোভাবর্দ্ধকমাত্র। কারণ, নারীদেহের লাবণ্য যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহাতে নয়নবিমোহন অলঙ্কার যোগ করিলেও কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। লাবণ্যই দেহের আত্মা। কাব্য-দেহের আত্মা কি? আচার্য্য বামন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন, মাধুর্য্যাদি 'গুণ'গুলিই কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের দ্যোতক, ইহাই কাব্যের আন্তর ধর্ম্ম অথবা স্বরূপ। এই 'গুণ' পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই প্রকট হয়। তাই বামন বলিলেন, গুণাত্মক যে বিশিষ্টা পদরচনা, তাহাই কাব্যের আত্মা অর্থাৎ 'রীতি'ই কাব্যের আত্মা:

রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।
বিশেষো গুণাত্মা। ২

বক্রোক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য কুন্তক 'রীতি' কথাটিকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 'বক্রোক্তি'ই যে কাব্যের আত্মা, এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তি জীবিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। কুন্তক মনে করেন, রীতি কেবলমাত্র শব্দ ও অর্থের সমাবেশে গড়িয়া উঠে না, কোন স্থানের সঙ্কীর্ণ সীমাতেও ইহা সীমাবদ্ধ নয়। কবির স্বভাবেই রীতির জন্ম। এইজন্যই উত্তম

১ কাব্যাদর্শ, ১/১০
২ কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি ১।২।৬, ৭, ৮

কবিগণের প্রত্যেকের রীতিই সমান রমণীয়। তাঁহার মতে বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ, 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'। বক্রোক্তির সহিত যুক্ত না হইলে অলঙ্কার, রীতি, রস, কোন কিছুই সার্থক নয়। এক বক্রোক্তির মধ্যেই সকল কিছু বর্ত্তমান—অতএব বক্রোক্তিই কাব্যের সর্ব্বস্ব : বক্রোক্তিই অলঙ্কার, বক্রোক্তিই উত্তম রীতি : রসও এই বক্রোক্তিকেই উপভোগ্য করিয়া তুলে। এই বক্রোক্তি কি ? কুন্তক বলেন, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গিমাময় উক্তিই বক্রোক্তি :

বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে। ৩

এই বক্রোক্তিই সৌন্দর্য্যের নিদান, কাব্যের প্রাণ : তাই কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কুন্তক বলিলেন :

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥ ৪

—'সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনা-বন্ধে বিন্যস্ত হইলে কাব্য হইয়া থাকে।' (ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত)

বিস্তীর্ণ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'ধ্বন্যালোক'। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানির দান অসামান্য। অধ্যাপক কাণে বলেন, 'The Dhvanyaloka is an epoch making work in the History of Alankara Literature.'—উক্তিটি প্রণিধেয়। এই ধ্বন্যালোক গ্রন্থের মূল কারিকার রচয়িতা কে, তাহা আজিও নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হয় নাই। সমগ্র 'ধ্বন্যালোক' বলিতে বুঝায় (১) কতিপয় কারিকা (২) তাহার 'বৃত্তি' ও (৩) 'লোচন' নামক টীকা। বৃত্তির রচয়িতা আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন। কেহ কেহ তাঁহাকেই কারিকার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। 'লোচন' টীকার রচয়িতা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মধ্যমণি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত।

ধ্বনিই কাব্যের আত্মা—ইহাই ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ধ্বন্যালোকের কারিকা, তাহার বৃত্তি (আনন্দ বর্দ্ধন) এবং লোচন টীকা (অভিনব গুপ্ত)—এই ত্রয়ী ধ্বনিবাদের ত্রিবেণী-সঙ্গম। কথিত আছে, ত্রিবেণী-সঙ্গম তীর্থেই ধন্বন্তরী সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃতভাণ্ড কক্ষে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রালোচনার মন্থনোদ্ভূত অমৃত—ধ্বনিবাদের

---

৩ বক্রোক্তি জীবিত। ৪ বক্রোক্তি জীবিত, ১।৭।

এই ত্রিবেণীসঙ্গম হইতেই উদ্ভূত। কাব্য কি, কাব্যের আত্মা কি—এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ধ্বনিবাদীরা যে সকল উক্তি করিয়াছেন, কাব্য বিচার সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উক্তি আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আচার্য্য অতুল গুপ্তও বলেন, 'কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনো দেশে কোনো কালে আর কেউ বলেনি।' [১]

কাব্যের আত্মা রস—এই সিদ্ধান্তকে পুরোভাগে রাখিয়াই ধ্বনিবাদের সমর্থক আচার্য্যগণ কাব্যের চিরন্তন সংজ্ঞার্থ নিরূপণে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, কাব্যের আত্মা শব্দও নয়, অর্থও নয়, অলঙ্কারও নয়, রীতিও নয়—এ সকলের অতিরিক্ত অন্য কিছু। কটক-কুণ্ডলাদি অলঙ্কার পৃথক করিয়া লইলেও নারীদেহের লাবণ্য নষ্ট হয় না। লাবণ্য নিজের প্রভায় নিজেই ঝলমল করে। এই লাবণ্যই সৌন্দর্য্যের সারভূত আত্মা। শব্দার্থযুক্ত কাব্যশরীরেও তেমনই উপমা-রূপকাদি অলঙ্কার ব্যতিরিক্ত একটি লাবণ্য আছে। অলঙ্কার ছাড়াও তাহা দীপ্তিমান। এই লাবণ্যই শব্দার্থযুক্ত কাব্যদেহের কান্তি, সারভূত সৌন্দর্য্য :

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়ব্যতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥ [২]

—মহাকবিদের কাব্যে দেহাতিরিক্ত অন্য একটি প্রতীযমান বস্তু থাকে। ইহা অঙ্গনাদেহের লাবণ্যের মতই কাব্যায়বে ঝলমল করে।

এই যে অতিরিক্ত বস্তু, এই যে কাব্যের কান্তি বা লাবণ্য—ইহা কি?—ধ্বনিবাদীরা বলেন, ইহা 'ধ্বনি'। ইহা অলঙ্কার নয়, গুণ নয়। শব্দ ও অর্থ নিজ নিজ প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া বাচ্যাতিরিক্ত যে প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই 'ধ্বনি' :

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জ্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥ [৩]

বস্তুতঃ ব্যঙ্গার্থই 'ধ্বনি'। বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়াই ব্যঙ্গার্থ সূচিত হয়। বাচ্যার্থ অবলম্বন করিয়াও যখন ইহা বাচ্যার্থ হইতে প্রধান হইয়া উঠে, তখনই তাহা হয় 'ধ্বনি'। ইহা যেন দীপশিখা হইতে বিচ্ছুরিত দীপ্তিবিশেষ। ধ্বনি কাব্যের ব্যঞ্জনা, একটা আভাস। এই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা,—'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিরিতি'।

১ কাব্যজিজ্ঞাসা (ধ্বনি)। ২ ধ্বন্যালোক ১/৪। ৩ ধ্বন্যালোক ১/১৩।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' টীকায় এই 'ধ্বনি'র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ধ্বনিবাদীরাও রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। রস কাব্যের আত্মা, ধ্বনি তাহার প্রকাশ। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন—ধ্বনিই রস: রসেই ধ্বনির পর্য্যবসান, রসেই ধ্বনির বিশ্রাম। যেমন শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন, যেমন সূর্য্য আর সূর্য্যরশ্মি অভিন্ন, তেমনই রস ও ধ্বনি একাত্ম। তাই অভিনবগুপ্ত শ্রেষ্ঠ ধ্বনির নাম দিলেন 'রসধ্বনি'। বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া সোজা ব্যঙ্গার্থের অভিব্যঞ্জনা দ্বারা ইহা রসরূপে স্ফূর্ত্ত হয়। এই রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা,—'রসধ্বনে এব সর্ব্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বম্।' (অভিনবগুপ্ত)। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় ইহাই ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের চূড়ান্ত কথা।

ভারতীয় আচার্য্যগণ নিরূপিত কাব্যের সংজ্ঞার্থকে কেহ কেহ বিশিষ্ট দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ মত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং আধুনিক-কালের জটিল জীবন-বোধ-মূলক কাব্য-বিচারে তাহাকে অবান্তর বলিয়া মনে করেন। ইহা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কাব্যের আত্মা অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি বা রস বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই জীবনদ্রষ্টা কবি বা দার্শনিক। কপোল-কল্পনা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণদ্বারাই তাঁহারা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোনরূপ সংস্কার-দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, বিচারের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে বলিতে হইবে, প্রাচীন ভারতীয় আচার্য্যগণ সাহিত্যের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের চিরন্তন সাহিত্যের স্বরূপ। তাঁহাদের নিরূপিত সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ অভ্রান্ত। যে-কোন দেশের যে-কোন কালের সৎসাহিত্যের প্রতি ইহা প্রযোজ্য।

[গ] বঙ্গীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের মত

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য বা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া যে 'রসকে' কাব্যের আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, বাঙলা দেশের কাব্য রচনায় কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত, এমন কি মধুসূদনের যুগ পর্য্যন্তও সেই রসসৃষ্টিই ছিল রচনার মূল লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও বঙ্গীয় কবিগণ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—এই সংজ্ঞার্থটিকেই মানিয়া লইয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর

গুপ্ত এবং 'ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভূ' মধুসূদন পর্য্যন্ত, রসই যে কাব্যের আত্মা, রসসৃষ্টি করাই যে কবির লক্ষ্য—এই মত পোষণ করিতেন।

কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের রাজসভায় যে শ্লোক পাঠ করিয়া রাজা-সভাসদাদির সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন, সে শ্লোক 'সরস' ছন্দোময়,—

নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইআ মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥[১]

কবিকঙ্কণও একাধিক স্থলে 'শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, 'কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক।' কাশীরাম দাস যে 'অমৃত সমান' মহাভারত কথা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারও লক্ষ্য রস। কবির কাব্যে এই রসই 'অমৃত-লহরী' হইয়া উঠিযাছে। কবি আলাওলেব প্রসিদ্ধ 'পদ্মাবতী' কাব্যখানিও 'সরস রসকথা'। কবি বলিয়াছেন,

হীন আলাওল-বাণী সুরস পযারখানি
পদে পদে অমৃত সিঞ্চন।

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্য এক মহামূল্য সম্পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যেও 'রস'ই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গঙ্গাস্তোত্রের কবিত্ব বিচার করিয়াছিলেন, তখন তিনিও ভরত নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্‌চেদ্‌বিভূষিতম্‌'—এই বাক্যের নিরীখেই স্তোত্রটিব রসাপকর্ষক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২]

চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব উভয়ই রসকেন্দ্রিক। প্রেমভক্তিরসই ইহার উপেয় ও উপায়। ভরতাদি আচার্য্য স্থায়িভাবগুলির মধ্যে দেবতার প্রতি ভক্তের রতিকে কোন আসন প্রদান করেন নাই, রসের মধ্যেও ভক্তিরসকে স্থান দেওযা হয নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব প্রেম-বিলসিত দিব্যজীবন, ভক্তি-গদগদ 'কোটি সমুদ্র গম্ভীর' ভাবকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। তাই চৈতন্যদেবের সময় হইতে বৃন্দাবনের গোস্বামীসম্প্রদায় ভক্তির যে স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা ভগবদ্‌রতিকেই শ্রেষ্ঠ স্থায়িভাবরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবল তাই নয়, এই ভাবের আস্বাদ্যমান রসকে তাঁহারা মুখ্য রসরূপে গণ্য করিলেন। এই রসের নাম

১ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী। ২ দ্রষ্টব্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; আদি /১৬

'ভক্তিরস', অথবা বৈষ্ণবগণের পারিভাষিক ভাষায় 'উন্নতোজ্জ্বল-রস'। তাহারা আরও বলিলেন, 'ভক্তিরসরাট্'—ভক্তিরসই রসের রাজা। বাঙলা সাহিত্যের বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যচরিত-বিষয়ক রচনাবলী এই রসেরই বিচিত্র প্রকাশ।

রসই যে কাব্যের সর্ব্বস্ব, তাহার স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। মানসিংহ দিল্লীতে গিয়া যখন পাতশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন বাধ্য হইয়া সেই দরবারের বর্ণনা করিতে কবি ভারতচন্দ্রকেও আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বাঙলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কবি বুঝিলেন, এই ভাষা হয়তো সকলের বোধগম্য হইবে না, তাহাতে প্রসাদগুণও থাকিবে না। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিকদের দোহাই দিয়া তিনি কৈফিয়ৎ দিলেন,

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কযে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লযে॥[১]

গুপ্তকবিও তাঁহার কবিতায় একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, 'সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস'। কবিবর মধুসূদন নানাদেশীয় কবির 'চিত্ত-ফুল-বন-মধু' লইয়া যে অপূর্ব্ব 'মধুচক্র' রচনা করিযাছিলেন, তাহারও লক্ষ্য ছিল রসের প্রকাশ। কবি মেঘনাদবধকাব্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।' চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীতে তিনি কবিতাকে 'কবিতা-অমৃত-রস' বলিযা অভিহিত করিয়াছেন। 'কবি' শীর্ষক চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাতেও তিনি, কল্পনাদ্বারা ভাবের রসপরিণামকেই কবিত্ব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :

কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ?... ...
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানুপ্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে।

১ অন্নদামঙ্গলকাব্য (মানসিংহ পালা)

চতুর্দ্দশ-পদী কবিতায় মধুসূদন, করুণ-বীর-শৃঙ্গার-রৌদ্র প্রভৃতি রসের বিভাব, অনুভাব সহযোগে এক একটি মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা তিনি রসসৃষ্টিকেই যে কাব্যের লক্ষ্য মনে করিতেন, তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও এদেশে কাব্য-সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিতে গিয়া সাহিত্যিকগণ প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সিদ্ধান্তই মানিয়া চলিয়াছেন; প্রচলিত সংস্কারে সংঘাত সৃষ্টি হইযাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের 'ইয়ংবেঙ্গল'কে নূতন দীক্ষা প্রদান করিয়াছিল; তাহাদের চোখের সম্মুখে এক অ-দৃষ্ট নবজগতের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল। সেই দ্বার-পথে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সাহিত্যালোচনার পদ্ধতি এদেশে প্রবেশ করিয়া তৎকালীন যুবচিত্তকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিচারমুখে, Aristotle-Addison প্রমুখ প্রতীচ্য মনীষীবৃন্দের সিদ্ধান্ত আমাদের চিত্তে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। আমাদের সম্মুখে তখন ইউরোপীয় সাহিত্যের আলো-ঝলমল রূপ, চিত্তে সংশয়; প্রাচীনকে পরিহার করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিবার মোহময় আবেগ। কাজেই প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব জাগ্রত হইল। তখনকার 'Tremendous litorary rebel' মাইকেল, নাটক রচনায় সংস্কৃত আলঙ্কারিক-দের চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য করিলেন:

> If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Biswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models.*

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মুখেও আমরা অনুরূপ উক্তি পাইলাম:

> এদেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য, ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে; আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি।...আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি; আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।[১]

---

* রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত পত্র।

১ বিবিধ প্রবন্ধ (উত্তররাম চরিতের আলোচনা)

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসায় এদেশীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের সাহিত্যের সংজ্ঞা আর মনঃপূত হইতেছিল না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুগন্ধর মনীষীও সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করিয়া দূরে বিদায় করিয়াছিলেন।

কেবল আত্মবিস্মৃতিবশে নয়, মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে এদেশে সাহিত্য-রচনার ধারাই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ইংরাজি সাহিত্যের অনুকরণে এদেশে যে Pure Literature কিংবা Creative Literature (সৃষ্টিমূলক সাহিত্য বা সুকুমার সাহিত্য) এবং গীতি কবিতা (Lyric poetry) রচিত হইতেছিল—তাহা সর্ব্বথা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেরই ফল। আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন, বিশেষ করিয়া আচার্য্য অভিনবগুপ্তের যে ধ্বনিমুখ রসবাদ কাব্যবিচারের শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর এবং যাহা যে-কোন দেশের, যে-কোন কালের কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য, তাহার সংবাদ তখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে, কি সংস্কৃত পণ্ডিত, কি ইংরাজি পণ্ডিতদের নিকট তেমন পরিচিত ছিল না। অলঙ্কার-শাস্ত্র বলিতে বিশ্বনাথ-রচিত 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থখানিই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থে ধ্বনিমুখ রসবাদ অপেক্ষা নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত (ভরত মুনির) রসবাদের আলোচনাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্য দর্পণের—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ
উৎকর্ষ হেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ ॥[১]

—সাহিত্য বিচার সম্পর্কে ইহাই ছিল চূড়ান্ত কথা। শ্রীচৈতন্যদেবও এই নিরীখেই দিগ্বিজয়ী-কৃত গঙ্গাস্তোত্রের দোষ দেখাইয়াছিলেন। মধুসূদনও সংস্কৃত পণ্ডিতদের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য-বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন,[১] তাহাতেও মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ কাব্যের ধ্বনি বা রস-বিচার অপেক্ষা অলঙ্কার-দোষাদির মাত্র বিচার করিতেন। বলা বাহুল্য এই পদ্ধতিতে তখনকার দিনের পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা অথবা তাহার বিচার করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু 'রস' বলিতে

১ 'Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। 'মন্দ হয়নি।' (রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত পত্র)।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তৎকালে যে শৃঙ্গার রসাত্মক শ্লোক উদ্ধার করিতেন, তাহাও ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজের নিকট রুচিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। আচার্য্য অভিনবগুপ্তাদি প্রদর্শিত ধ্বনিমুখ রস-সাহিত্যের আলোচনায় মানব-জীবনবাদের যে ইঙ্গিত ছিল, সেরূপ রস-সাহিত্যেরও অভাব ছিল। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে যে-সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল, তাহা জীবন-নির্ভর সাহিত্য। প্রতীচ্যের এই অত্যুজ্জ্বল, অতি স্পষ্ট জীবন-বাদই নব্য বাঙলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য; যুগধর্ম্ম প্রভাবে বেগবতী বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তিই এ সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। তাই এই সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে বা বিচার-প্রসঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে এদেশে সাহিত্য-বিচারের যে মানদণ্ড গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা কোথায়ও সর্ব্বথা প্রতীচ্যমুখী, কোথায়ও বা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়। তৎকালে হিন্দুকলেজে 'Criticism' পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাত্রদিগকে যে 'Aristotle, Longinus, Quintilius, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden'-প্রণীত সমালোচনা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইত, মধুসূদনের একটি পত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সকল সমালোচকদের মতবাদের সহিত সাহিত্যদর্পণোক্ত মত মিশাইয়াই নব্য বাঙলার সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দী হইতে বাঙলা-দেশের সাহিত্যাচার্য্যগণের নিকট হইতে আমরা সাহিত্য-বিষয়ক যে সকল সংজ্ঞার্থ লাভ করিয়াছি, তাহা Plato, Aristotle, Addison-নির্দ্দেশিত সাহিত্য-সংজ্ঞারই প্রতিধ্বনি। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের আলোচনায় Truth (সত্য), Imitation (অনুকৃতি), Representation (প্রতিলিপি), Imagination (কল্পনা) প্রভৃতি যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, আধুনিক বাঙলার সাহিত্য-সংজ্ঞার্থ নিরূপণে এই সকল শব্দ পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালের সাহিত্যিকগণের তো কথাই নাই, গুপ্ত কবির কবিতাতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য যে কেবল বস্তুগত সত্যের প্রতিলিপি মাত্র নয়, ইহার অতিরিক্ত কিছু, Aristotle-ই সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রতি লেখনী সঙ্কেত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত সাহিত্যসংজ্ঞা যেমন ইউরোপে, তেমনই নব্য বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপনির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের নিকটও Aristotle-এর মতবাদ অজ্ঞাত ছিল বলিয়া মনে হয় না। গুপ্ত কবি 'গৌরব

অভাবে সকলই মিথ্যা' কবিতায় বলিয়াছিলেন, 'সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস'। এই সিদ্ধান্ত প্রাচ্য আলঙ্কারিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'চিত্রকর ও কবি' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিতেছেন,

চিত্রকর চিত্র করে করে তুলি তুলি।
কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি॥
চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবযব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ লেখে সেই সব॥
ফলে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট॥
ভাব চিন্তা প্রেম রস আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর॥

—কবি-কর্ম্মের এই চিত্র-লেখায় গুপ্তকবি ইহাই বলিতে চাহিযাছেন যে, সাহিত্য কেবল প্রকৃতিব প্রতিচিত্র মাত্র নয। চিত্রকর দৃশ্য বস্তু দেখিয়া রঙ-তুলির সাহায্যে তাহার প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু কবির ক্ষমতা আরও বেশি। কবি দৃশ্য, অদৃশ্য যাবতীয বস্তুই রূপায়িত করিতে পারেন। মানুষের মনোভাব—ভাব, চিন্তা. প্রেম—যাহা চিত্রকরের দৃশ্য নয়, তাহাকে চিত্রকর রূপায়িত করিতে পারেন না, কিন্তু কবি সেই অদৃশ্য ভাবকেও রূপমূর্ত্তি প্রদান করিতে পারেন। অর্থাৎ কবি স্বভাবকে তো বটেই, স্বভাবাতিরিক্ত বস্তু ও ভাবকেও কাব্যে প্রকট করিতে পারেন।

গুপ্ত কবির এই সকল মন্তব্যের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যালোচনার সুর অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু ভারতীয মতবাদকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই। অগ্নিপুরাণের একটি শ্লোকে কবিকে প্রজাপতির সহিত এক করিয়া দেখা হইয়াছে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে॥

গুপ্ত কবিও অনুরূপ স্থরে বলেন,

কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরের লীলা।
ভাবনীরে মগ্ন করি দ্রব হয় শিলা॥ (চিত্রকর ও কবি)

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কাব্যের আস্বাদকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ (বিশ্বনাথ) বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। গুপ্ত কবিও বলিয়াছেন, কাব্যের আস্বাদন অমৃতাস্বাদনের মতই মধুর, কাব্যের প্রতিটি পদ, প্রতিটি বর্ণ সুধাময়। কাব্যাস্বাদন করিয়া,—

রসিক জনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যায় সুধা॥ (চিত্রকর ও কবি)

ঈশ্বর গুপ্তের সময় হইতেই সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য সিদ্ধান্ত এদেশের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই মতবাদের অস্ফুট গুঞ্জন উঠিয়াছে গুপ্ত কবির কবিতাতেই। কাব্য সম্পর্কে রঙ্গলালের বক্তব্যের মধ্যেও প্রাচ্য মতবাদের সহিত প্রতীচ্য মতবাদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গলাল ছিলেন গুপ্ত কবির ভাবশিষ্য। প্রকাশ-ভঙ্গীর দিক হইতে প্রাচীনের প্রতি আনুগত্য থাকিলেও, ভাব ও রসে তিনি নবীন পন্থী। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙলা কাব্যে ইউরোপীয় রোমান্সরস প্রবর্ত্তন করেন। তিনি মনে করিতেন :

ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে,
ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতাকলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবে।
('পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকা)

অলৌকিকতা বর্জ্জন করিয়া, স্বদেশের গরিমা-প্রতিপাদক ঐতিহাসিক বিষয়কে কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়া, ইউরোপীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্যরচনাকে সমর্থন করিয়া কাব্য রচনা করিলেও রঙ্গলালের সাহিত্য সংজ্ঞার্থটি প্রাচীনের অনুগামী। তিনি বলেন :

মিতাক্ষর এবং মিত্রাক্ষরে রচিত, যতি-সমন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে ভূষিত পদবিন্যাস করিলেই তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যথা, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। এই স্বল্প বাক্যে কবিতাকলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহদ্ গ্রন্থবিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। (পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকা)

সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিতে। তিনি বলেন:

> যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে, তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।[১]

সাহিত্য-সম্রাটেব এই উক্তিতে Aristotle-ব্যবহৃত বিশেষ অর্থে Imitation, Truth প্রভৃতি কথাব বেশ রহিয়াছে। Aristotle-ও সৃষ্টিমূলক সাহিত্যকে (Creative Literature) বস্তু সত্যের অতিশায়ী সত্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'রসোদ্ভাবন' কথাটিও ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই 'রস' শব্দটিকে যে তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের প্রথায গ্রহণ করেন নাই, তাহা তাঁহাব উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায। তাঁহার সাহিত্যের নির্ব্বচন যে প্রতীচ্যমুখী, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইযাছে এই বাক্যে,—

> সাহিত্য দেশেব অবস্থা এবং জাতীয চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।
>
> (বিবিধ প্রবন্ধ—বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

মানুষের জীবন, মানুষের চরিত্র, মনুষ্য-হৃদয়ই যে কাব্য-সহিত্যের সামগ্রী—বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও স্বীকাব করিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন সাহিত্য অধিকাংশই ছিল দেব-নির্ভব। দৈবী অলৌকিক শক্তির স্বীকৃতি মানুষকে পৌরুষহীন করিয়া তুলিযাছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে কেবল দেব-মহিমার কথা। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে মানুষের জীবন অতি উজ্জ্বল রূপরেখায় আমাদের নিকট প্রকাশিত হইল। এই নবজাগ্রত জীবনবোধের বিচিত্র প্রকাশই নব্য বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া নূতন করিয়া এই জীবন-মহিমাকে প্রকট করিলেন:

> কাব্যরসেব সামগ্রী মানুষের হৃদয। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কার্য্যোপযোগী নহে। যাহা মনুষ্য চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। (বিবিধ প্রবন্ধ—প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত)

তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে কবি, মনুষ্যপ্রকৃতিকে কাব্যের বিষয়ীভূত করেন না, 'তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও লোক মনোরঞ্জনে

১ বিবিধ প্রবন্ধ (উত্তর চরিতের আলোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র

তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন না।'—মানবজীবনমহিমার এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি নিঃসংশয়ে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের স্বাক্ষর বহন করে।

বঙ্কিমচন্দ্র-নিরূপিত সাহিত্যের নির্ব্বচনে দুইটি দিক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক দিকে তিনি যেমন সাহিত্যকে দেশের অবস্থা ও মনুষ্য জীবনের প্রতিবিম্ব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই বলিয়াছেন, 'যাহা স্বভাবানুকারী…অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।' অর্থাৎ সাহিত্য বস্তুমুখী হইয়াও বস্তুর অতিরিক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে আমাদের দেশে না হউক, ইউরোপে সাহিত্যেব সংজ্ঞার্থ নিরূপণে বস্তুতন্ত্রবাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইযাছিল। Sense of fact-নীতি দ্বারা প্ররোচিত হইয়া একদল লেখক নগ্ন বাস্তবের রূপায়ণকেই সাহিত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন। তাঁহারা মন্তব্য করিতেছিলেন, বৈজ্ঞানিক যেমন বস্তুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন, নগ্ন সত্যকে তেমনই তন্ন তন্ন কবিয়া বিশ্লেষণ করিযা প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। ইহার ফলে, বস্তুতন্ত্রের নামে স্থূল আসঙ্গলিপ্সা ও কামরঙ্গকে রূপায়িত কবাই সাহিত্য-রচনার বৈশিষ্ট্য হইযা উঠিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নূতনত্বের পৃষ্ঠপোষক হইলেও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন আদর্শবাদের পূজারী। সাহিত্যকে কুরুচিবিলাসেব কবল হইতে মুক্ত কবিবার কঠিন ব্রতই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্য ক্রমে ক্রমে যেরূপভাবে পাশ্চাত্ত্যমুখী হইযা উঠিতেছিল তাহাতে পাশ্চাত্ত্যের নগ্ন বস্তুপরতন্ত্রতা এখানেও সঞ্চারিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে 'স্বভাবাতিরিক্ত' বলিয়া অভিহিত কবিয়াছিলেন।

আবার কি এদেশে, কি ওদেশে সৃষ্টিমূলক সাহিত্য যে রস-সাহিত্য, অর্থাৎ রস বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই যে সাহিত্যের লক্ষ্য—'স্বভাবাতিরিক্ত' কথাটির মধ্যে তাহারও ইঙ্গিত রহিযাছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রসোদ্ভাবন' ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বিষয়কেও অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।'…কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া এদেশীয় কিংবা ওদেশীয় সাহিত্যে যে-সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছিল, তাহা একরূপ জগৎ ও জীবন-পলাতকার সাহিত্য। যে-সাহিত্যে জীবনের স্বাক্ষর নাই, রস-সৃষ্টির দিক হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, তাহা পাঠকের সহৃদয়তা অর্জ্জন করিতে পারে না। তাই সাহিত্যকে তিনি বলিলেন, 'স্বভাবানুকারী।' সৌন্দর্য্যও তাঁহার মতে স্বভাবানুকারিতার গুণমাত্র, 'স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের সংজ্ঞার্থে সমন্বয়ের ভাবটি সুস্পষ্ট। তিনি প্রাচীনকেও অন্ধভাবে বর্জ্জন করেন নাই, নবীন ধারাকেও অত্যুৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া বিচার না করিয়া গ্রহণ করেন নাই। বরং উভয়কে ঐক্য বন্ধনে গ্রথিত করিয়া তিনি একটি মিলনের পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সংজ্ঞা এই কারণেই নানাদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের যে নির্ব্বচন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, বঙ্কিম-পরবর্ত্তী যুগে সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটি বিচারক, সেই মত ও পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইযাছেন। 'যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি'—এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া, ইহাকে পরিমার্জ্জিত বা প্রসাধিত করিযাই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ সাহিত্য-সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায মহাশয প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমপ্রদত্ত সূত্রটিকে ব্যাখ্যা কবিযাই সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি নিরূপণ করিযাছেন। তিনি বলেন,

> সাহিত্য স্বভাবের অনুকৃতি। অনুকৃতি বটে, কিন্তু অতিরিক্তও তো বটে। সাহিত্য স্বভাবের একটু অতিরিক্ত নয কি? অতিরিক্ত হইলেই যে বহির্ভূত হয়, অন্তর্ভূত হয না, তা নয়। স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত।··· শিল্প এবং সাহিত্য উভযই স্বভাবের অনুকৃত বা অন্তর্ভূত, অথচ অল্পাধিক পরিমাণে স্বভাবাতিরিক্ত।[১]

মুখোপাধ্যায মহাশয় বিশেষভাবে স্বভাবের অনুকৃতি ও 'স্বভাবাতিরিক্ত' কথা দুইটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'স্বভাবেব অনুকৃতি' বা অন্তর্ভূত—ইহার অর্থ সৃষ্টি-সম্ভূত ও স্বাভাবিক। শিল্প ও সাহিত্য মানুষের জন্যই রচিত হয়। অতএব মানুষের যাহা মনে ধরে, তাহাই সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য-সংসারেও মানুষের নিত্য ঘরকন্নার মত 'ঘর-সংসার' থাকে। এই দিক হইতেই সাহিত্য স্বভাবের অনুকৃতি বা স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বভাবাতিরিক্তও বটে। 'স্বভাবাতিরিক্ত' অর্থে অস্বাভাবিক নয়, সৃষ্টি-বহির্ভূতও নয···একেবারেই 'দুনিয়া ছাড়া'—তা নয়। স্বভাবের মালমসলা লইয়াই স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টি হয। সংসারে অনেক কিছুই আছে, "শিল্প বা সাহিত্য সেই 'সব' হইতে 'রকমারি' বাছিয়া, ঘসিয়া-মাজিয়া, ঝালিয়া কাটিয়া ছাটিয়া"—যেটুকু মানুষের চোখে মানায় বা মানুষের মনের মত হয়, তাহাই

১ 'সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি'—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

গ্রহণ করে। এই মুন্সীয়ানার ফলেই স্বভাব স্বভাবাতিরিক্ত হয়—তখনই তাহা হয় সাহিত্য। শিল্প-সৃষ্টি করিতে গিয়া শিল্পী স্বভাবের অনুলিপি গ্রহণ করে বটে; কিন্তু অবিকল গ্রহণ করে না। বাছিয়া বাছিয়া মনের মত করিয়া গ্রহণ করাতেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়। কারণ যাহা অতি প্রত্যক্ষ বা প্রাত্যহিক, তাহা মানুষের নিকট পুরাতন, সেই জন্যই আকর্ষণ-শক্তি বর্জ্জিত। তাই সাহিত্য বিজ্ঞানের মত 'উনকোটি খুঁটি-নাটি' বিচার করে না, গ্রহণও করে না—যেটুকু মানুষের মনের মত এবং চিত্তাকর্ষক, তাহাই সাহিত্যে গ্রহণ করা হয়। এই দিক হইতে,—'সাহিত্য স্বভাবের সূক্ষ্ম শরীর।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত'—এই সংজ্ঞার্থ ব্যাখ্যায় 'সাহিত্য স্বভাবের সূক্ষ্ম শরীর' —এই উক্তিটুকু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব। ইউরোপের 'Sense of fact'-বাদীদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মে রসময় সাহিত্য রচনার বিরুদ্ধে যে মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যের সংজ্ঞার্থটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি ইহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন,—

> 'তবে নিয়মটা সম্বন্ধে ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে, প্রতিকূল সমালোচনাও একটা চলিতেছে।...পুরাতন স্তরের উপর বসিয়া একটা নূতন স্তর প্রস্তুতের অল্পবিস্তর উদ্যোগ হইতেছে। উদ্যোগটা অবশ্য হইতেছে ইয়ুরোপে।...আর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের 'আঁচ' নাকি আমাদের এখানকার সাহিত্যের গায়ে বিশেষরূপে লাগিয়াছে, লাগিতেছে, লাগিবে,—আর সে আঁচ' নাকি আমরা এড়াইতে পারি না, এড়াইতে চাই না, তাই অদ্যকার এই আলোচনা।'[১]

বাঙলা দেশে রবীন্দ্রনাথ যুগস্রষ্টা কবি। এদেশের মধ্যে তো বটেই, তাঁহার প্রভাব অন্য দেশেও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ বাঙলা হইতে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপেও প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বিশ্বকবি। তাঁহার সাহিত্য-দর্শনও বিশ্বজনীন মনোভাবের ভিত্তিতে রচিত। সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা কোন দেশকাল-বাধিত সাহিত্য-সংজ্ঞা নয়, সকল কালের, সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই নির্ব্বচন দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনায় যেমন 'সকল কালের সকল কবির গীতি' সংহত হইয়াছে, তাহাতে যেমন

১ 'সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি'—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

'নিখিলের সঙ্গীতের স্বাদ' অনুভব করা যায়—তাঁহার সাহিত্য-সংজ্ঞার মধ্যেও তেমনই বিশ্বসাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ প্রতিবিম্বিত।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে, রবীন্দ্রনাথের সময়ে এদেশের সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিচিত্র কলতান ধ্বনিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের রসবাদ, অলঙ্করণ-তত্ত্ব এবং প্রতীচ্য সমালোচকবৃন্দের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, ভাবতন্ত্র, বস্তুতন্ত্র—সব কিছুর সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য বিচারে নানা মতবাদের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। তিনি আপন মহিমায় ভাস্বর ও স্বতন্ত্র। তাঁহার সাহিত্যের সংজ্ঞার্থটি নিজস্ব উপলব্ধি ও মনন-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

যেমন কাব্যসৃষ্টিতে, তেমনি সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাণ-গায়ত্রী দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। V. A. Smith এদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া বলিযাছিলেন, India offers unity in diversity *—ইহাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। এদেশে কত জাতি, কত বর্ণ, কত ধর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষ সকল বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়াছে, একক সে উপলব্ধি করিয়াছে, আবিষ্কার করিযাছে, প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ঐক্যানুভূতির স্বর্ণসূত্রে খণ্ড ও অখণ্ড, সান্ত ও অনন্ত, নিকট ও দূর, প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতা ও চিরন্তন উদারতা, বিশেষ কাল ও নির্ব্বিশেষ কাল এক অখণ্ড গ্রন্থিতে গ্রথিত হইয়াছে। ভারতবাসীর আদর্শ জীবন সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়, ক্ষুদ্রতা দ্বারা ক্ষুণ্ণ নয়, স্বার্থপরতায় খিন্ন নয। যে ঐক্য সকল বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিয়াছে—তাহার উপলব্ধি তাহাকে পরম উদার এবং অত্যাশ্চর্য্য সমতা-বোধে উদ্দীপ্ত করিযা তুলিযাছে। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা প্রণোদিত হইয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিযাছিলেন, যাহা সকল বৈপরীত্য, সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে এই ঐক্যবোধ জাগায়, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সাহিত্য। তাই সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণে 'সহিত' কথাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,

> 'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন, তাহা নহে। মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের,

* History of India

দূরের সহিত নিকটের অন্তরঙ্গ যোগ সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।' ১

রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, আত্মপ্রকাশের অদম্য প্রেরণাবশেই শিল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানুষ যখন তাহার হৃদয়ে গভীরতর, মহত্তর কিছু উপলব্ধি করে, তখন তাহাকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি মনে করেন, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে পরম 'এক' নানা বৈষম্যের মধ্যে সৌষম্য বিধান করে, নানা অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে—সেই 'এক'-এর উপলব্ধিই জীবনের মহত্তম উপলব্ধি। এই উপলব্ধি খণ্ডতার মধ্যে অখণ্ডতা, সীমার মধ্যে অসীমতা এবং অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার সন্ধান দেয়। ইহা প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা-মলিনতার ঊর্ধ্বে, প্রয়োজনের অতীত এক নিঃসীম আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলে। মুহূর্তে যেন সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের প্রকাশাবরণ উন্মোচিত হয়। মানুষ সেই পরম 'এক'-এর সহিত নিগূঢ় যোগ অনুভব করিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়।

এই যে 'এক', রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলেন 'সত্য'। এই 'সত্য' প্রাকৃত সত্য হইতে স্বতন্ত্র। যাহা প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় যাহার সাক্ষ্য দেয়, তাহা প্রাকৃত সত্য। কিন্তু এ 'সত্য' প্রত্যক্ষেব অন্তরালে অপ্রত্যক্ষকে প্রতীত করায়, প্রাকৃত সৃষ্টিকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত যুক্ত কবিযা দেখায়। সাহিত্য এই সত্যকেই প্রকাশ করে। তাই সাহিত্য-সত্যে ও প্রাকৃত সত্যে এত পার্থক্য। প্রাকৃত সত্য কখনও পূর্ণ নয়, ইহা নানাদিক হইতে অপূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে পরিপূর্ণ সত্যকে জানিবার যে অভীপ্সা রহিয়াছে, সাহিত্যই তাহা চরিতার্থ করে: 'সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়' (সাহিত্যের বিচারক)। সাহিত্যের সত্য ও বিজ্ঞানের সত্যের পার্থক্যও এইখানে। সাহিত্যের সত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের খণ্ড-সত্য নয়; ইহা বিরাট, সমগ্র সত্য। সীমার মাঝে অসীমের ব্যঞ্জক, খণ্ডের মাঝে অখণ্ডতার দ্যোতক, অপূর্ণতার সম্পূরক এই যে 'সত্য' তাহাই সাহিত্যের সত্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> মানুষ তাহার কাব্যে চিত্রে শিল্পে সত্য মাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। (সৌন্দর্য্যবোধ)

ভারতবর্ষের জীবন-প্রেমিক উপনিষদের ঋষিগণ, এই যে পরম 'সত্য,'

---

১ সাহিত্য (বাংলা জাতীয় সাহিত্য)

ইহাকে সুন্দর ও আনন্দের সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। সত্যই সুন্দর, রূপের রূপ, অপরূপ রূপময়। বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি সেই অখণ্ড 'সত্য'-রূপ সুন্দরের অংশকণা মাত্র। সত্য-সুন্দরের সে কি দীপ্তি, সে কি জ্যোতি! সূর্য্যপ্রভা তাঁহার নিকট ম্লান; চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ তাঁহার তুলনায় নিষ্প্রভ। বিশ্বের দীপ্তিমান পদার্থ তাঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তি প্রকাশ করে! সেই পরম রূপময় বহুরূপে এই বিশ্বে প্রকাশিত হইতেছেন:

> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥[১]

শুধু তাই নয়, এই যে সুন্দর—ইনি রসস্বরূপ: 'রসো বৈ সঃ' (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ): ইনিই আনন্দস্বরূপ: 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডকোপনিষৎ): ইনিই মধু, ইনিই অমৃত, ইনিই আনন্দ। সত্যই মহৎ সৌন্দর্য্য ও যথার্থ আনন্দ। রবীন্দ্রনাথও পরম সত্যকেই প্রকৃত সুন্দর ও যথার্থ আনন্দ বলিয়া জানিয়া বলিয়াছেন, 'সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য্য।' সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, 'সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া', ইহা 'সামঞ্জস্যের সুষমা', ইহাতে কেবল আকৃতির সুষমা নয়, চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে।' সত্যকারের সৌন্দর্য্যের সহিত মঙ্গলেরও যোগ রহিয়াছে: 'সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্ত্তি, মঙ্গল মূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্বরূপ।' সৌন্দর্য্যের এই যে কল্যাণী, সতীলক্ষ্মী মূর্ত্তি—ইহা পরম 'সত্য' হইতে একেবারে অভিন্ন। বিরাট 'সত্য' যেমন স্থূলবুদ্ধির অনধিগম্য, দৈনন্দিন তুচ্ছতার অতিশায়ী, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সুন্দরও ঠিক তাই। উভয়ের সহিত মঙ্গলের গভীর যোগাযোগ। এইভাবেই কবির চোখে সত্য, শিব ও সুন্দর এক হইয়া গিয়াছে। যখন আপাতবিরোধের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়, যখন মানুষ অন্তরাত্মাকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত যুক্ত করিয়া দেখে, তখনই সত্য, শিব ও সুন্দরের সুগভীর ঐক্য প্রতীত হয়: 'তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে।' এই প্রতীতিদ্বারাই রবীন্দ্রনাথ Keats-এর প্রসিদ্ধ বাক্যকে সমর্থন করেন—'Truth is beauty, beauty truth.'

'সত্য, শিব ও সুন্দর'—রবীন্দ্রনাথের মতে আনন্দঘন। তিনি মনে করেন,

১ কঠোপনিষৎ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী, ১০,১৫ শ্লোক।

সত্যের যথার্থ উপলব্ধিই আনন্দ : 'যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেইখানেই আমাদের আনন্দ!' 'সত্য' আমাদের মনকে আশ্রয় দেয় বলিয়া তাহা আমাদের নিকট পরমানন্দ হইয়া উঠে। উপনিষদের ঋষিরাও সত্য-সুন্দরের এই আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট সত্য, সুন্দর ও আনন্দের অনুভূতি এক হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও সেই সুরে বলেন :

> আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দ-রূপমমৃতম্। (সৌন্দর্য্যবোধ)

এই সুন্দর, আনন্দরূপ সত্যকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ : 'সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য।' সত্য-সুন্দরের উপলব্ধিই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। তাই রবীন্দ্র-নাথ বলেন :

> সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। (সৌন্দর্য্যবোধ)

সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের বিবৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের সত্যকে 'স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত' বলিয়াছিলেন : ইহার মধ্যে Aristotle এবং Addison-এর উক্তির প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গতঃ 'সত্য', 'সৌন্দর্য্য' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের 'সত্য' ও 'সৌন্দর্য্য' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। রবীন্দ্রনাথের 'সত্য' গভীর উপলব্ধির আবিষ্কার—ইহা অপরোক্ষানুভূতির ফল। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের সত্য 'অপ্রত্যক্ষ' : 'সাহিত্যে ও ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান।' পরম ঐক্যের সহিত ক্ষুদ্র খণ্ডের যে নিবিড় যোগ রহিয়াছে, ইহার উপলব্ধিই সত্যের উপলব্ধি। এ যোগ স্থূল দৃষ্টি দেখিতে পায় না, স্থূলবুদ্ধি অনুধাবন করিতে পারে না। তাহা যে 'অসীম', 'অপ্রত্যক্ষ'। সাহিত্যে এই অসীমের লীলা, এই সত্যের আনন্দপ্রকাশ :

অসীমের একের সেই আকৃতি, যা ঋতুরঙ্গের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হল না, সেই দৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম আকাশের অমৃত-নির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে বলেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল: অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্ব্বচনীয়ের রসধারা। (সাহিত্যের পথে)

অখণ্ড এক, বিশুদ্ধ আনন্দ, মঙ্গলময় সুন্দররূপ যে সত্য, সাহিত্য সেই সত্যের প্রকাশ। তাই সাহিত্যের সত্য প্রাকৃত সত্য হইতেও অধিকতর সত্য। এ সত্যকে অন্য কেউ জানিতে পারে না, প্রকাশ করিতে পারে না। একমাত্র ঋষির কাছেই 'ঋত' বা 'সত্য' প্রকাশিত হয়। কবিই বিশ্বের অন্তরালে সীমাহীন সত্যকে জানেন, রূপদক্ষের নিকট অনির্ব্বচনীয়ের আকৃতি প্রকাশিত হয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় ঋষি নারদ বাল্মীকিকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন,

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি।
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

এইজন্য বৈদিক ঋষিগণ সত্যদ্রষ্টাকেই বলিয়াছেন কবি। রবীন্দ্রনাথও এই অর্থেই 'কবি-জীবনে'র বিচার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অন্তরালে 'বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর' যে অনাদিধ্বনি উঠিতেছে, যে রাগিণী হোম-শিখার মত কাঁপিয়া উঠিতেছে, কবির চিত্তবীণায় সেই অনাহত ধ্বনিই বাজিয়া উঠে। 'অলৌকিক আনন্দের' ভারে কবি যখন আবেগাম্লবিদ্ধ হন, তখনই কাব্য সৃষ্ট হয়। কবির কাব্য প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে, লোভক্ষুধার উপরে এক অপূর্ব্ব 'আনন্দলোক'। কবির রচনা দৈবী প্রেরণাসম্ভূত। কবির ব্যক্তিগত জীবন হইতেও কবির কাব্য মহত্তর। সৃষ্টির সহিত সৃষ্টি-কর্ত্তাকে যখন তিনি সমগ্রভাবে দেখেন, খণ্ডের অন্তরালে যখন তিনি অখণ্ড সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, তখনই কাব্য সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যেই কবি-জীবনের গভীর রহস্য নিহিত। কাব্যসৃষ্টির মূলে থাকে এক বৃহৎ আবেগ, গভীরতম উপলব্ধি, অপার বেদনা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

কবির সৃষ্টি,—তাঁহার অন্তর্গত নিত্য প্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ, তাহা অন্যান্য কাজকর্ম্মের মতো ক্ষণিক বিক্ষোভজনিত নহে। (কবিজীবনী)

সাহিত্য-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ সার্ব্বভৌমিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া, কেবল সীমিত জীবনের, কেবল বস্তুব প্রকাশধর্ম্মী সাহিত্যসংজ্ঞাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আধুনিক সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতার বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথাই বলিযাছেন। ফরাসী বিপ্লব 'সর্ব্বমানবের মুক্তির বাণী' বহন করিয়া আনিযাছিল: তাই তাহার প্রভাবে একদিন বাঙলাদেশেও নবসৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত হইযাছিল। কিন্তু এই বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যেদিন ইউরোপের বণিকাবুদ্ধি বড় হইযা উঠিল, সেদিন সঙ্কীর্ণবুদ্ধির পরিপোষকতায় যে সাহিত্য গড়িযা উঠিল, সাহিত্যেব যে সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হইল এবং বাঙলাদেশেও সঙ্গে সঙ্গে 'রিয়ালিজ্‌মের' নামে যে সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল—তাহাকে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইতে পারিলেন না। আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রশক্তি যে অপরিমিত বস্তুপিণ্ডকে উদ্গীর্ণ করিতেছে, তাহাকে তিনি অস্বীকার করেন না'ই, কিন্তু এই 'অপ্রাণ পদার্থ'-এর চিত্রমাত্রকেই তিনি সাহিত্য বলিযা স্বীকাব করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, সাহিত্য বিজ্ঞানেব প্রাকৃতিক সত্য নয়, জীবনের নিত্য সত্যকে প্রকাশ করে। অতি পরিচিত বাস্তবেব রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে এই নিত্য সত্যকেই সাহিত্য প্রকাশ করিযা থাকে। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সে জীবন বিশেষকালের, বিশেষ রুচির, বিশেষ আকৃতিদ্বারা সীমাবদ্ধ জীবন নয়, তাহা মহাজীবন। সাহিত্য এই মহাজীবনের প্রকাশ:

> জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্ত্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে, তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য। ধন্য ডনকুইক্‌সট্, ধন্য রবিন্‌সন্ ক্রুশো।
>
> সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে উঠে, সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী।[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় এই মহাজীবনকে খুঁজিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিযাছেন। বস্তুজগতের খণ্ড, ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেও সেই মহা-

১ সাহিত্যেব' স্বরূপ গ্রন্থে 'সাহিত্যের মূল্য' নামক প্রবন্ধ।

জীবনের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনা সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ, জাগতিক বিচিত্র রূপ-রসের মধ্যে সেই বিরাট রস-সত্তার স্পর্শানুভূতি লাভের উপলব্ধিতে আনন্দ-মুদিত। তাঁহার কাব্যের বা সাহিত্যের সংজ্ঞার্থেও অদ্বৈত সুন্দরের উপলব্ধিজাত আনন্দের ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় Realistic Literature-এর গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ, বাঙলা সাহিত্যে তাহার আবির্ভাবের আশঙ্কা করিয়া সাহিত্যরচনার একটি আদর্শ পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। Realistic Literature-এর লক্ষ্য স্বভাবের যথাযথ অনুকরণের দিকে, বস্তুর হুবহু চিত্রাঙ্কনের দিকে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, সাহিত্যকে স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাঙলা সাহিত্যে, পাশ্চাত্ত্যের এই বস্তুপরতন্ত্র সাহিত্য রচনার আবেগ জাগিয়াছিল। এদেশেও একশ্রেণীর লেখক Freedom of art, Sense of fact, Art for for art's sake—প্রভৃতি বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহিত্য রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতি ও আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যুগ ও কালাতিশায়ী অপরিবর্ত্তনীয় মহাজীবনের উপলব্ধিজাত যে আনন্দময় প্রকাশকেই সাহিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, বস্তুবাদী সাহিত্যিকগণ তাহাকে অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই বাস্তব, তাহাই সত্য। সত্যের কোন নির্ব্বিশেষ রূপ নাই, বিশেষ সত্যই সত্য। এই সত্যকে—এই বাস্তবকে রূপায়িত করাই সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যিক চিরপ্রচলিত নীতিদ্বারাও পরিচালিত হন না, কোন আদর্শ বা নীতি-প্রচার করাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন এই দলের অগ্রণী। সাহিত্যরচনায় চিরাচরিত নীতি ও সংস্কারদৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া মানবতার দৃষ্টিতে জীবনের বিচার, সাদা-চোখ মেলিয়া জগৎ-সন্দর্শন, অবহেলিত বস্তু ও জীবনের মধ্য হইতে মানব-মহিমাকে আবিষ্কার এবং তাহাকে প্রকাশ করাকেই তিনি শিল্পীর কাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা চালিত হওয়ায় তাঁহার রচনায় সমাজের অনেক অন্যায়, মানুষের অনেক নগ্ন লালসা এবং বিশেষ করিয়া গতানুগতিক আদর্শ ও নীতির অনেক কদর্য্যতা উদ্ঘাটিত হইল।

বাস্তবকে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত কোন আধ্যাত্মিক জীবনের আলোর ছটায় সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিলেন না, বাস্তবকে সাদা চোখে-দেখা বাস্তবরূপেই দেখিলেন। এইদিক হইতে শরৎচন্দ্র Realist—বাস্তবপন্থী। তাঁহার নিকট প্রাত্যহিক, খণ্ড-ক্ষুদ্র জীবন কোন অলক্ষ্য সুন্দর মহাজীবনের লীলাবিলসিত বলিয়া মনে হয় নাই: তাঁহার স্বাভাবিক দৃষ্টির সম্মুখে সীমিত জীবনের কামনা-বাসনাই অবারিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া চিরকালের নিপীড়িত জীবনের মর্ম্মদ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি বলেন,—

> সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।

বাস্তব বোধদ্বারা পরিচালিত হইলেও, শরৎচন্দ্র নগ্ন বাস্তবকে বা বাস্তবের ফটোগ্রাফিকে সাহিত্য বলিয়া মনে করেন নাই। Idealism এবং Realism-এর মধ্যে Realism-এর দিকে তাঁহার বেশি ঝোঁক থাকিলেও, অতিমাত্রায় নগ্ন বাস্তবতার স্বীকৃতি তাঁহার মধ্যে নাই। Idealismকেও তিনি পুরাপুরি সমর্থন করেন নাই। সাহিত্যে অখণ্ড নিত্যত্ব বা সমাজ-প্রচলিত নীতিবাদকেও তিনি মানেন নাই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র উভয়পন্থী। তিনি বলেন,

> গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic···অথচ কি করে যে এ দু'টোকে ভাগ করে দেখা যায়, আমার অজ্ঞাত! যা-কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না, অথচ সমাজ-প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য-রচনায় প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বড় আসন দিয়াছেন। এই অনুভূতি দিয়াই তিনি বাস্তব জীবনকে দেখিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন। জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, সুগভীর কামনা, নরনারীর বিচিত্র অভীপ্সাই বস্তুদৃষ্টির সাহায্যে তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহাই সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কাজ,

" মানবের সুগভীর কামনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না তো করবে কে!

মোটের উপর শরৎচন্দ্র বাস্তববাদীদের Freedom of artকে মানিয়াছেন, বলিয়াছেন, ভাবে কাজে চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ; কিন্তু Art-এর রাজত্বে স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি আমল দেন নাই। তাঁহার Freedom of art অত্যাশ্চর্য্য সংযম-শাসিত। তিনি Sense of fact-কেও স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু নগ্ন আসঙ্গলিপ্সা বা কামরঙ্গতাকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। Art for art's sake-কেও তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন,

> Art for art's sake কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা immoral হতে পারে না এবং অকল্যাণকর হ'তে পারে না এবং অকল্যাণকর এবং immoral হ'লে Art for art's sake কথাটাও কিছুতেই সত্য নয়, শত সহস্র লোক তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়।

বস্তুতন্ত্রবাদের সকল চরম নীতিকে পরিহার করিয়াই শরৎচন্দ্র বস্তুতন্ত্রবাদকে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার Realism, বস্তুবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও উগ্রতাকে বর্জ্জন করিয়া, তাঁহার Idealism, ভাববাদের অবাস্তবতা ও অতিমাত্রিক নৈতিকতাকে পরিহার করিয়া। সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র এই উভয় কোটির মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কালেই বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে বীরবল প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি 'সবুজ পত্র' নামে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক। 'সবুজ পত্র' নানাদিক হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নূতনত্বের সূচনা করে। বিশেষ করিয়া কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ইহার প্রধান কৃতিত্ব। 'সবুজ পত্র' প্রাণের প্রতীক, ইহার উদ্দেশ্য পত্রিকাটির নামকরণের মধ্যেই প্রকটিত হইয়াছে:

> সবুজ হচ্ছে প্রাণের রঙ, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি ......অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে; স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম্ম। (সবুজ পত্র)

প্রমথ চৌধুরী ভাবাবেগপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, তন্দ্রাতুর বাঙালী জীবনকে বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষের আঘাতে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রাণে প্রাণে তিনি

ছিলেন নূতনের পূজারী। সাহিত্য-রচনা সম্পর্কেও তাঁহার ব্যঙ্গদীপ্ত, প্রখর বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র লইয়া তখনকার দিনে এদেশে যে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, চৌধুরী মহাশয় তাহা হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন না। 'বস্তু' সাহিত্যের উপজীব্য, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই :

> মেটেরিয়ালিজমের পাকা ভিতের উপর খাড়া না করলে রিয়ালিজমের গোড়ায় গলদ থেকে যায়। (বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি)

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল—ইহা স্বীকার করিয়াও চৌধুরী মহাশয় ইহাকেই সাহিত্যের 'বস্তু' বলিয়া মানিয়া লন নাই। তাঁহার মতে, কবির অন্তরের আলোকস্পর্শে যখন বস্তু আলোকিত হয়, তখনই তাহা সাহিত্যের 'বস্তু' হইয়া উঠে। তাহারও সুচিন্তিত অভিমত, 'আর্ট অনুকরণ নয়, সৃষ্টি।'

> প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়, কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হ'চ্ছে আর্টের ধর্ম্ম।...আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি।...এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য।
> (বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ)

কিন্তু এই সৃষ্টি-বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী বিষয়বস্তুর উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি মনে করেন, উপাদান সংগ্রহ, বাছাই করা এবং ভাষায় তাহাকে সাকার করিয়া তোলার মধ্যেই কবির কবিত্বশক্তি। কাব্যসৃষ্টিতে 'ভাব' প্রকাশের উপর কবির কৃতিত্ব নির্ভর করে না, কৃতিত্ব নির্ভর করে প্রকাশের ক্ষমতার উপর। প্রকাশভঙ্গিই রচনার প্রধান গুণ। কবির কাব্য-সৃষ্টিকে তাই তিনি বলেন, 'বাজে কথার ফুলের চাষ' কিংবা 'বিনিসুতার মালা গাথা'। বাক্‌চাতুর্য্যকে রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ায়, কাব্যসৃষ্টিটাই তিনি কবির 'খেয়াল' বা 'খেলা' বলিয়া মনে করিয়াছেন।

> পৃথিবীর শিল্পীমাত্রই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন, সাহিত্যজগতে যাদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে, মানুষের নয়নমন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। ... সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র। (সাহিত্যে খেলা)

মোটের উপর প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে রীতি-প্রাধান্যের পক্ষপাতী। তাঁহার নিজের রচনাবলী একটা বিশিষ্ট ভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত : সে ভঙ্গি অনেকটা ফরাসীদেশসুলভ ব্যঙ্গপ্রিয়তা এবং বার্নার্ড শ-এর প্রখর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য মাখানো শাণিত এবং প্যাঁচালো উক্তির সংমিশ্রণে গঠিত। এই ভঙ্গি বা রীতিকেই তিনি রচনার সার বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যের সংজ্ঞার্থে বিষয় ও রচনা প্রণালী এই দুয়ের অদ্বৈতসিদ্ধিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, প্রমথ চৌধুরীই যেন আলঙ্কারিক 'বামনে'র মত নূতন করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।' তাই তিনি বলিলেন :

> আমরা অহর্নিশ কাব্যে ভাব প্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবেব মূল্য আমাব কাছে যতই বেশি হোক না কেন, অপবেব কাছে তাব যা কিছু মূল্য সে তাব প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। (বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ)

এই দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা পবিচালিত হওযাব ফলেই বীরবল সাহিত্যরচনাকে বলিয়াছেন কবির 'খেয়াল', সাহিত্য যেন 'খেয়াল খাতা'। খেযালের বৈশিষ্ট্য তাহার স্বাধীন ভাব। তান-গিটকিরি লইযা তাহার কারবাব—তাহা 'নর্ত্তকীর মত বিচিত্র' :

> আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিষের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। (খেয়াল খাতা)

প্রমথ চৌধুরী লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বাঙলাদেশ কান্নায় কান্নায় ভরিয়া গিয়াছে। ইহার সাহিত্যেও কান্না : 'আমবা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায কাঁদি।' 'করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।' তাই তিনি বলেন :

> আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। আমাদের দুঃখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যই হাস্যরসেব আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।' (খেয়াল খাতা)

চৌধুরী মহাশয় নিজে ক্ষুরধার বুদ্ধিকে পুরোভাগে রাখিয়া আকবরের সভাসদ বীরবলের মত ব্যঙ্গশ্লেষের মধ্য দিয়া হাসির ছটা বিকীর্ণ করিয়া নিস্তেজ ভাবপ্রবণ জীবনকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় পরিহাসকুশলতা

ও বাণীকুশলতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। তিনি ভারতচন্দ্রের মতই কুশলী শিল্পী। Knowledge (বিদ্যা) ও Art (সুন্দর) উভয়ই তাঁহার করায়ত্ত ছিল। তিনি তাই মনে করেন, লেখকরা খেলাচ্ছলে অথবা খেয়ালবশে বিদ্যা ও সুন্দরের যে অদ্বৈতসিদ্ধি সম্পাদন করেন, তাহাই সাহিত্য :

> সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। ... সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে। (সাহিত্যে খেলা)

বাঙলা দেশে সাহিত্যাদর্শের বিবর্ত্তন-ধারা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যেই শেষ হইয়া যায় নাই, এখনও পর্য্যন্ত ইহার অভিব্যক্তি চলিতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইউরোপীয় সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতার স্পর্শ আমাদের সাহিত্যেও লাগিতেছিল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ বাস্তবের সহিত নিজ অন্তরের ভাবুকতা মিশাইয়া বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য (Realistic Literature) রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ বিচারে তিনি বস্তুবাদকেই সমর্থন করিয়াছেন। বীরবল প্রমথ চৌধুরীও 'বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপর' সাহিত্য-রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি এতাবৎকাল সাহিত্যের যে সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল, তাহাতে অবিমিশ্র বস্তুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি শরৎচন্দ্রও সাহিত্য-নির্ম্মিতিতে নিছক বস্তুতন্ত্রতাকে স্বীকার করেন নাই।

এই শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিল। আইনষ্টাইনের বিজ্ঞান হইতে আমরা বুঝিলাম, জগতে সবই আপেক্ষিক, নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বস্তুর কোন ধর্ম্ম নাই ; ফ্রয়েডের Psycho-Analysis হইতে আমরা জানিলাম, আদিমতম কামনা-বাসনা কখনই লুপ্ত হয় না, অবদমিত থাকে মাত্র—সাহিত্য এই অতৃপ্ত কামনারই একটা রূপান্তরিত রূপ ; হ্যাভলক এলিসের স্ত্রী-পুরুষের মিলনরীতির স্পষ্ট স্পষ্ট বাস্তব কথা শুনিয়া কাহারও কাহারও মেজাজ গরম হইয়া উঠিল ; আচার্য্য মার্ক্স্-প্রবর্ত্তিত সমাজতন্ত্রবাদের সূত্র জীবনে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। সর্ব্বোপরি ইউরোপীয় আধুনিক বিজ্ঞানে যে নূতন গতির সূত্র বিবৃত হইল, বিবর্ত্তনবাদে জীবনের অভিব্যক্তির যে সন্ধান পাওয়া গেল—তাহাতে মানবজীবন নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল নব নব চিন্তাধারা

বাঙলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল। আমাদের মনে জাগিল প্রশ্ন, জাগিল সংশয়। আমরা বুঝিলাম,

'হাজার বছর হাজার লোকে যাকে সত্য বলে এসেছে, আজ তা 'ধর্ম্মব্যবসায়ীর চালাকী'। যাকে মঙ্গল বলে এসেছে, আজ তা 'মধ্যবিত্তের আত্মসন্তোষ'। যাকে সুন্দর বলে এসেছে, আজ তা 'অভিজাতের সৌখীনতা'। প্রেম একটা কথার কথা, সতীত্ব একটা ন্যাকামি, দয়া একটা দুর্ব্বলতা, ক্ষমা একটা ভণ্ডামি, বীরত্ব একটা ভড়ং, পরোপকার একটা নিগূঢ় স্বার্থপরতা, বিবাহ একটা একনিষ্ঠ বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্স, মাতৃত্ব এক প্রকার সন্তান-সম্ভোগ। এক কথায়, 'everything every where is bunkum'. [১]

এই প্রশ্ন, এই সংশয়, এই চিন্তাধারা, এই প্রত্যয় লইয়া বাঙলায় আধুনিকতার আরম্ভ। বস্তুতন্ত্রবাদের ভিত্তিও ইহাদের মধ্যে। বাস্তববাদী লেখক অতীতের মদিরাপানে বিহ্বল হন না, ভাববিলাসে বিভোর হন না, চিরপ্রচলিত নীতির আদর্শে পরিচালিত হন না, ধর্ম্মের আফিং খাইয়া প্রমত্ত হন না—তাঁহারা প্রত্যক্ষ জগৎ এবং বাস্তব জীবনকেই সত্য বলিয়া মানেন। সাহিত্য রচনাতেও তাঁহারা এই দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারাই পরিচালিত হন।

ইতিপূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতার কথা অজানা না থাকিলেও, অতি কঠিন বাস্তবের চিত্র ফুটিয়া উঠিল বিখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকায়। গোকুলচন্দ্র নাগ দীনেশ রঞ্জন দাসের সহযোগিতায় 'কল্লোল' প্রকাশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কল্লোলগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল: ইহাতে যোগদান করিলেন 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল, 'দেহের রহস্যে বাঁধা' জীবনবাদের কবি মোহিতলাল, 'কয়লাকুঠী'র গল্পধারার লেখক শৈলজানন্দ, দেহানুগ বাস্তব প্রেমের রূপকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অমৃত-পিপাসু হইয়াও 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' মানবের কবি বুদ্ধদেব বসু, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী' মানব-দেবতার এবং বিশেষ করিয়া মুটে-মজুর-ইতরের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। মানবতন্ত্রতার বাণীই কল্লোলের প্রাণ-বাণী: এই বাণী বিক্ষোভে, বিদ্রোহে, উদ্দামতায় ও দেহোন্মাদনায় গর্জ্জমুখর হইয়া উঠিয়াছে। 'কল্লোল'-এর সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ ভাবের সাহিত্য-সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

[১] ইশারা—অন্নদাশঙ্কর রায়

আধুনিক বাঙলা সাহিত্য আরও অগ্রসর হইয়াছে: 'কল্লোল'-এর উদ্দামতা আজ প্রশমিত হইয়াছে, তাহাতে বাজিতেছে জীবনের বহুবিচিত্র কলরোল। ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ জীবনবাদের সুরও ইহাতে অনুরণিত হইতেছে। রচনা-প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যের দিক হইতেও এ সাহিত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহার স্বরূপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন:

> একে বলা যেতে পারে, বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের; আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা— এর সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে। [১]

বস্তুতঃ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যকে কোন বিশেষ লক্ষণে সনাক্ত করা যায় না। তবে ইহার বহু বিচিত্র কলতানের মধ্যে জীবনবাদের ঐকতান অবশ্যই ধরা পড়ে। মানবতন্ত্রতার বাণীকে রূপায়িত করাই ইহার মুখ্য লক্ষ্য: 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'—এই সুরটিই ইহার প্রধান সুর। পীড়িত মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির বাণীতে ইহা পূর্ণ: যে নীতি, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ এই মুক্তির পরিপন্থী, তাহার বিরুদ্ধে ইহার সংগ্রাম ও প্রতিবাদ। এই প্রকার সাহিত্যের লক্ষণ ও স্বরূপ সম্পর্কে একজন সুধী পণ্ডিত বলেন:

> ইহার ভিত্তি হইতেছে বাস্তবিকতা (Realism)। ইহাতে নিরাশা, অতীন্দ্রিয়বাদ, হা হুতাশ নাই···আছে সংগঠনের কথা, আছে আশার কথা, আছে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আস্বাদনের কথা, আনন্দের কথা। [২]

এই স্বরূপ লক্ষণের মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ সুপরিস্ফুট।

[ঘ] সর্ব্বমত সমন্বয়

আমরা সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে ওদেশের ও এদেশের বিভিন্ন পন্থী, বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতবাদ উল্লেখ করিয়াছি। তাহা দ্বারা সাহিত্য যে কত বিচিত্র রূপ, মনোভাব ও রসের প্রতিমূর্ত্তি তাহা সহজেই অনুভবগম্য। প্রথমতঃ সাহিত্য 'সত্যের রূপায়ণ'; এই সত্য কোথাও বস্তুসত্য, কোথাও

১ 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা—বুদ্ধদেব বসু

২ সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।

বস্তু-অতিরিক্ত সত্য। কেহ বলিয়াছেন, সাহিত্য সমাজের প্রতিকৃতি ('Transcript of the contemporary Societies'—Taine); কেহ বলিয়াছেন, ইহা 'Criticism of life' (Arnold); ভারতীয় আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ রীতিকে বলেন কাব্যের আত্মা—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' (বামন), কেহ বলেন, অলঙ্কারই কাব্যের প্রাণ; তাঁহাদের প্রধান সিদ্ধান্ত—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' (বিশ্বনাথ)। বঙ্গীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন, কেহ বা রস-প্রতিপত্তিকেই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য বলিয়াছেন এবং বেশির ভাগ লেখক ইহাকে 'স্বভাবের অনুকরণ অথচ স্বভাবের অতিরিক্ত'—বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সাহিত্যের মধ্যে আমরা মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করি, ইহাতে সুন্দরের রূপ অঙ্কিত দেখিতে পাই; সাহিত্য হইতে আমরা রসাস্বাদন করি এবং আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। এক কথায় সাহিত্য সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ('Beauty personified'), ইহা মূর্ত্তিভূত আনন্দ ('Objectified pleasure'), ইহা রসাত্মক। উপরন্তু আমরা ইহাও দেখি যে, কোন কোন সাহিত্য যুগাতিক্রান্ত হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। কবি Milton বলেন,

> A good book is the precious life blood of a master-spirit, embalmed and treasured up on a purpose to a life beyond life.

এখন প্রশ্ন, কিসের গুণে সুদক্ষ শিল্পীর শিল্পকৃতি বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সাহিত্য চিরকাল বাঁচিয়া থাকে? কিসের গুণে ইহা চিরসুন্দরের অধিষ্ঠান-ভূমি হয়? কিসের গুণে সর্ব্বকালের, সর্ব্বমানবের আনন্দের সামগ্রী হইয়া ইহা শাশ্বত আসন দাবি করে? কিসের গুণে ইহা সহৃদয়জনের হৃদয়সংবাদী হইয়া উঠে? প্রশ্নের এই উত্তরটি হইতেই সাহিত্যের চিরন্তন সংজ্ঞার্থ নির্ণীত হইতে পারে।

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 'সামঞ্জস্যের সুষমা' সকলের মনেই সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করে। যেখানেই মানুষ একটা সঙ্গতি, একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পায়, সেইখানেই সে সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয়। বিশেষ করিয়া নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আকুতি, অনুভূতি ব্যক্তি মাত্রেরই অতি প্রিয়। কোন একটি বস্তুকে

প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই বস্তুটির সহিত জীবনের এই সকল আনন্দ-বেদনার সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই আমরা আনন্দিত হই এবং বলিয়া উঠি, 'বাঃ, সুন্দর!' শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্পকৃতির মধ্যে এমন কিছু থাকে, যাহা দর্শন বা শ্রবণ করিবামাত্রই—দর্শক বা শ্রোতা অবিলম্বে এই সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করে। তাহাতেই মানুষ তৃপ্তি পায়, আনন্দ অনুভব করে এবং তাহাকেই সে বলে 'সুন্দর'।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, শিল্প-সাহিত্যের সহিত জীবনের সম্পর্কটি অতি নিবিড়ঃ কেহ কেহ জীবনের প্রকাশকেই ('Interpretation of life') সাহিত্য সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। বিচিত্র মানুষের জীবন—রূপে-রসে অনুপম, স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। কত তাহার ভঙ্গি, কত তাহার লীলা! প্রকৃতির সহিত তাহার সংগ্রাম, বিশ্বের পথে তাহার যাত্রা, দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি। কত উত্থান, কত পতন! বৈদিক সূক্তের পুরুষের মতই সে যেন সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাৎ। মানুষই 'মহতো মহীয়ান', আবার এই মানুষই অতি হীন, অতি কুটিল, অতি জঘন্য :

'Great lord of all things, yet a prey to all,...
The glory, jest and riddle of the world' (Pope)

শিল্প-সাহিত্য এই মানবজীবনেরই প্রকাশ, তাহার প্রতিচ্ছবি। সুখেদুঃখে ব্যঞ্জিত যে জীবন, প্রকৃতির তাড়নায় ঘূর্ণ্যমান যে জীবন, মহান্ যে জীবন, অতি কদর্য্য যে জীবন, তাহাই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। তাই সমালোচক বলেন,

Literature is the expression of life through
the medium of language. (Hudson)

এই যে জীবন, ইহাই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'সত্য', 'প্রকৃতি', 'স্বভাব', 'বাস্তব' 'ট্রুথ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের এই যে জীবন, ইহা কি বিশেষ জীবন (particular), না অন্য কিছু? অবশ্য শিল্পী যে জীবনের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করেন বা দর্শক যে জীবনের প্রতিরূপ দেখিয়া পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হন, তাহা এক হিসাবে যুগ-ধৃত, বিশেষ সমাজ ও কালের শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শপুষ্ট জীবনই বটে। সাহিত্যিক বা পাঠক—কেহই নিজের জাতি, সমাজ ও কালের বন্ধনকে অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রত্যেক সাহিত্যই এই দিক হইতে বিশেষ জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও যুগধর্মাশ্রিত জীবনের প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠে।

কিন্তু জীবনের আদর্শ তো পরিবর্ত্তনশীল, সমাজের রূপ ও রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত জীবনের আকৃতি ও প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা হইলে কেমন করিয়া এক যুগের সাহিত্য অন্য যুগের পরিতৃপ্তি সাধন করে? বিশেষ দেশের সাহিত্য অন্যদেশে সমাদৃত হয়? ভারতবর্ষের কালিদাস কেমন করিয়া ইউরোপের রসতৃষ্ণা মিটায়? ইংলণ্ডের শেক্সপীযর জগৎবাসীর প্রিয় হইয়া উঠে? বাঙালী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির গৌরব লাভ করেন? তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে-কোন জাতি, যে-কোন সমাজ ও রাষ্ট্র, যে-কোন বিশেষ যুগাশ্রিত হইযাও এমন কোন লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ করে, যাহা যুগাতিশায়ী এবং সার্ব্বজনীন। সত্যই তাই। সাহিত্যের 'জীবন' দেশ ও কালাতিক্রান্ত 'জীবন', সাহিত্যের 'সত্য' বিশেষ 'সত্য' নয়—নির্ব্বিশেষ (Universal) সত্য। এ 'জীবন' আপেক্ষিক হইয়াও সকল বন্ধন-নিরপেক্ষ। মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি চিরন্তন ভাব আছে, যাহা সকল দেশ, সকল যুগ, সকল মানবেরই একান্ত আপনার,—তাহা সার্ব্বজনীন; তাহাতে আছে, 'Agreement with the general sense of mankind'। এই ভাবগুলির মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কোন কোন ভাব অতি সুন্দর—মানুষের চিরন্তন প্রেমের আকৃতিময়, চিরন্তন হাসির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, আবার কোন ভাব অতি ঘৃণ্য, অতি ভয়াল—তাহাতে স্বভাবতঃই নাসিকা কুঞ্চিত হয়, হৃদয়ে ভয়ের ভাব জাগে। শকুনি কুটিল, মন্থরা অতি অনুদার, ফলষ্টাফ মিথ্যাবাদী, ইয়াগো অনিষ্টকারী, ভাড়ু দত্ত শঠ ও প্রবঞ্চক: তথাপি ইহারা সকল যুগের সকল মানুষের প্রিয়—কারণ ইহারা এক একটি চিরন্তন ভাবের প্রতীক। তেমনই চিরন্তন উত্তম ভাবের প্রতীক রামচন্দ্র, ভীষ্ম, হেক্টর, ইউলিসিস্। চিরন্তন ভাবের প্রতিমূর্ত্তি এই 'জীবন'ই দেশ কালোত্তীর্ণ জীবন: ইহাই সাহিত্যের 'সত্য' বা 'জীবন'। দেশ ও কালের রুচির পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও এ 'জীবন' অপরিবর্ত্তনীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> যে সৌন্দর্য্য, যে প্রেম, যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতঃই উদ্বোধিত হয়েছে, তার তো বয়সের সীমা নেই, কোন আইনষ্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না, বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ, সে সেকেলে ফিলিষ্টাইন। ··সাহিত্য সর্ব্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন

বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চির পুরাতনের চির নূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা।[১]

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে এই জীবন যখন প্রতিবিম্বিত হয়, তখন মানুষ তাহারই সহিত নিজের যুগ-ধৃত জীবনের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়, পুলকিত হয়। সাহিত্য এই ভাবেই জীবনের সহিত জীবনের, এক দেশের সহিত অন্য দেশের, এক কালের সহিত অন্য কালের 'সহিতত্ব' সম্পাদন করে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ এইরূপ কাব্যকেই বলিয়াছেন রসাত্মক কাব্য—ইহা 'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী'। পাশ্চাত্ত্য মনীষীবৃন্দ এই সাহিত্যকেই বলিয়াছেন, 'Pleasure of Imagination' (Addison) ; ইহা যেমন 'Expression of life' তেমনই 'Objectified pleasure' ; ইহা সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি। এইরূপ সাহিত্যই চিরকাল মানুষের রস-পিপাসা, সৌন্দর্য্য-পিপাসা, আনন্দ-পিপাসা নিবৃত্ত করে,—তাই ইহা কালজয়ী,—ইহা স্বভাবানুগ হইয়াও স্বভাবাতিরিক্ত। অতএব সর্ব্বমতের সমন্বয় করিয়া বলা যায়,

> বিশেষ সমাজ বা রাষ্ট্রের পট-ভূমিকায়, বিশেষ যুগাশ্রিত ভাব যখন চিরন্তন মানবীয় ভাবে রূপান্তরিত হইয়া কবিপ্রতিভা বলে প্রতীয়মান শব্দার্থের কৌশলে রসরূপ আস্বাদ্যমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা হয় সাহিত্য,—

অথবা আরও সংক্ষেপে বলা যায়,

> সাহিত্য মানব জীবনের রসব্যঞ্জনাময় বাণীমূর্ত্তি।

[১] সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া

সাহিত্য লেখকের বিচিত্র অনুভূতির বাঙ্ময় রসরূপ : ইহা আবার সহৃদয় পাঠকের 'হৃদয়সংবাদী'। কাব্য-রসের আস্বাদক সহৃদয় সামাজিক— এইদিক হইতে তাহার একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। সৃষ্টির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে কবির। তাঁহার 'আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা' হইতেই কাব্যের জন্ম : কাব্য-সৃষ্টির ব্যাপারে কবি প্রজাপতির ভূমিকায় অধিষ্ঠিত—'অপারে কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ'।

Milton-এর Paradise Lost কাব্যে দেখি, ঈশ্বর সৃষ্টিপত্তন করিলেন : তিনি অন্ধকারে আলো সৃষ্টি করিলেন, সুন্দর প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন, স্বর্গ সৃষ্টি করিলেন : 'Now heaven in all her glory shone' : কিন্তু কে এই সুন্দর সৃষ্টি উপভোগ করিবে? কে ঈশ্বর-কৃত সৃষ্টির জয়গান করিবে? তাহার জন্য তিনি সৃষ্টি করিলেন মানুষ. 'And in His own image He created man'.

কাব্য-সৃষ্টিতে কবি ঈশ্বরতুল্য। যেমন Bible-এ, তেমনই ভারতীয় দর্শনে, প্রজাপতিই সৃষ্টিকর্তা। 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়,'—তিনি ভাবিলেন, 'এক' আমি 'বহু' হইব। এই কল্যাণী ইচ্ছার প্রেরণায় অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেন : বিরাট অন্ধকারে আদিত্যবর্ণ জ্যোতির রূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন। [illegible] সৃষ্টি। সৃষ্টির ভোক্তা মানুষও ঈশ্বরের সৃষ্টি। [illegible]

শিল্প-সৃষ্টিও এই সৃষ্টি-লীলার প্রতিরূপ। শিল্প-কর্মের মধ্যে শিল্পীই ইহাই প্রকাশ করেন; তাই কেহ কেহ শিল্প-কর্মকে বলেন, Pro[illegible]on [illegible] কিন্তু সৃষ্টির ভোক্তা মানুষ যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁহারই প্রতি[illegible] আস্বাদক সহৃদয়জনও কি শিল্পীর সৃষ্টি, তাহার প্রতিরূপ? আলঙ্কারি[illegible] বলেন, হাঁ—তাহাই। রসিকের যে-মনে রসপ্রতীতি হয়, তাহার তন্ময়ী[illegible] যোগ্যতা কবির সৃষ্ট কাব্যানুশীলন দ্বারাই সম্ভব। অতএব এক হি[illegible] কাব্য যেমন কবি-আত্মার প্রতিরূপ, রসিকের মনটিও তাঁহা[illegible] মনের প্রতি[illegible] রসিক-মনের সহিত এক হইয়াই কবি 'হৃদয়সংবাদী' কাব্য-সৃষ্টি করেন। [illegible] গৌরব স্রষ্টারই বটে।

এখন প্রশ্ন, কবি কিভাবে কাব্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন?—সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যের সৃষ্টি-কৌশল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সুসূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতীচ্যের সমালোচকবৃন্দও এই সৃষ্টি-কৌশলকে নানাদিক হইতে বিচার করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। Plato বলেন:

> All, the artists can make, is a copy of the copy, to hold up a mirror to nature in which, as he turns it, whether he wills it or not, are reflected sun and heavens, earth and man, anything and everything.

Plato-এর মতে আর্ট সত্যের আর্শি। এই আর্শিতে শিল্পী প্রত্যক্ষ সত্যকে প্রতিফলিত করেন। সাহিত্য-সৃষ্টির ইহা একটি কৌশল বটে। এক শ্রেণীর বস্তুবাদী সাহিত্যিকও সাহিত্যে রূঢ় সত্যের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, সাহিত্য Real as it is: কিন্তু Plato যেমন সত্যের রূপায়ণে নৈতিক আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন, বস্তুবাদী লেখকগণ সেই 'Inter-dependance of art and morality'—স্বীকার করেন না, তাঁহারা মানেন, 'Freedom of art'

Plato-প্রচারিত Truth কথাটিকে মনীষী Aristotle অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, সৃষ্টিমূলক সাহিত্য যে-সত্যকে রূপায়িত করে—তাহা বস্তু সত্য বা তথ্যসত্য নয়, তাহা অন্যরূপ সত্য। কিন্তু কোন্ প্রক্রিয়ায় বস্তু-সত্য সাহিত্য-সত্যে রূপান্তরিত হয়, Aristotle তাহা নির্দেশ না করিয়া, সাহিত্য-সৃষ্টির কতকগুলি বহিরঙ্গ উপায়ের কথা বলিলেন: সাহিত্যে Plot [illegible], Character থাকিবে, Sentiment থাকিবে ইত্যাদি।

[illegible]বির সৃষ্টিকলাপ যে মানস-ব্যাপার, ইহা যে কবির মনন-কল্পনার অপূর্ব [illegible] একথাটিকে প্রথম সুস্পষ্ট করিলেন Addison: বস্তুসত্য কিভাবে কল্পনায় কাব্যসত্যে রূপান্তরিত হয়, মনোবিজ্ঞানের পটভূমিকায় তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্যকে তিনি বলিয়াছেন Pleasure of [illegible]gination. 'Pleasure' শব্দটির দুই অর্থ—এক লীলা, অপর আনন্দ। [illegible]ার দিক হইতে শিল্প 'কল্পনার লীলা', স্রষ্টার দিক হইতে শিল্প 'কল্পনার [illegible]নন্দ।' উভয়তই কল্পনা (Imagination) যে কোন শিল্পকর্মের ভিত্তিভূমি।

Addison-এর সময়ে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে, ভাবযোগ অর্থাৎ association [illegible] ideas-কে স্বীকার করা হইয়াছিল। Addison লক্ষ্য করিয়াছিলেন শিল্প-

কর্ম্মে যে বস্তুসত্যকে রূপান্বিত করা হয়, তাহা ভাবযোগে বাস্তব সত্য হইতে অন্তরূপ সত্য হইয়া উঠে। শিল্পী কল্পনাদ্বারা যে সত্যকে শিল্পকর্ম্মে রূপ দেন, দর্শক (Spectator) ভাবযোগে তাহাকে আরও অধিকতর সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। এই নিরীক্ষা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যাহা কল্পনার আনন্দবিধায়ক তাহাই শ্রেষ্ঠ শিল্প।

মনের যাবতীয় ক্রিয়াকে Addison 'কল্পনা' (Imagination) নামে অভিহিত করিয়াছেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর্গ এক মনেরই বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিয়া—মনের এক একটি ক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু Addison বলেন :

> There is no such division in the soul itself, since it is the whole soul that remembers, understands, wills or imagines.*

—স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা এক অন্তঃকরণেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম : অন্তঃকরণই স্মৃতি-বুদ্ধি, ইচ্ছা-কল্পনার প্রেরক, উদ্বোধক ও প্রকাশক। মনের এই বিভিন্ন ক্রিয়াকে Addison এক 'Imagination' বা 'Fancy'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বস্তুবিশ্বের সহিত অন্তরের সংযোগ দুইপ্রকারে সংসাধিত হয় : প্রথমে—প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে মনে বস্তুর ছাপ পড়ে; দ্বিতীয়তঃ ভাবযোগে বা স্মৃতির সহায়তায় মনে বস্তুর প্রতিরূপ অঙ্কিত হইতে পারে। আদৌ দৃষ্টির মাধ্যমেই বস্তু মনের গোচরীভূত হয়। স্মৃতিশক্তির সহায়তায় মন এই চিত্রকে স্মরণ করিয়া রাখে। চিত্র দেখিয়া বা সাহিত্য পাঠ করিয়া দ্রষ্টা বা পাঠকের অন্তরে স্মৃতির সূত্র ধরিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর পুনরুজ্জীবন ঘটে। এইজন্য দৃষ্ট বস্তুটি প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টির সম্মুখে না থাকিলেও, প্রত্যক্ষের স্মৃতি ধরিয়া তাহা যেন পুনঃপ্রত্যক্ষ হয়। স্মৃতির সাহায্যে বা ভাবযোগে যে সত্যের দর্শন হয়, তাহাই সাহিত্যের সত্য। ইহা সর্ব্বথা কল্পনার আনন্দ-বিধায়ক বলিয়া শ্রেষ্ঠ শিল্প বা সাহিত্যকে Addison বলেন, কল্পনার প্রসাদ (Pleasure of Imagination).

এইভাবে Addison দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে কল্পনার একপ্রকার স্ফূর্ত্তি ঘটে : আবার দৃষ্ট বস্তুটি চোখের সম্মুখে না থাকিলেও কল্পনার আর একপ্রকার স্ফূর্ত্তি হয়। কল্পনার অত্যাশ্চর্য্য লীলায় দৃষ্টি-বহির্ভূত দৃশ্যবস্তুটি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াও মনকে আনন্দাভিভূত করে।

* Spectator

সাহিত্য-শিল্প হইতে মানুষ এই দ্বিতীয় প্রকারের আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে। সাহিত্য যে 'সত্য'কে প্রত্যক্ষ করায়, তাহা অধিকতর 'সত্য'—সাহিত্য যে আনন্দকে অনুভব করায় তাহা আরও আনন্দদায়ক।

কারণ, মানুষের হৃদয় বস্তুবিশ্বে যাহা দেখে, তাহা হইতেও পূর্ণতর কিছু দেখিতে চায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পূর্ণতার অভীপ্সা রহিয়াছে। বস্তু বিশ্বের সাধারণ 'সত্য'-দর্শনে এই অভীপ্সা পরিপূর্ণ হয় না। বস্তুসত্য নানাদিক হইতে অপূর্ণ ও আকর্ষণ-বর্জ্জিত, মানুষের চরম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইহা কোনক্রমেই নিবৃত্ত করিতে পারে না ; মানুষের হৃদয়ে যে সমুন্নত পরিপূর্ণ সত্য ও সুন্দরের ধারণা রহিয়াছে -স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। মানুষের অত্যাশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি এই অভীপ্সাকে পূর্ণ করে। কবির কল্পনা 'অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণক্ষমা'। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য হইতেও অধিকতর 'Great, Strange and Beautiful'-কে দেখাইতে পারে। কারণ, কবি-শিল্পী স্বভাবের অনুলিপিই মাত্র গ্রহণ করেন না, বস্তুর ফটোগ্রাফ মাত্র তুলেন না, কল্পনার সমুচ্চ ধারণাকে চরিতার্থ করিবার জন্য বাস্তব প্রকৃতি হইতে 'রকমারি বাছিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া, ঝালিয়া কাটিয়া ছাটিয়া, চোস্ত-দোরস্ত করিয়া, যার পর যেটি বসিলে মনের মত হয়' -সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কল্পনার সমুচ্চ অভীপ্সাকে পূর্ণ করিবার জন্য এইভাবে স্বভাব হইতে পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়া কবি যাহা গ্রহণ করেন, পাঠকের আনন্দবিধানের জন্য তাহাকেই আবার তিনি শব্দের মুন্সীয়ানায় বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শব্দ-কৌশলেও বাস্তব অধিকতর সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠে। কিভাবে কবি বস্তুকে কাব্যে রূপান্তরিত করেন Addison তাহার প্রক্রিয়াটিও বর্ণনা করিয়াছেন :

> In this case the Poet seems to get the better of Nature ; he takes, indeed the Landskip after her, but gives it more vigorous Touches, heightens its Beauty, and so enlivens the whole Piece that the Images which flow from the Objects themselves appear weak and faint in comparison of those that come from the Expressions. *

অতএব দেখা যাইতেছে, কল্পনার আনন্দ বিধানের জন্য কবি বস্তুজগৎ হইতে

---

* Spectator—Addison.

কল্পনায় আনন্দদায়ক সামগ্রী আহরণ করিয়া, তাহাকে কল্পনার প্রসাদক রূপে সুন্দরতর করিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই Addison-এর মতে আর্ট হইতেছে Pleasure of Imagination

পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রায় সকল সমালোচকই সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় কবি-কল্পনার অত্যাশ্চর্য্য শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবি-কল্পনা দ্বারাই বাহিরের বস্তু সাহিত্যের বিষয় হইয়া উঠে। কল্পনার সহায়তায় কবি অপূর্ণকে পূর্ণতা প্রদান করেন, জীবনের সাধারণ সুরগুলিকে আরও সুমধুর করিয়া তুলেন। তাই কাব্য-সাহিত্য কেবল ফটোগ্রাফ বা দর্পণের প্রতিবিম্ব মাত্র হইয়া থাকে না : ইহা হয় Imitation, ইহা হয় Pleasure of Imagination.

প্রত্যক্ষ সত্যের বা প্রাকৃত বস্তুর এই রূপান্তর দার্শনিক Croce-ও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনিও দেখিয়াছিলেন, বস্তুর অনুকৃতি মাত্রই আর্ট নয়—'Art is the idealization or idealizing imitation of nature.'—শিল্পী হুবহু বস্তুকে অনুকরণ না করিয়া বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবকে অনুকরণ করেন। শিল্পীর এই ক্রিয়াকে Croce বলেন, Poetic idealization ; বিশেষ ভাবগুলিকে কবি তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া এই Poetic idealization দ্বারা তাহাদিগকে এমন এক নির্ব্বিশেষ মূর্ত্তি প্রদান করেন, যাহার ফলে চঞ্চল লৌকিক ভাব এক শান্ত, আনন্দঘন রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। Croce-এর মতে Poetic idealization একটা কথার কথা নয়, একটা বাইরের অলঙ্করণ মাত্র নয়—ইহা বস্তুর আন্তর ধর্ম্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ। কবি বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিয়া এমনভাবে তাহাকে প্রকাশ করেন যে, তাহাতে আপাতচঞ্চল ভাবগুলি একটা 'ভাবস্থির' রসরূপ পরিগ্রহ করে :

> For poetic idealization is not a frivolous embellishment,
> but a profound penetration, in virtue of which we pass
> from troublous emotion to the serenity of contemplation.
>
> (Croce)

Croce মনে করেন, যে-কবি এইরূপ রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ হন না, তিনি কখনও নিজে বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ (Pure Poetic joy) উপলব্ধি করিতে পারেন না, অপরের মধ্যেও সে উপলব্ধি সঞ্চার করিতে পারেন না। বস্তুতঃ বহির্বিশ্বের 'সত্য'কে স্থায়িভাবের আস্বাদ্যমান রসে রূপান্তরিত করার মধ্যেই কাব্যসৃষ্টির কৌশলটি নিহিত।

সাহিত্যের এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রহিয়াছে ভারতীয় রসবাদী আলঙ্কারিকদের আলোচনায়। তাঁহারা বলেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কবির লক্ষ্য রসসৃষ্টি করা। কিন্তু রসপরতন্ত্র হইলেও কাব্য দুনিয়াছাড়া নয়: ইহাতেও থাকে জীবন্ত জীবনের স্পর্শ। লৌকিক ভাব ইহার মুখ্য অবলম্বন। মানব হৃদয়ের চিরন্তন ভাবগুলিকেই কবি সহৃদয় জনের আস্বাদনের উপযোগী রসে রূপান্তরিত করেন। কাব্য মানুষের শাশ্বত হৃদয়ভাবের রসব্যঞ্জিত রূপ বলিয়াই নিখিল আত্মা ইহাতে তন্ময় হইয়া যায়। কাব্যের মধ্যে সহৃদয়জন নিজ হৃদয়ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান।

কবির প্রতিভাই প্রত্যক্ষ জগতের ভাব ও বস্তুকে অলৌকিক রসমূর্ত্তি প্রদান করে। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে, কাব্যসংসারে কবি প্রজাপতি সদৃশ। প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টিলীলা যেমন বিস্ময়কর, কবির সৃষ্টিলীলাও তেমনই বিস্ময়কর। কবি প্রতিভাকে বলা হয়, 'অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। এই প্রতিভার স্পর্শ দিয়া কবি কাব্যরূপ 'অপূর্ব্ব বস্তু' নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। লৌকিক জগতের ভাব ও চেষ্টা লইয়াই কবি-প্রজাপতির লীলা। এই ভাবই কবির অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণকুশলতায় নানারূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া রসিকজনের হৃদয়বেদ্য আনন্দস্বরূপ রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের কাব্য-সৃষ্টির তত্ত্বে মানুষের চিরন্তন আশা-কামনা, তাহার মনের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। রসসৃষ্টিকে অনেকেই বাস্তব-বিমুখ, কল্পনা-সর্ব্বস্ব বলিয়া অভিযোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহারা এদেশীয় রসসৃষ্টির মূলতত্ত্ব ভাল করিয়া জানেন না। জানিলে, অবশ্যই তাঁহারা দেখিবেন, এদেশের কবিগণ বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তিতেই কাব্যসৃষ্টির পথে অগ্রসর হন। মানব জীবনের বহুবিচিত্র কামনা-বাসনা, আকৃতি, হাবভাব, চেষ্টাই কাব্যে রূপায়িত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে অধিকাংশস্থলেই দেব-চরিত্র বর্ণনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেবতা আদ্যোপান্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র মানুষ, মানুষের মতই তিনি পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল—শোক-দুঃখের অধীন: তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণ মানুষের মত। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ মানুষ, 'মনুষ্যের ন্যায় মানব-ধর্ম্মাবলম্বী'। অতএব বলা যায়, মানবজীবন এবং প্রত্যক্ষ সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ভারতীয় কবিগণ স্বীয় প্রতিভাবলে অপূর্ব্ব বস্তু রচনা

করিয়াছেন : বাস্তব সত্যই কবির নির্ম্মাণ-কুশলতায় রসব্যঞ্জিত অলৌকিক রূপ লাভ করিয়াছে।

বস্তুসত্যই কবির সৃষ্টিকৌশলে কাব্য সত্যে রূপান্তরিত হয়—এই তত্ত্ব সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যাচার্য্যগণও কাব্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াসম্পর্কে অনুরূপ মতবাদই পোষণ করেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিখ্যাত সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সকলেই এই তত্ত্বকে সমর্থন করিয়াছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে রবীন্দ্রনাথের মতটির আলোচনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

> বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখদুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষ-রূপে আপনার করিয়া লই। (সাহিত্যের তাৎপর্য্য)

অবশ্য সকলের মনেই যে বাহিরের জগৎ বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে তাহা নয়। জগতে এমন 'সৌভাগ্যবান' লোক আছেন, যাঁহাদের বিস্ময় প্রেম কল্পনা সর্ব্বত্র সজাগ। বিশ্বজগতের বিচিত্র-ধ্বনি তাঁহাদেরই চিত্ত-বীণায় ঝঙ্কার তুলিতে সমর্থ হয়। নিখিল বিশ্বের অপরূপ রূপ, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য তাঁহাদেরই চিত্ত-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। এই 'সৌভাগ্যবান' ব্যক্তি বাহিরের জগৎটিকে নিজের মনের মত করিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করেন, নিজের মনের মত করিয়া নিজ হৃদয়ে আর একটি জগৎ নির্ম্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হৃদয়ে এই যে অন্তর্জগৎটি নির্ম্মিত হয়, তাহার ভাষাময় প্রকাশই সাহিত্য :

> বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা-রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য। (সাহিত্যের তাৎপর্য্য)

কবি বহিঃপ্রকৃতিকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে নিজের মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতনভাবে রচনা করিয়া থাকেন। কবির অন্তরে যে জগৎ

নির্মিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগতের মত নয়। প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক সত্য 'জড়িত-মিশ্রিত ভগ্নখণ্ড ক্ষণস্থায়ী'। এখানে ভাল-মন্দ, প্রধান-অপ্রধান, সামান্য-অসামান্য একত্র মিশ্রিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালা হইতে কবি যখন চিত্র গ্রহণ করেন, তখন স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া, বাছিয়া গ্রহণ করেন। যেগুলি অস্পষ্ট, অপরিচিত ও অপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, কবি তাহাদিগকে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া তুলেন: তিনি নিজের হৃদয়দর্পণে প্রত্যক্ষ সত্য হইতেও 'অধিকতর সত্য' পরিপূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ভাবেই কবির হৃদয়ে এক নূতন মানসিক জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রাকৃত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এই যে মানসিক জগৎ কবির হৃদয়ে গড়িয়া উঠে, ইহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কবি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের অদম্য আগ্রহ বর্তমান। ইহা মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। মানুষ ব্যাপ্ত হইতে চায়, নিজের মনোভাবকে অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করিয়া দিতে চায়। সে কাল হইতে কালে, মন হইতে মনে অমর হইয়া থাকিতে চায়। এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়া 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।' এই প্রকাশ-ব্যাকুলতা হইতেই সাহিত্যের জন্ম।

সাহিত্যের এই প্রকাশ-ক্রিয়ায় অনেকটা পূর্ব্বের মতই কাজ চলিতে থাকে। কবি প্রাকৃতিক জিনিসকে নিজের মনের মত করিয়া মানসিক করিয়া লন সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে আবার সর্ব্বসাধারণের মত করিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ কবি প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণের জিনিসকে আত্মসাৎ করিয়া লন, তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া তুলেন, সাহিত্য সেই ব্যক্তিগত জিনিসকেই আবার সর্ব্বসাধারণের করিয়া বাহিরে প্রকাশ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।
>
> (সাহিত্যের সামগ্রী)

উভয় ক্ষেত্রেই কর্ত্তা কবির মন। প্রথমে.২৬) রচি প্রাকৃত জগৎ হইতে মানস জগৎ নির্ম্মাণ করে, তাহা কবির 'হৃয়। সাধনা p তাহার পরে যাহার সাহায্যে সাহিত্যিক সেই ব্যক্তিগত ~ুর করিয়া সকল করিয়া তুলেন তাহা কবিরই অন্তর্গত আর একটি মাবে ক্রমে নন্তো তাহাকে বলেন 'বিশ্বমানবমন'।

ইহাই কবির প্রতিভা। ইহা অন্তরের জিনিসকে বিশ্বমানবের, ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া গঠন করে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, একই কবির অন্তঃকরণের দুইটি অংশ। একটি অংশ কবির ব্যক্তিগত অর্থাৎ 'নিজত্ব'। ইহাদ্বারা কবি নিজের রুচি অনুযায়ী প্রাকৃতজগতের অনুরূপ মানসিক জগৎ নির্ম্মাণ করেন। আর একটি অংশ কবির 'মানবত্ব': ইহাদ্বারা কবি সর্ব্বসাধারণের রুচি অনুযায়ী 'নিজত্বে'র সৃষ্ট জগৎ হইতে উপাদান লইয়া সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সাহিত্য রচনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কবিকে বিশ্বমানবমনের চিরন্তন আকূতি ও রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

'বিশ্বমানব-মনে'রও বিশিষ্টতা এই যে, সেও খণ্ডতাকে নয়—অখণ্ডতাকে, অপূর্ণকে নয়- পরিপূর্ণতাকে, খণ্ডিত মানুষকে নয়—গোটা মানুষটাকেই জানিতে চায়। প্রাকৃত সত্যের বস্তু দিয়া তাহার হৃদয় ভরে না। কারণ, প্রাকৃত জগতে যাহা দেখা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ। তাহার মধ্যে অনেকখানিই 'অপ্রত্যক্ষ', অজানা থাকিয়া যায়। এমন কি বাস্তবের অতি পরিচিত মানুষটিরও খানিকটা ছায়া, খানিকটা অস্পষ্ট। সাহিত্য এই অজানাকে জানায়, অপ্রতক্ষ্যকে গোচরীভূত করে, অস্পষ্টকে ব্যঞ্জনামধুর করিয়া তুলে, পূর্ণকে পরিপূর্ণতা দান করে; 'সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ প্রতীয়মান'; শুধু তাই নয়,—

> সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায় অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আল্‌গাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। (সাহিত্যের বিচারক)

সাহিত্যিক তাহার 'বিশ্বমানবমন' বা 'মানবত্ব' বা সৃজনীশক্তি দ্বারাই এই অসাধ্য সাধন করেন। কল্পনা হয় তাঁহার সহায়। কল্পনা অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণের মত অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে। কিন্তু স্রষ্টা সাহিত্যকারের 'মানবত্ব': 'সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা'।

সাধারণের করিয়া করিতেছে, ...র কাজে শিল্পীকে সাধারণের রুচি এবং আকূতির দিকে লক্ষ্য ...ত্র এবং সেই গা... এক্ষেত্রে স্রষ্টা নিজের 'মানবত্ব'কেই প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনি ...ক নিজের অন্তরে গ্রহণ ...রিত করিয়া 'বিশ্বমানবমন' দিয়া সকলের ভাবকে আত্মসাৎ ক... করিয়া সাহিত্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এমন কি, কবি যে কালে ও যে স্থানে বা যে বিশেষ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থান, কাল ও পাত্রের দিকেও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আঞ্চলিক ও তাৎকালিক ভাবের সহিত, রুচির সহিত লেখকের অজ্ঞাতসারেই একটা যোগ সাধিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই :

> দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে। যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না ; ইহাতে বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে। (সাহিত্য সৃষ্টি)

কিন্তু তৎ-স্থানিক বা তৎ-সাময়িক হওয়া অপেক্ষাও, সাহিত্যের লক্ষ্য বিস্তৃততর। রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিশ্বমানবের হৃদয়ে অমরতার দাবিই সাহিত্যের চূড়ান্ত দাবি। সাহিত্য বহুকাল ধরিয়া বহু মানবের হৃদয়ে অমরত্ব প্রার্থনা করে। সাহিত্য যেখানে বিশেষ কালের, বিশেষ অঞ্চলের দাবি মিটাইয়াও চিরকালের বিশ্বমানবের মনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে, সেইখানেই তাহার অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এইজন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।' চিরকালের মনুষ্যসমাজ ও চিরন্তন জীবনই তখন সাহিত্যিকের লক্ষ্য। তখন তিনি 'নিজত্ব'কে 'বিশ্বমানবত্বে'র দিকে প্রসারিত করেন, নিজের সুখ-দুঃখকে, আশা-কামনাকে বিশ্বজীবনের সুখদুঃখ, আশাকামনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখেন। এইখানেই, কবি-ব্যক্তিত্বের চরম প্রসার ঘটে। এইখানেই সত্য-দর্শন হয়। তখন সমস্যা
সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন। নিজের অন্তরাত্মাকে সকলের মধ্যে যাহার
করেন। 'পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিন অনুভূতিও
ইহা দ্বারাই মানুষের বিকাশ বিস্তৃত হয়, ছোটত্বকে অতিক্রম াবন, সমাজ ও
বিরাটত্বের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়। এই উপলব্ধির মধ্যেই মানু ত সঞ্চয় করে—
ইহাই সত্যের উপলব্ধি, সুন্দরের উপলব্ধি, আনন্দের উপলব্ধি। র শব্দার্থময় দেহ।
প্রকাশই সাহিত্য। এই সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্য ; বহুমানবে লন,—
কালের জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপ সাহিত্য রচনা whole range
সাহিত্যিককে একপ্রকার সাধক হইতে হয়। সাধনা ery known
অহংকারের বাধা, স্বার্থপরতার বাধা দূর করিয়া সকল r.
উন্মোচিত করিতে হয়। এইভাবে ক্রমে সত্যের সৌ

উদ্ভাসিত হয়। তখন বিশ্বমানবের সহিত লেখক একাত্ম হইয়া সত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। চিরকালের বিশ্বসাহিত্যসৃষ্টির ইহাই মূলীভূত প্রেরণা ; ইহাই প্রকাশের চিরন্তন আবেগ :

> আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপ, অমৃতরূপকেই ব্যক্ত করিতেছে।
>
> (সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য)

৪

সাহিত্যের উপাদান

কবি ও আলঙ্কারিক রাজশেখর কাব্যপুরুষের উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছেন :

> অহো শ্লাঘনীয়োঽসি। শব্দার্থৌ তে শরীরং, সংস্কৃতং
> মুখম্, প্রাকৃতং বাহুঃ, জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচংপাদৌ
> উরো মিশ্রম্। সমঃ প্রসন্নো মধুর উদার ওজস্বী চাসি।
> উক্তিচণং চ তে বচো, রস আত্মা, রোমাণি ছন্দাংসি,
> প্রশ্নোত্তর প্রহেলিকাদিকং চ বাক্‌কেলিঃ, অনুপ্রাসোপমা-
> করিঃ দয়শ্চত্বামলংকুর্বন্তি।

অমাট কার প্রশংসনীয়। শব্দার্থ তোমার শরীর, সংস্কৃত তোমার মুখ, প্রাকৃত সাহিত্যিক বয়, অপভ্রংশ তোমার জঘন, পৈশাচভাষা পদযুগল, মিশ্রভাষা অসাধ্য সাধন ক তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য্য ও ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন দূরবীক্ষণের মত আ বস তোমার আত্মা, প্রহেলিকাদি তোমার বাককেলি, ছন্দ 'মানবস্থ' : 'সাহিত্য-অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার তোমার ভূষণ।

সাধারণের করিয়মূর্ত্তি এই কাব্যপুরুষের। রসাত্মাকে বাদ দিলে ইহার গঠনে আকৃতির দিকে লক্ষ্য চিত্র দান বিশেষ করিয়া সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে : এক— করেন অর্থাৎ তিনি দেহ, দ্বিতীয়—গুণ, রীতি, ছন্দ ও অলঙ্কার। রসসৃষ্টি কাব্য-সকলের ভাবকে আশ্রয় হইলেও কাব্য-নির্ম্মিতিতে এই দুইটি অঙ্গই অপরিহার্য্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—উভয় দেশের সমালোচকবৃন্দই সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এই দুইটি উপাদানকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকগণ একটিকে বলেন Matter, অপরটিকে বলেন Manner; Matter বলিতে বুঝায় বর্ণনীয় বিষয় বা বাচ্য বা কথাবস্তু, আর Manner বলিতে বুঝায়, সেই কথাবস্তুকে প্রকাশ করিবার কৌশল। কাব্যের রসই বলি, সৌন্দর্য্যই বলি আর আনন্দই বলি—এই দুই ভিত্তির উপরেই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। আলঙ্কারিকগণ এই কথাটিকেই ঘুরাইয়া বলিবেন,—

'কাব্যের লক্ষ্য রস, শব্দ, বাচ্য, রীতি, অলঙ্কার, ছন্দ—তার উপায়। রসই নিজেকে মূর্ত্ত করে তো'লাব আবেগে কাব্যের এইসব অঙ্গেব সৃষ্টি করে।'১

বস্তুতঃ কাব্য সৃষ্টি করিতে গেলে কবি এই উপায়গুলিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহাকে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ-কৌশলদ্বারা রসোদ্বোধক ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাকৃত জগৎ ও মনুষ্যজীবন হইতে লেখক যে অনুভূতি সঞ্চয় করেন, তাহাকে তিনি নানা মনের মধ্যে অনুভূত করিতে চান। অতএব 'হৃদয়ভাব'ই সাহিত্যের প্রধান বিষয়, ইহাই লেখকের মনে 'মানসজগৎ' হইযা উঠে, লেখক ইহাকেই দশজনের মনে উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য আকুল হন। .. সুন্দর

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে অনেক সাজসরঞ্জাম লাগে ..র সমারোহ, আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপে মোহমুগ্ধ করে; আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। (সাহিত্যেরর বিবিধ সমস্যা এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। রচনা বলিতে অথচ যাহার ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশেব উপায দুই সম্মিলিত ভাবে বুঝায়। ন অনুভূতিও (সাহিত্যের স্যাবন, সমাজ ও

বলা বাহুল্য, বিষয়বস্তু এবং তাহার সুনিপুণ রূপায়ণ—এই.ত সঞ্চয় করে—সমবায়েই সাহিত্য। প্রত্যেক শিল্পকৃতির মধ্যে এই দুইটি স্যার শব্দার্থময় দেহ। মূর্ত্তির মত বিরাজ করে। শিল্পী যখন নয়নানন্দ চিত্র অঙ্কন কল্লেন,—
যেমন রঙ, তুলি, ক্যানভাস প্রভৃতির প্রয়োজন, তেমনই Avhole range কোথায় কতটুকু রঙ লাগাইবেন, সেই নির্ম্মাণ কৌশলVery known প্রয়োজন। বিষয় ও প্রকাশ যেন একে অন্যের সহিত অঙ্গ.

১ কাব্য জিজ্ঞাসা (কথা)—অতুল গুপ্ত

—এই কথাবস্তু দ্বারাই কবি রসের উদ্বোধন করেন। আলো পাইতে হইলে আলোকার্থীকে দীপশিখা অবলম্বন করিতে হয়; তেমনই 'কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথাবস্তু':

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥ (ধ্বন্যালোক)

এখন প্রশ্ন এই যে, কবি ও লেখক যখন কাব্যসৃষ্টি করেন, তখন তিনি কি হুবহু বস্তুসত্যকেই গ্রহণ করেন, না বস্তুর অতিরিক্ত কোন সত্যকে গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তর গ্রীক দার্শনিক Aristotle প্রথম প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন:

One should prefer impossibilities if probable, rather than possibilities that are unconvincing.†

প্রাকৃত সত্য ও সাহিত্যের সত্য

সাহিত্যের সত্য ও প্রাকৃত সত্যের মধ্যে পার্থক্য এই উক্তির মধ্যেই নিহিত। সাহিত্য প্রাকৃত সত্যকে রূপ দেয় না। সাহিত্যের বস্তু প্রাকৃত জগতের বস্তু হইতে স্বতন্ত্র। পাঠক সাধারণও হুবহু বস্তু দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। যাহা ঘটে নাই অথচ ঘটিতে পারিত—এইরূপ ঘটনার প্রতিই পাঠকের অনুরাগ। সম্ভাব্য সত্যই সাহিত্যের সত্য। সাহিত্য এই সত্যকেই রূপায়িত করে। অনুকৃতি (Imitation) বলিতে, Aristotle বস্তুসত্যের এই রূপান্তরকেই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালের পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানের আলোকে এই রূপান্তরিত সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 'Art is the presentation of the real in its mental aspect.' বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'সাহিত্য স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত', ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সাহিত্য স্বভাবের সূক্ষ্ম শরীর', রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্য যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও প্রত্যক্ষ নহে।' বস্তুতঃ সাহিত্যের সত্য বস্তুগত সত্য নয়, ভাবের সত্য। Addison বলেন, সাহিত্য হইতেছে, 'Pleasure of imagination.'

সাহিত্যের সত্য ভাবের সত্য

মানুষের কল্পনায় সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সম্পর্কে এক সমুচ্চ ধারণা রহিয়াছে। বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষ সত্য, সেই সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। এই জন্য কবিকে বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষ সত্য হইতে কিছুটা বাদ্‌ছাঁদিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে বাস্তবের অপূর্ণতা পূর্ণতার রূপ ধরে, বাস্তব সুন্দর অধিকতর সুন্দর

† Poetics—Chap. XXIV.

হইয়া উঠে। ইহাই কল্পনার আনন্দদায়ক। অতএব সাহিত্যের সত্য, ভাবের সত্য, ইহা কবির মনোজগতে গৃহীত মানসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিত কলা। (সাহিত্যের সামগ্রী)

'ভাবকে নিজের করা'—কথাটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। বিশ্বময় ছড়ানো যে বস্তু বা যে ভাব, কবি তাহাকে নিজের হৃদয়ে নিজের মনোমত করিয়া গঠন করেন, ইহাতে কবি নিজের 'মনের মাধুরী' মাখাইয়া দেন। এইভাবে বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠে। ইহা হৃদয়বৃত্তির রসে জারিত একটা নূতন সৃষ্টি। ভাবুকের চিত্তের প্রভাবে ইহা এমন একটি বিশেষত্ব লাভ করে, যাহাতে ইহা প্রাকৃত সত্য হইতে অন্যরূপ সত্যে পরিণত হয়। ইহাই ভাবের সত্য, পাশ্চাত্ত্য জগতের আলঙ্কারিকগণ ইহাকে বলেন, Truth of feeling বা Truth of idea ; এই ভাবের সত্যই সাহিত্যের অন্যতম সামগ্রী। ইহা অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করায় ; বোধাতীতকে অনুভূত করায়। ইহার সঙ্গেই মানুষ সত্যকারের আনন্দের যোগ অনুভব করে। যে সত্য প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গোচর, যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহা সাহিত্যের বিষয় নয়। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে ভাবের সত্যই রূপায়িত হয়। বিজ্ঞান যে সত্যকে প্রকাশ করে, তাহা তথ্যগত সত্য। 'তথ্যগত সত্য' হইতে আমরা তথ্যেরই সন্ধান পাই। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলেন জ্ঞানের কথা।

বৈজ্ঞানিক সত্য : জ্ঞানের কথা ও ভাবের কথা

জ্ঞানের কথা প্রয়োজন সাধন করে, ইহাতে চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনাও কম। জ্ঞানের কথা একবার জানিলেই জানা শেষ হইয়া যায় এবং প্রচারের দ্বারা ইহা পুরাতন হয়। অতএব জ্ঞানের কথা লইয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাকে কোনক্রমেই সৃষ্টিমূলক সাহিত্য বলা চলে না। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের আবেদন যুগ হইতে যুগান্তরে, মন হইতে মনে। অতএব ইহাকে এমন বিষয় অবলম্বন করিতে হয়, যাহা পুরাতন হইয়াও পুরাতন হয় না, নূতন নূতন হৃদয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া যাহা নিত্য নবরূপ লাভ করে। ভাবের বিষয় এইদিক হইতে সাহিত্যের প্রকৃত সামগ্রী। জ্ঞানের বিষয় মানুষের প্রয়োজন সাধন করে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের জিনিস কখনও চিরন্তন আনন্দের সামগ্রী হইতে পারে না, ইহার সহিত মানুষ হৃদয়ের যোগ অনুভব করিতে পারে না। বীরবল বলেন:

টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা কজনে যায়—আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই বা কজনে যায়? অথচ এ কথাও সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—ভারত উদ্ধার—আর গড়ের মাঠে খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। (সাহিত্যে খেলা)

'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রয়োজনের তাগিদে সত্যের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা জন্মে বটে, 'কিন্তু তবু তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ঘোচে না।' প্রয়োজনের নিকট মানুষ সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। তাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে মানুষ সৌন্দর্য্য বা আনন্দ—কোনটারই সন্ধান পায় না।

সাহিত্য সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ, আনন্দের আধার। কাজেই যে জ্ঞানের বিষয় কেবল প্রয়োজন সাধন করে, তাহা সাহিত্যের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে না। সাহিত্য হইতে যাহারা সাংসারিক জ্ঞান ও প্রয়োজন আশা করেন, একজন সংস্কৃত কবি তাঁহাদিগকে 'অল্পবুদ্ধি সাধু' বলিয়া নমস্কার করিয়া বলিয়াছেন, 'তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায়।'

জ্ঞানের বিষয় সাহিত্যের সামগ্রী নয়, ভাবের বিষয়ই সাহিত্যের সামগ্রী। 'হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না'; একই হৃদয়ভাব কত প্রাচীনকাল হইতে কত কবির বর্ণনার বিষয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা, 'আগুন-গরম, সূর্য্য গোল, জল তরল'—এই জ্ঞানের কথাগুলির মত পুরাতন হইয়া যায় নাই। সাহিত্য নিত্য চিরনূতনত্বের দাবি রাখে বলিয়াই, ইহাতে ভাবের কথার এত আদর:

এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

(সাহিত্যের সামগ্রী—রবীন্দ্রনাথ)

প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য যে সাহিত্যের সত্য নয়, এ-কথাটি গ্রীক দার্শনিক Aristotle প্রথম বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইতিহাস বস্তুসত্যের-প্রতিলিপি। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ও সাহিত্যের সত্য স্বতন্ত্র। ইতিহাস বিশেষ সত্যকে রূপায়িত করে, কিন্তু সাহিত্যের উপজীব্য নির্ব্বিশেষ সত্য:

ইতিহাস ও সাহিত্য

Poetry deals rather with the universal, history with the particular (Aristotle).

অতএব ইতিহাসে আমরা পাই বাইরের ঘটনাবলীর বিবরণ, মানুষের আচার আচরণের বিবৃতি। এখানে তথ্য স্তূপীকৃত হয়, ঘটনার পর ঘটনা বর্ণিত হয়— এককথায় ইহাতে মানুষের বাহিরটিকে কোন প্রকারে জানা যায়। কিন্তু সাহিত্যে পাওয়া যায়, মানুষের মনোজগতের সংবাদ, তাহার অন্তরের সত্যের পরিচয়।

একই যুদ্ধের কথা ইতিহাসে কিংবা সাহিত্যে অবলম্বিত হইতে পারে। ইতিহাসে থাকে যুদ্ধের কার্য্য-কারণ, যেস্থানে যুদ্ধটি সংঘটিত হয় তাহার নাম ও বর্ণনা, যে-যে পক্ষ তাহাতে অংশগ্রহণ করে তাহাদের নাম, সেনাপতি বা রাজ-রাজড়ার তালিকা এবং কি কারণে কোন পক্ষ জয় বা পরাজয় বরণ করিল —তাহাদের বিবরণ। উপরন্তু ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য ইহাতে দেখানো হয়। কিন্তু সাহিত্যে বর্ণিত হয় এই ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য, যুদ্ধের উত্থান-পতনের পটভূমিকায় মানব-মনের পরিণামের চিত্র, সাহিত্যিকের মনে বাইরের ঘটনা যে ভাব সৃষ্টি করে—তাহার ভাষাচিত্র। অতএব ঐতিহাসিক সত্য বলিতে বুঝায় তথ্যের সত্য (Facts) আর সাহিত্যের সত্য বলিতে বুঝায় ভাবগত সত্য (Truth): প্রথম সত্যটি বিশেষ সত্য (Particular), দ্বিতীয় সত্যটি নির্ব্বিশেষ সত্য (Universal)—একটি ব্যক্তি-বিশেষের নিজত্ববর্জ্জিত, অপরটি ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ব-সমন্বিত। এই কারণেই ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী। ইতিহাসের বিষয় লইয়া সাহিত্য রচনা করাও দুরূহ। Shakespeare-এর ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে Boas একথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন,

> Facts are stubborn things, and the effort to subdue them to the service of the Muse is seldom entirely successful.

ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পরবিরোধী, উভয়ের 'সত্যে'র ধারণাটিও স্বতন্ত্র। তথাপি বহু লেখক ঐতিহাসিক সাহিত্য (ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস) রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিষামৃতকে একপাত্রে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনাও করা হইয়াছে। এমন কথাও অনেকে বলিয়াছেন, ইতিহাসের বিষয় লইয়া সাহিত্য রচনা করা সঙ্গত নয়। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ এ মতকে সমর্থন করেন না। তিনি বলেন:

> আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা

আর কোথাও দেখি নাই।...আমাদের অলংকারে নয়টি মূল রসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকার শাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। এই সমস্ত অনির্দ্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণ। (ঐতিহাসিক উপন্যাস)

অতএব রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাসও সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের সুখ-দুঃখের কথাই সাহিত্যের বর্ণনীয। এই ব্যক্তির সুখ-দুঃখের পরিধি একমাত্র পরিবার বা সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। পৃথিবীতে কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত জীবন জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। জগতের সেই ভয়ঙ্কর বিশালতার সহিত তাঁহার জীবনের আশা-কামনা, আনন্দ-বেদনা জড়িত, তাহার মধ্যেই একটি জীবনের করুণ-মধুর সুরের অনুরণন উঠিতে পারে :

ঐতিহাসিক সাহিত্য

> রাজ্যের উত্থান-পতন, মহাকালের সুদূর কার্য্যপরম্পরা যে সমুদ্র-গর্জ্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূল-রাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরুমোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্রগম্ভীর, একটা সুদূর-বিস্তৃত ঝঙ্কার জাগ্রত রাখে। (ঐতিহাসিক উপন্যাস)

মানুষের জীবনের সহিত কালের এই যে গতি, অতীতের সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে জীবনকে স্থাপন করিয়াই তাহা দেখিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র রাগিণী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অতি গভীর সুরে বাজিয়া উঠে। সাধারণ জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র মহিমা ইতিহাসের তুরন্ত গতি ও মহাকোলাহলের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। একদিকে ইতিহাসের মহাকলরব, অন্যদিকে ব্যক্তি-জীবনের মহান কলতান—এই দুয়ের সমাবেশে একটি বিচিত্র রসাস্বাদ হয়। এই আস্বাদ, আস্বাদককে ক্ষণিক জীবনের তুচ্ছতা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া, অলৌকিক আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ :

> ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই।

ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখের ধ্বনিকে অনুরণিত করাই ঐতিহাসিক সাহিত্যরচয়িতার লক্ষ্য। ইতিহাস উপলক্ষ্য মাত্র। ইতিহাসের বিরাটত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে জীবন মহীয়ান হইয়া উঠে, প্রবৃত্তির সংঘাত যে আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠে—সেইটুকু দেখানোই ঐতিহাসিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জের প্রতি লেখকের তেমন আসক্তি নাই: ইতিহাসের তথ্যের অংশটুকু অসত্য হইয়া গেলেও সাহিত্য বাঁচিয়া থাকে। যে সত্যের জোরে বাঁচে, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্যের এই প্রাণশক্তির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, ইতিহাসের গতি ও বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়া যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহাই খাঁটি ঐতিহাসিক সাহিত্য। এখানে ইতিহাসের বিরাটত্ব ও মানুষের সুখ-দুঃখ একত্র করিয়া দেখানো হয়, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্য সত্য একসূত্রে গ্রথিত হয়, জ্ঞান ও ভাব, সত্য ও কল্পনা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এরূপ যে হইতে পারে, অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী যে একস্থানে মিলিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত সেক্ষপীয়রের 'অ্যাণ্টনী-ক্লিওপেট্রা' নাটক ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস। রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের পটভূমিকায় সেক্ষপীয়র নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে স্থাপন করিয়া তাহাকে বিরাট, বিচিত্র রূপ প্রদান করিয়াছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রচ্ছদপট রচিত হইয়াছে গর্বোদ্ধত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস দিয়া। ইহার মধ্যে ইতিহাসের প্রমত্ত কোলাহল, ভাঙ্গনের প্রচণ্ড কলরব, কালের ত্বরিত গতি—তাহারই সহিত ধ্বনিত হইয়াছে, নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয়ের ক্রন্দন। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথের ঘর্ঘররবের সহিত পিষ্ট মানবহৃদয়ের আর্তনাদ মিশ্রিত হওয়ায় ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বিষামৃতের সমন্বয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন।
>
> (রাজসিংহ)

সাহিত্যের কথাবস্তুরূপে রবীন্দ্রনাথ, মানবের হৃদয়ভাব, মানবচরিত্রকেই প্রধান আসন দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইতিহাসের বস্তুও উপরিউক্ত প্রণালীতে সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে। ঐতিহাসিক রসকে তিনি মিশ্ররস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আমাদের দেশের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ রসোদ্বোধনের মুখ্য কারণরূপে একটি সামগ্রীকে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা 'স্থায়ী ভাব'; এই স্থায়ী ভাবই রসাস্বাদনের আন্তর উপাদান: কেহ কেহ ইহাকেই রস বলিয়াছেন। কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেন ইহাকে বলিয়াছেন, 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ'—রসাস্বাদরূপ অঙ্কুরের কন্দ বা বীজ। সহৃদয় সামাজিকের চিত্তজগতে ইহার অবস্থান, সেইখানেই ইহার উদ্বোধন ও আস্বাদন। এই স্থায়ী ভাবের কারণকার্য্য এবং সহায়কারী আরও কতকগুলি সামগ্রী আছে, তাহারাও কাব্যের উপাদান। এগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাব। আমরা পরে ইহাদের লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে আমরা এইটুকু জানিয়া রাখিব যে—

কাব্যের মুল উপাদান স্থায়ী ভাব

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্॥ (সাহিত্যদর্পণ)

—চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের সংযোগে রসে পরিণত হয়।

অতএব কাব্যসৃষ্টির মূল উপাদান-রূপে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ স্থায়ী ভাবকেই 'কন্দ' বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই স্থায়িভাবের সংখ্যা মাত্র নয়টি—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা (ঘৃণা), বিস্ময় এবং শম।—এইগুলিই কাব্যের প্রধান অবলম্বন। ইহারা 'ভাবস্থির', ইহাদের উদয়-ব্যয় নাই। চিরকাল ধরিয়া দেশে দেশে এই ভাব প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা চিরন্তন। বিভাব এই স্থায়িভাবগুলির কারণ, অনুভাব তাহাদের কার্য্য, সঞ্চারিভাব তাহাদের বৈচিত্র্য। এই চিরন্তন ভাবগুলিই সাহিত্যের সামগ্রী। এই স্থায়ী ভাবগুলি ছাড়াও সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নির্ব্বেদ, গ্লানি, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি আরও তেত্রিশটি ভাবের কথা বলিয়াছেন। সেগুলি স্থায়ী নয়, স্থায়ীর সহকারী অর্থাৎ সঞ্চারী। এগুলি মনের ক্ষণস্থায়ী ভাব, কোন সময়ে কোন কারণে ইহাদের উদ্ভব হয়, আবার কারণ অন্তর্হিত হইলেই তাহাদের বিলয় হয়। এগুলি লইয়াও সাহিত্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু সে সাহিত্যের স্থায়িত্ব ক্ষণকালীন। স্থায়ী ভাবাশ্রয়ী সাহিত্যই চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়।

মানবমনের সংখ্যাহীন ভাবগুলির মধ্যে এই অল্প কয়টি ভাবের স্থায়িত্বের স্বীকৃতি অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। এইজন্য পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ আরও

কতকগুলি ভাবকে স্থায়ী ভাবরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'বৎসলতা'কেও স্থায়ী ভাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ 'প্রেমভক্তি'কে একমাত্র স্থায়ী ভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মানসিক বৃত্তিরূপে 'স্নেহ, প্রণয়, দয়া'কে স্থায়ি-ভাবের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'অনেকগুলি অনির্ব্বচনীয় মিশ্র রস আছে, অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই,' তিনি 'ঐতিহাসিক রস'কে এইরূপ একটি মিশ্ররস বলিয়া মনে করিয়াছেন। ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'প্রীতিভাব'কে 'মানবচিত্তের গূঢ় স্থায়ী ভাব' বলিয়া মনে করিয়াছেন : এই প্রীতিভাব 'প্রেয়োরস'-এ পরিণত হয়। প্রীতিকে তিনি ছয় ভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রীতি, স্ত্রীপুরুষের রতি, বাৎসল্য, সখ্য, ভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি। অতএব এ ভাবগুলিও সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বন। (দ্রষ্টব্য 'কাব্যালোক'—দ্বিতীয় অধ্যায়)।

কয়েকটি নূতন স্থায়ী ভাব

কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য উভয় দেশেরই আলঙ্কারিকগণ নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়াছেন, সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণগুলি এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবন হইতেই সংগৃহীত হয়। বহির্জগতের বস্তু, লৌকিক জীবনের মনোভাব এবং সামাজিক জীবনের অবলম্বন ব্যতীত কোন সাহিত্যই রচিত হইতে পারে না। আলোকার্থীকে প্রদীপ জ্বালাইতে হইলে যেমন দীপশিখাকে অবলম্বন করিতে হয়, তেমনই সাহিত্যিককে সাহিত্যসৃষ্টি করিতে হইলে 'বস্তু'কে আশ্রয় করিতে হয়। এই 'বস্তু' কি প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞানের তথ্য—না ইহা কবির কল্পনা-ধৃত 'ভাবময় বস্তু'; ইহা কি fact, না truth; ইহা কি truth of reason, না truth of idea—ইহা লইয়াই বিতর্ক। এই বিতর্ক হইতেই সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্র' (Realism) এবং ভাবতন্ত্রের (Idealism) উদ্ভব।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র

একদল সাহিত্যিক সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে সাহিত্যের বস্তু হইবে 'Real as it is'; বাস্তব জীবনে যে সমাজ ও সামাজিক সমস্যা, যে প্রত্যক্ষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দৈন্যপীড়িত জীবন রহিয়াছে—তাহার প্রতিলিপিই সাহিত্য। সাহিত্যে কল্পনা ও কাল্পনিকতার কোন স্থান নাই, সাহিত্য কঠিন বাস্তবের চিত্র। অবশ্য এরূপ মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। নানা কারণে আজ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এক যুগে সাহিত্যের পটভূমি ছিল স্বর্গ কিম্বা নরক, সাহিত্যের পাত্রপাত্রী

ছিল দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, দানব; সে যুগ পরিবর্তিত হইয়াছে, সাহিত্যে আসিয়াছে মানুষ, পৌরাণিক রাজা, পৌরাণিক রাণী; তারও পরে আসিয়াছে ইতিহাসের রাজা, সামন্ত; সে যুগও অন্তর্হিত হইয়াছে—সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন জমিদার, অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। আধুনিক সাহিত্যের মানুষ আরও বাস্তব; মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা, মুটে-মজুরের জীবন, কৃষাণের কাহিনী—এইগুলিই সাহিত্যের উপজীব্য।

একদিন বাঙলা সাহিত্যেও ছিল দেবমহিমার প্রাধান্য; সেদিন চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী, ধর্ম্মঠাকুর মানুষের পৌরুষকে নির্জ্জিত করিয়া সাহিত্যে দৃঢ় আসন পাতিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পাওয়া গেল,—'প্রতাপাদিত্য চরিত' (রামবসু), 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (রাজীব লোচন)—এখানে মানুষের প্রথম পদসঞ্চার। বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া পাইলাম সীতারাম-রাজসিংহ, প্রতাপ-ব্রজেশ্বর, গোবিন্দলাল-ভ্রমর। শরৎচন্দ্র একেবারে চোখে-দেখা সমাজের মধ্যে নামিয়া আসিলেন, সেখানে কেবল নরেন্দ্র-বিজয়া, রমা-রমেশ, সাবিত্রী-কিরণময়ী-রাজলক্ষ্মী আসিয়া ভিড় করিলেন না, আসিলেন পণ্ডিতমশাই, জমিদারের পীড়নে সন্ত্রস্ত গফুর-আমিনা, অভাগী-কাঙালিচরণ। আজ তারাশঙ্করের গণদেবতায় পাইতেছি দেবু-পদ্মবৌ-উচ্চিংড়েকে। আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের গতি রূঢ় বাস্তবের দিকে।

'স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক'—এই নরলোক। ইহা রুদ্র-কঠিন, দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত, নিষ্করুণ। ইহাকে উপেক্ষা করা আজ অসম্ভব। বস্তুতন্ত্রবাদী সাহিত্যিক এই বেদনাতুর নরলোকের চিত্রাঙ্কনের পক্ষপাতী। কল্পনা নয়, কল্পচিত্র নয়, বাস্তবের রূঢ় সমস্যা, লবণাক্ত চোখের জলের ছবি আঁকিতে হইবে; অতীতের মোহমদির স্বপ্নে বিহ্বল না হইয়া, কঠিন বাস্তবকে রূপ দিতে হইবে।

বস্তুতন্ত্রবাদের আবার আর একটি দিক আছে। বস্তুসাহিত্যের নামে তাহা একরূপ জড়বাদের পূজা। ইউরোপীয় সাহিত্যেই ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের উগ্র বাস্তববুদ্ধি বস্তুর কদর্য্য, কুৎসিত, কুটিল দিকটি উন্মোচনের প্রয়াসী। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন :

> We should work upon characters, passions, human and social facts as the psychist and chemist work with organic bodies, as the physiologist works with living organisms.

বস্তুর হুবহু চিত্রাঙ্কনের নামে ইহা বস্তুবুদ্ধির বিকার বিশেষ। পুষ্পকে ছিঁড়িয়া ইঁহারা পুষ্পকীট দেখাইতে চান, মানুষের নগ্নতাকে প্রকাশ করিতে চান। আদর্শের সহিত ইঁহাদের সংগ্রাম, আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে ইঁহারা বদ্ধপরিকর। যাহা সত্য, তাহা চিরস্থির, তাহাকে কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না: বিপর্য্যয় ঘটে অল্পবুদ্ধি মানুষের চিত্তজগতে। তাহারা এই প্ররোচনা প্রবঞ্চনায় আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়।

বস্তুতঃ এ ধরণের উগ্রবস্তুবাদী সাহিত্যও একপ্রকার জগৎ-পলাতকার সাহিত্য। কারণ, জগতে অবিমিশ্র কদর্য্যতাই নাই, সৌন্দর্য্যও আছে— পঙ্কই নাই, পঙ্কজও আছে, বিষই নাই, অমৃতও আছে। যাঁহারা কেবল কুৎসিত, কুটিলকেই দেখেন, তাঁহারা জগৎ-পলাতক বৈ কি! অথবা এইরূপ সাহিত্যকে বস্তুজ্ঞানের সাহিত্যও বলা চলে। বস্তুর বাহিরের সত্যকেই যাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সাহিত্যও বস্তুবিদ্যার পুঁথি হইতে স্বাতন্ত্র্য দাবি করিতে পারে না।

সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে এবং সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া হইতে আমরা দেখিয়াছি, সাহিত্য নিছক বস্তুকে প্রতিফলিত করে না, সত্যকেই রূপায়িত করে, তাহা কবির কল্পনা-ধৃত বস্তুর সত্য, তাহা 'Reality in its mental aspect'- ইহাই সাহিত্যিক সত্য। Aristotle-এর যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের এই বিশিষ্ট লক্ষণটি স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। 'Art is imitation' (Aristotle), 'Poetry···is nothing else but Feigned History' (Bacon), 'The grand power of poetry is its interpretative power' (Wordsworth)—প্রভৃতি উক্তির মধ্যেও কাব্যসাহিত্য যে বস্তুর প্রতিলিপি মাত্র নয়, লেখকের ভাব-কল্পনার রূপায়ণ, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক সমালোচকও বলেন:

> A work of creative literature cannot be made to present the facts of life in the sense in which these facts are presented in history, biography, or in a scientific or philosophic treatise: if the attempt is made, such a work ceases *ipso facto* to be 'creative,' and it loses forthwith the characteristic beauty of a work of art.*

ভাবের সত্যকে রূপায়িত করাই সাহিত্যের কাজ। জড় জগতের উপরে সাহিত্যের জগৎ এক ভাবের জগৎ। সাহিত্যিক বস্তুজগৎকে অবলম্বন

* Judgment in Literature: Worsfold.

করিয়া মন্ময় জগৎ, ভাবময় জীবন রচনা করেন। কবি-কল্পনার স্পর্শে জড়বস্তু ভাবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। ইহাই সাহিত্যের ভাবতন্ত্র (Idealism).

ভারতীয় সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও এই ভাবতন্ত্রকে স্বীকার করেন। বাহ্যজগতের বস্তু, তাহার কার্য্য শব্দে সমর্পিত হইয়া কাব্যের অলৌকিক বিভাব ও অনুভাব হইয়া উঠে। কাব্যের স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবগুলিও লৌকিক জীবনের—শোক, রতি কিংবা হর্ষ ও অসূয়াকে আশ্রয় করিয়া কবিপ্রতিভাবলে শব্দে সমর্পিত হইয়া, অলৌকিক হইয়া উঠে। কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ; কাব্য 'সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী', ইহা অলৌকিক রসমূর্ত্তি। ইহা এক ভাবের রাজ্য।

বাঙলাদেশের সাহিত্যিকগণ তাই সাহিত্যকে বলিয়াছেন, 'স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, (বঙ্কিমচন্দ্র), 'সাহিত্য স্বভাবের সূক্ষ্ম-শরীর' (ঠাকুরদাস মুখো.), 'শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক ও বস্তুতন্ত্র' (বিপিন পাল), 'কল্পকলা দিব্যদৃষ্টির কথা' (চিত্তরঞ্জন), 'সাহিত্য ও ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান' (রবীন্দ্রনাথ)।

সাহিত্য রাজা বিক্রমাদিত্যের স্কন্ধারূঢ় বেতালের মত। সে বেতালের মত গল্প বলে, প্রহেলিকা সৃষ্টি করে, পাঠক ও শ্রোতার নিকট হইতে একটা সত্য উত্তর আদায় করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বস্তুগত সত্য উত্তর পাইলেই সে অন্তর্হিত হইয়া শ্মশানের শমীবৃক্ষ আশ্রয় করে। সাহিত্য তাই এমন একটি ভাবের জগৎ সৃষ্টি করে, যেখানে তথ্য থাকে না, কিন্তু সত্য থাকে। এইভাবেই অনেক অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়া, অনেক খণ্ডতাকে অখণ্ড রূপ দিয়া সাহিত্য আনন্দ-সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার মধ্যেই মানব হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। ভাবের জগতের প্রতিই মানুষের যে অধিকতর আকর্ষণ।

এই ভাবজগৎ কবিকল্পনার সৃষ্টি। কবিকল্পনাকে বলা হয় 'অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। রঞ্জন-রশ্মি যেমন বস্তুর অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য স্থানের ছবিটি তুলিয়া লয়, কবিকল্পনাও তেমনই অদৃশ্যলোকের চিত্র অঙ্কন করে; মানুষ যাহা কল্পনা করিতে পারে না, তেমন কল্পনাও করিতে পারে। কবি-কল্পনাকে বন্দনা করিয়া তাই কবিরা বলেন:

বন্দ্যঃ কোঽপি সুধাস্যন্দাস্কন্দী স সুকবের্গুণঃ।
যেনায়াতি যশঃকায়ঃ স্থৈর্য্যং স্বস্য পরস্য চ॥[১]

---

১ রাজতরঙ্গিণী—কহ্লন।

কল্পনার ক্ষমতা অসাধারণ। কল্পনাদ্বারাই কবিগণ রোম্যান্সের জগৎ নির্ম্মাণ করেন। সে জগতের অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও বিস্ময় সকলকেই মুগ্ধ করে। কল্পনা খোদাইকার নয়, সে স্বর্ণকার! খোদাইকার অন্ধকার খনি হইতে স্বর্ণপিণ্ড উদ্ধার করে। গলদ্‌ঘর্ম্ম খোদাইকার নিরানন্দ, কর্ম্মক্লান্ত। তাহার নিকট স্বর্ণপিণ্ড যেন মৃৎপিণ্ড। কিন্তু স্বর্ণকারের যাদুস্পর্শে সেই স্বর্ণপিণ্ড কেয়ুরকুণ্ডলে পরিণত হয়। কে অস্বীকার করিবে, কেয়ূরকুণ্ডল স্বর্ণ নয়? কোন্ অরসিকই বা অস্বীকার করিবে, কেয়ূরকুণ্ডল স্বর্ণমাত্র, তাহার অতিরিক্ত বস্তু নয়? শিল্পের জগতে কল্পনা ওই কেয়ূরকুণ্ডলের নির্ম্মাতা। ইহা বাস্তবকে সুমহান সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে। এইখানেই ভাবতন্ত্রের সার্থকতা।

কিন্তু ভাবতন্ত্রেরও ত্রুটি আছে। কল্পনাকে প্রধান করিতে গিয়া, যখন ঘটনা রটনায় পরিণত হয়, তখন ভাবের জগৎটিও মিথ্যা হইয়া উঠে। অতিচারী ভাবতন্ত্র কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দেয়। কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতায় তখন ভাবের জগতে ভাববিলাস, ভাবালুতা, স্বপ্নমদিরতা, মিথ্যা অতীত-বিহ্বলতা দেখা দেয়। কাব্য তখন জগৎবিমুখ, কবি তখন জগৎপলাতক (Escapist); ভাবতন্ত্রবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে এই অভিযোগ উঠে, তাহা অতিমাত্রার ভাব-বিহ্বলতা বা কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য। এইরূপ নিছক ভাব-বিলসিত সাহিত্য সত্যই জীবনের সংস্পর্শলেশশূন্য।

কিন্তু প্রকৃত ভাবতন্ত্রে এরূপ স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নাই। যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অবস্তুমূল ভাব-কল্পনার বিরোধী। জীবনকে উপেক্ষা করিয়া আত্ম-মগ্নতার কোন স্থান সাহিত্যে নাই। জীবন-সত্যের গভীরতম উপলব্ধি হইতেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি। 'সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখদুঃখের খাত ছাড়া বয় না' (অতুল গুপ্ত)। এইজন্যই সাহিত্যে মানুষ নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়। সাহিত্যের স্রষ্টা ভাব-বিহ্বল নন: অবশ্য তাঁহারা একদিকে 'Dreamer of dreams' –কিন্তু তাঁহারাই আবার Shakers of the world for ever.'

সাহিত্যের ভাবতন্ত্রে, কল্পনা যখন সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধে আরূঢ় দৈত্যের মত লেখকের স্কন্ধারূঢ় হয়, তখন ইহা অতিচারী হয়, অত্যাচারীও হয়—কিন্তু যখন এই কল্পনাই লেখকের সংযত বুদ্ধির পরিচালনায় চালিত হয়, তখন ইহা আলাদীনের প্রদীপের মত 'প্রকাণ্ড কাণ্ড' সংঘটিত করে, তখনই ইহা মানুষের কামনা-বাসনার মহৎ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে; কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করে।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র লইয়া দ্বন্দ্ব আছে। সাহিত্য-সৃষ্টির মূল তত্ত্বটি অনুধাবন করিলে এ দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। রসসৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য— বস্তুতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। বিশেষ কাল বা বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এগুলি সঞ্চারী ভাব– মূল ভাবকে ইহা বৈচিত্র্য দান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎ-কালিক বা তৎ-স্থানিক জনগণের ক্ষণিক পিপাসাও মিটাইবে। কিন্তু কবিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে চিরন্তন ভাবোদ্বোধনের প্রতি। তাহাতে এক কালের বিশেষ ভাব চিরকালের হইয়া উঠিবে। উপনিষদের লক্ষ্য ছিল 'আনন্দব্রহ্ম'—কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে গিয়া ঋষিগণ অন্নব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্মকেও অস্বীকার করেন নাই। অন্নকে, প্রাণকে ভিত্তি করিয়াই আনন্দলোকের দিকে যাত্রা করিতে হইবে। ভাবতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র সম্পর্কে শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়ের সিদ্ধান্তটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয় মায়ার জগৎ একথা সত্য। কিন্তু বস্তু-নিরপেক্ষ মায়া হয় না, সুতরাং অবাস্তব কাব্য অসম্ভব। এবং কাব্যের কথাবস্তুর বস্তুপরতার লাঘবতা যদি তার রস-আকর্ষণ শক্তির হীনতা ঘটায়, তবে সে লাঘবতা কাব্যের দোষ। কিন্তু কথাবস্তুর লক্ষ্য বস্তু নয়, রস। কাব্য যে বস্তুকে চিত্রিত করে, সে তার বাস্তবতার জন্য নয়, রসাভিব্যক্তির জন্য। কাজেই উপায় যদি উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যায়, তবে ঠিক বিপরীত অনৌচিত্যের দোষে কাব্যের রসভঙ্গ হয়। বস্তুর বাস্তবতা অনন্ত। কোন কবিই তার সবটাকে কাব্যের কথাবস্তুতে স্থান দিতে পারেন না। যদি পারতেন, তবে তার ফলে যা সৃষ্টি হোত, তা আর যাই হোক— কাব্য নয়। সুতরাং ঐ বাস্তবতার কতটা কোন্ কাব্যে স্থান পাবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের উপর ও কবির প্রতিভার প্রকৃতির উপর।·· কেউ কাকেও কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসন দেবার অধিকারী নন।[১]

১ কাব্য জিজ্ঞাসা (কথা)—অতুল গুপ্ত

[খ] প্রকাশভঙ্গি

শ্রেষ্ঠ বাগ্মী Demosthenesকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, বাগ্মিতার কৌশলটি কি ? তিনি বলিয়াছিলেন, Action অর্থাৎ অঙ্গসঞ্চালন। উক্তিটির মধ্যে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও বলা চলে, অঙ্গভঙ্গি সহকারে যে বক্তৃতা করা হয়, তাহা সাধারণ লোককে আকৃষ্ট করেই। সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়েও একথা বলা যায়, সাহিত্যের লক্ষ্য রস, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি করিতে—সকলের মনে সঞ্চার করিয়া দিতে প্রয়োজন হয়, প্রকাশভঙ্গি। কাব্যের অঙ্গগুলির যথাযথ বিন্যাস-কৌশলের উপরে রসোদ্বোধনের অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক সমালোচক ইহা স্বীকার করিয়াছেন। Matter (কথাবস্তু) ছাড়া যেমন সাহিত্য দাড়াইতে পারে না, তেমনই Manner (প্রকাশ-কৌশল) ছাড়াও সাহিত্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয় না। পাশ্চাত্ত্যের একজন সমালোচক বলিতেছেন :

> But however rich may be the materials yielded by experience, however fresh and strong may be the writer's thought., feeling and imagination, in dealing with them, another factor is wanting before his work can be completed. The given matter has to be moulded and fashioned in accordance with the principles of order, symmetry, beauty, effectiveness : Thus we have a fourth element in literature—the technical element or the element of composition and style. *

রবীন্দ্রনাথও বলেন, সাহিত্যে নীরব ব বিস্ত বা আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান নাই। আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা হইতেই সাহিত্যের উদ্ভব। লেখকের মনোভাব অন্যের মধ্যে ব্যক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল। কলাকৌশল দ্বারা লেখক তাঁহার মনোভাবকে অন্যের মধ্যে সঞ্চার করিয়া দেন। এই প্রকাশ-ধর্ম্মের মধ্যেই লেখকের অমরত্ব নির্ভর করে :

> ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। সেইজন্যই রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে ; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে। ভাব মনুষ্য সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্ত্তি। (সাহিত্যের সামগ্রী)

* An Introduction to the study of Literature—Chap. I—Hudson

বীরবল প্রমথ চৌধুরীও বিষয় বা ভাব অপেক্ষা প্রকাশধর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

> আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের মনে যে সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ব্ব ও মহার্ঘ যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশ কাব্যে ভাব প্রকাশ করতে প্রস্তুত। ওই ভাব প্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যত বেশি হোক না, অপরের কাছে তার যা মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।[১]

'গুপ্ত কবি' তাঁহার একটি কবিতায় বলিয়াছিলেন,

> অগ্নি জল বায়ু আছে, আছে চাকা কল।
> চালাতে জানিনে আমি হয়েছি বিকল॥

শ্লেষের মধ্য দিয়া গুপ্ত কবি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছেন। চালানোর কৌশল জানা না থাকিলে উপকরণ অর্থহীন, কল তখন বিকল। যেহেতু সাহিত্য সৃষ্টি, তাই নির্ম্মাণ-কৌশল জানা না থাকিলে সৃষ্টি হয় না।

সাহিত্যের নির্ম্মাণ-কৌশলেরও নানা অঙ্গ আছে। প্রকাশ করিতে গিয়া লেখক মনোভাবকে আটপৌরে করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না, তিনি কাব্যদেহে ছন্দ যোগ করেন, তাহাকে বিবিধ কাব্যালঙ্কারে ভূষিত করেন, রচনায় গুণ আরোপ করেন এবং সর্ব্বোপরি বিশিষ্ট পদরচনা 'রীতি' দিয়া কাব্যদেহে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ভাবকে বা বস্তুকে সুন্দর করিবার অভিপ্রায়েই যে কবি সৌন্দর্য্য যোগ করেন তাহা নয়, 'সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ-ধর্ম্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে।' সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন, মহাকবিদের রচনায় ভাষা, অলঙ্কার, গুণ এবং রীত্যাদির সংযোগ 'অপৃথগ্-যত্ননির্বর্ত্ত্য'— এগুলিও যেন স্বাভাবিক ভাবেই রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

কাব্যের সৌন্দর্য্য 'ছন্দ' ও 'অলঙ্কার' লইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—তাহাদের সংখ্যাও অসংখ্য। আমরা এই দুইটি বিষয় লইয়া পরবর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে আলোচনা করিব। কাব্য-নির্ম্মিতির অন্যতম উপকরণ 'রীতি'। কেবল 'রীতি'কে অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ একটি বিশিষ্ট 'প্রস্থান' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' প্রণেতা আচার্য্য

১ বীরবলের হালখাতা (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)।

বামন, 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার কুন্তকাচার্য্য—রীতি-প্রস্থানের সমর্থক। প্রতীচ্য জগতের অনেক সমালোচকও কাব্য রচনায় রীতিবাদী। আমরা সংক্ষেপে সাহিত্যের 'রীতি'প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছি। সাহিত্যরচনায়, বিশেষ করিয়া সৃজন-ক্রিয়ায় 'রীতি' একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আচার্য্য বামন কাব্যাত্মার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, সৌন্দর্য্যই কাব্যের ভূষণ, তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপের দ্যোতক। এক হিসাবে সৌন্দর্য্যই কাব্যের অলঙ্কার। কিন্তু অলঙ্কার বলিতে পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ যে উপমা-অনুপ্রাসাদি বাহ্য অলঙ্কারকে বুঝিতেন, বামন সে অর্থে 'অলঙ্কার' শব্দটি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার 'অলঙ্কার' শব্দটির অর্থ ব্যাপক। কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকেই তিনি অলঙ্কার নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সৌন্দর্য্যই কাব্যের স্বরূপ, কাব্যের আত্মা। কাব্যে এই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ঘটে 'রীতি'কে আশ্রয় করিয়া। কাব্যের মাধুর্য্যাদি গুণও রীতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয়, বাহ্য অলঙ্কারগুলিও রীতির সহিত যুক্ত। তাই কাব্যসংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, তিনি রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বলিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।'

সাহিত্যে 'রীতি' বা style

এই 'রীতি' কি? বামন বলিলেন, 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা।'—পদরচনার 'বিশিষ্ট ভঙ্গিই রীতি, মাধুর্য্যাদি গুণ ইহার সহিত একাত্ম। তৎকালে এদেশে অঞ্চলভেদে বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি প্রচলিত ছিল। এক এক অঞ্চলের কবিরা এক এক রীতিতে কাব্য রচনা করিতেন, ইহা ছিল এক একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কবিগণের কাব্য রচনার বিশিষ্ট পদ্ধতি। বাক্যে অবয়বসংস্থানের এই ঢঙ্‌কেই, আচার্য্য বামন, 'রীতি' বা কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। রীতির মধ্যে বৈদর্ভী রীতিই তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ।

বাক্যে পদবিন্যাসের প্রণালীর মধ্যে কবির রচনা-কুশলতর পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহা প্রকাশধর্ম্মের একটি বড় বিশিষ্টতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ অঞ্চলের রীতিকে প্রাধান্য দেওয়ায় আচার্য্য বামন 'রীতি'র অর্থকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন। 'রীতি'র ধর্ম্ম-সম্পর্কে তিনি যে বিশাল মনোভাব পোষণ করিতেন, বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্য সম্পর্কে,—সেই সৌন্দর্য্যের প্রকাশক 'রীতি'কে মাত্র পদরচনার কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া এবং একটি আঞ্চলিক রীতিকে প্রধান মনে করিয়া তিনি কাব্যাত্মার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

১

কাব্যের ছন্দ

ছন্দ পদ্যবন্ধের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম। সকল দেশের আলঙ্কারিকগণই ছন্দকে কবিতার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। Aristotle বলিতেন, সঙ্গীত ও ছন্দের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেই কবিতার উদ্ভব হইয়াছে।

> Imitation being natural to us and also melody and rhythm, men...produced poetry.*

Carlyle কবিতাকে বলিয়াছেন, 'musical thought'; Edgar Allan Poe ইহাকে বলিয়াছেন, 'Rhythmic creation of beauty'; যদিও রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে মুক্ত-ছন্দ কবিতার পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, তথাপি তিনিও বলেন, কবিতা ভাবেরই ছন্দোরূপ:

> কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা।...অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে সুদূর নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে, তখনই সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়।[১]

অবশ্য গদ্যেও যে ছন্দ না থাকে, তা নয়। মানুষ যখন অত্যন্ত আবেগানুবিদ্ধ হইয়া ভাব প্রকাশ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহাতে ছন্দ আসিয়া পড়ে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' গদ্য-রচনা হইলেও ছন্দোময়। কবি Wordsworth রচনাকে সুগভীর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন, এজন্য তাঁহার নিকট গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা গদ্য হইলেও কবিতা, তাহাতেও ছন্দ আছে—নাম তার মুক্তক ছন্দ (free

* Poetics—Aristotle ১ বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ

verse)। আবেগ-প্রধান গদ্যে ছন্দ থাবে ; বিশেষ করিয়া সেই গদ্য যদি কবিতা হয়, তবে তাহাতে ছন্দ থাকিবেই।

পদ্যবন্ধে ছন্দ সুপ্রত্যক্ষ, ইহা পদ্যের সবিশেষ ধর্ম্ম। প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। পুরুষের বৈশিষ্ট্য তাহার পৌরুষে, নারীর বৈশিষ্ট্য তাহার কমনীয়তায় ; আগুনের বৈশিষ্ট্য তেজে, জলের বৈশিষ্ট্য রসে। তেমনই কবিতার বৈশিষ্ট্য তাহার ছন্দে। গদ্যে ছন্দ থাকিলেও চলে, না থাকিলেও ক্ষতি নাই ; কিন্তু কবিতায় ছন্দ চাই। দার্শনিক Hegel বলিতেন,

> Metre is the first and only condition absolutely
> demanded of poetry.

সঙ্গীত সুরহীন হইলে, নৃত্য তালহীন হইলে স্বর্গের অপ্সরীরা স্বর্গভ্রষ্ট হইতেন : তেমনই কাব্য ছন্দোহীন হইলে তাহার স্বর্গভ্রংশের আশঙ্কা থাকে। ছন্দই কবিতার বিশেষ শক্তি। ছন্দসরস্বতী স্বেচ্ছায় কাব্যে প্রকাশিত হন বলিয়া—কি সংস্কৃতে, কি ইংরাজীতে, কি বাঙলায়—কাব্যের অপর নাম 'ছন্দ'।

কেন, কেমন করিয়া ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে সুপ্রাচীন কাল হইতেই ছন্দের প্রচলন দেখা যায় :

> পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনই সর্ব্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দ-তরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।[১]

কেবল তাই কেন, যখন কবিতার সৃষ্টি হয় নাই, যখন মানুষ ইঙ্গিতে-ইশারায়, একাক্ষরী ধ্বনিতে মনোভাব প্রকাশ করিত, তখন হইতেই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার পর মানুষ মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে, কাব্য রচনা করিয়াছে। ঝাঁড়ে-ফুকে, সূক্তরচনায় দেবতার স্তব-গাথায়, পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কথনে ছন্দপ্রয়োগের বিরাম নাই ; ছন্দ কাব্যের একরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গবিশেষ।

আদিমতম জাতির ভূত ছাড়ানো মন্ত্রে, বৈদিক সূক্তে কিংবা ধর্ম্মমূলক সাহিত্যে কেন ছন্দ ব্যবহার করা হইত, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। ছন্দ তখন ছিল প্রয়োজনের সৃষ্টি। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'ছাদয়তি

---

১ বাংলা জাতীয় সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ (সাহিত্য)

এনং পাপাৎ কর্ম্মণঃ'--ছন্দ যজমানের পাপ কর্ম্মকে আচ্ছাদন করে। বৈদিক যুগে ছন্দ ছিল বেদাধ্যয়নের অঙ্গবিশেষ। ছন্দোজ্ঞানহীন ব্যক্তির বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা নিষেধ ছিল, কারণ ছন্দের লক্ষণ না জানিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে মন্ত্র অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হইত এবং তাহা যজমানের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করা হইত :

> মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন
> তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্র যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ
> স্বরতোঽপরাধাদিতি। (শিক্ষাশাস্ত্র)

আদিমতম জাতিরা ছন্দোময় মন্ত্রে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহার কারণ তন্ত্র-শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্র বলিতেছে, আনন্দস্বরূপিণী নাদরূপিণী মহাশক্তি স্পন্দনাত্মক। বাহ্যজগতে স্থূল ধ্বনির মধ্যে সেই নাদশক্তির প্রকাশ হয। মন্ত্রছন্দ সেই নাদের প্রতীক : তাই সাধক বলেন, 'মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া তেষাং ভেদা ন কর্ত্তব্যা' (তারা-প্রদীপ)। তন্ত্রমতে মন্ত্র, ছন্দ ও দেবতা এক। আদিমতম জাতিরাও ইহা মানিতেন, তাই ছন্দ-ছাদিত মন্ত্রে তাহারা দেবতার আবির্ভাব স্বীকার করিতেন।

কারণ যাহাই হউক, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মানুষ ছন্দের প্রয়োজন ও শক্তিকে স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ছন্দের মধ্যে তাহারা শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছে, দেখিয়াছে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। ছন্দে তাহাদের হৃদয়ে দোলা লাগিয়াছে, তাহারা পাইযাছে আনন্দ। মানুষের প্রকৃতিতে ছন্দের নেশা, তাই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাহারা ভাষাকে ছন্দের দোলায় নাচাইয়া তুলিয়াছে। তাহাতে তাহারা নিজেরাও যেমন আনন্দ পাইযাছে, অন্যের মনেও তেমনই আনন্দ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইযাছে।

কাব্য-নির্ম্মিতিতে ছন্দের স্থান

কাব্যসৃষ্টিতে ছন্দের স্থান কোথায় এবং কতটুকু—ইহা লইয়া বিতণ্ডার অন্ত নাই। কেহ ছন্দকে কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ মনে করেন, কেহ বলেন ছন্দ ছাড়াও কাব্যসৃষ্টি হইতে পারে। তবে সকলেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, ছন্দ কাব্য-কলার একটি প্রধান প্রসাধন-উপচার।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ 'রস'কে বলিয়াছেন কাব্যের আত্মা, ছন্দ সেই রসাত্মক কাব্যপুরুষের দেহের রোমরাজি,—'রোমাণি ছন্দাংসি' (রাজশেখর)।

সংস্কৃত কাব্য অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ হইলেও, কোথায়ও ইহা রসসৃষ্টির বাহ্য বা আন্তর উপাদানরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, একমাত্র 'স্থায়ী ভাব'—বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহযোগে রসে রূপান্তরিত হয়: এইগুলিই কাব্যের উপাদান। অলঙ্কার, রীতি, গুণ যেমন রসানুকূল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, ছন্দও তেমনই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সহায়ক মাত্র, ছন্দের সংযোগে রসের উপাদান মনোজ্ঞতা লাভ করে; ইহা ছাড়া ছন্দের স্বতন্ত্র কোন স্থান নাই।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কাব্যের ছন্দকে এত ছোট করিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা বলেন, হৃদয়োত্থিত সুতীব্র ভাবের প্রকাশই কবিতা। ভাব যদি উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে তাহা কবি ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। সেস্থলে পদের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, বাক্যের নিয়মিত ছেদ ভাবকে সুসংযত করে এবং সেই সঙ্গে ছন্দের স্পন্দন হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দও সঞ্চার করিয়া থাকে:

> Without rhythm the expression of passion becomes spasmodic and painful, like the sobbing of a child. Rhythm averts this pain by giving a sense of order controlling and directing passion. Hence rhythm is in place wherever speech is impassioned and intended at the same time to be pleasurable.*

রবীন্দ্রনাথ যদিও শেষের দিকে কাব্যে ছন্দ বর্জ্জন সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 'কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে: ছন্দটা এর পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে' (কাব্য ও ছন্দ)—তথাপি প্রথম দিকে কাব্য-ছন্দের গভীরতর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, কবিতার একটি প্রধান বিশেষত্ব ইহার গতিশীলতা। কাব্যের ছন্দ কবিতার মধ্যে বেগ সঞ্চার করে এবং সাধারণ কথার মধ্যে চিরকালের প্রবহমাণতা আনিয়া দেয়; উপরন্তু ছন্দই ভাষার মধ্যে ভাষাতীতের আভাস সৃষ্টি করে। কবিতার কাজ কেবল সংবাদ পরিবেশন করা নয়, প্রাত্যহিক তুচ্ছতার খবর দেওয়াও নয়—সীমার জগতে অসীমের সংবাদ বহন করিয়া আনাতেই তাহার সার্থকতা। মানুষের সাধারণ কথাবার্ত্তা সামান্যের অতিরিক্ত কোন অসামান্যতাকে, ইন্দ্রিয়বোধের

---

*English lessons for English people—Abbot and Seeley

অতিশায়ী বিরাট সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না—প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মিটাইতেই তাহার শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়, 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে।' ছন্দ এই ভাষাকে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন করিয়া তুলে, ভাষাকে প্রাত্যহিকতার বন্ধন মুক্ত করিয়া ভাবের স্বাধীন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় ছন্দের এই অপরিসীম ক্ষমতার কথাই রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট করিয়াছেন কবি বাল্মীকির মুখে :

> মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
> অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীনলোকে।

ছন্দের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ লক্ষণ

'ছন্দ' শব্দটি নানার্থবোধক। ইংরাজিতে ছন্দ বলিতে Verse, Rhythm Metre শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয়। Verse কোথায়ও পদ্যবন্ধের সাধারণ নাম, যেমন, 'Who says in *Verse* what others say in prose' (Pope) ; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইহার অর্থ ছন্দোবদ্ধ কবিতার চরণ (Metrical line). ছন্দ বুঝাইতে Rhythm শব্দটিরও বহুল প্রয়োগ ইংরাজিতে দেখা যায়। Rhythm শব্দটির অর্থ ছন্দস্পন্দন। নৃত্যে, সঙ্গীতে, গদ্যে বা পদ্যবন্ধে তরঙ্গায়িত গতি হইতে সামগ্রিকভাবে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই Rhythm : ইহা গদ্যেও থাকিতে পারে, পদ্যেও থাকিতে পারে। Metre শব্দটিই ইংরাজি ছন্দের স্বরূপ-প্রকাশক। Aristotle বলেন, 'Metres are subdivisions of rhythm'—উক্তিটি একদিক হইতে সত্য হইলেও, Metre-কে ইংরাজ আলঙ্কারিকগণ সঙ্কীর্ণার্থে প্রয়োগ করেন না। Metre-এ Rhythm-এর সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান, উপরন্তু ইহা পদ্যবন্ধের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। পণ্ডিতপ্রবর Bain বলেন,

> Metre is the generic mark which is common to all poetry, distinguishing poetry from prose. *

ইংরাজিতে কোন শব্দ উচ্চারণ করিবার কালে, কোন একটি Syllable-এর উপর বেশি জোর দেওয়া হয় : ইহাকে বলে accent (স্বরাঘাত)। ইংরাজি শব্দ কতকগুলি accented ও unaccented syllable-এর সমষ্টি।

*English Composition & Rhetoric—Alexander Bain.

ছন্দোনির্মিতিতে এই স্বরাঘাতপূর্ণ এবং স্বরাঘাতবিহীন syllable-গুলিকে একটি চরণে বিশেষ নিয়মে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয় যে, তাহাদের পুনঃপুনঃ উচ্চারণে ছন্দস্পন্দনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্পন্দন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে syllable-সমূহের এই বিন্যাসকে বলে Metre: 'Metre is the modulated repetition of a rhythmical pattern'—ইহাই ইংরাজি ছন্দ-সংজ্ঞা।

সংস্কৃতেও লঘু গুরু অক্ষরের নিয়মবদ্ধ বিন্যাসকে ছন্দ বলা হয়। কিন্তু এই সকল ছন্দ-সংজ্ঞা দ্বারা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ'—এই যাস্কনিরুক্তিতে ছন্দের অনেক বড় পরিচয় রহিয়াছে। যাহা ত্রুটি আচ্ছাদন করে, তাহাই ছন্দ। পাণিনি ব্যাকরণে ছন্দের আরও গূঢ়তর লক্ষণ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে: 'চন্দয়তি হ্লাদয়তীতি ছন্দঃ' (সিদ্ধান্ত কৌমুদী)—যাহা হৃদয়ে আহ্লাদ সঞ্চার করে, তাহাই ছন্দ। অতএব প্রসারিতার্থে যাহা হৃদয়ের আহ্লাদজনক, সঙ্কুচিতার্থে তাহা লঘুগুরু অক্ষর-বিন্যাসের একটি প্রণালীমাত্র। ছন্দার্থের এই প্রসার ও সঙ্কোচকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারিলে ছন্দের অনেকটা পূর্ণ সংজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট হইতে পারে। ছন্দের পূর্ণ সংজ্ঞার্থ নিরূপণে বাঙালী আলঙ্কারিকগণের মধ্যে এইরূপ একটা প্রচেষ্টা বহুদিন যাবত চলিয়া আসিতেছে। পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় বলেন:

> পদ্যের মিষ্টতা সম্পাদন জন্য নানাপ্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া লিখিতে হয়। প্রত্যেক নিয়মকে এক এক ছন্দ বলে।[১]

কিন্তু এ সংজ্ঞার্থও পূর্ণাঙ্গ নয়। ছন্দ শব্দটিকে আমরা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমরা কথায় বলি, 'লোকটির কথায় কোন ছাঁদ (<ছন্দ) নাই'—এখানে 'ছাঁদ' বলিতে বুঝায় শ্রী বা সৌন্দর্য্য। যখন আমরা স্বর্ণকারকে বলি, 'নূতন ছাঁদে গয়নাটি গড়িও', তখন ছন্দ বলিতে বুঝি একটা Pattern; এই অর্থেই রাধিকা 'কাণড়ী ছন্দে' কবরী রচনা করেন, ব্রজবাসী 'চকোরক ছন্দে' শ্রীকৃষ্ণের আননচন্দ্র আস্বাদন করেন। আবার কবি যখন বলেন, 'ছন্দে উদিছে তারকা, ছন্দে কনক রবি উদিছে'—তখন ছন্দ বলিতে বুঝায় গতির সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্য। 'এতো গীতি, এতো ছন্দ'—

১ ভাষাবিজ্ঞান—দুর্গাচরণ সান্ন্যাল।

এস্থলে ছন্দের অর্থ ঝঙ্কারমুখর পদাবলী। অতএব ব্যাপ্ত্যর্থে ছন্দ বলিতে বুঝায়, গতির সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্য, ধ্বনির ঝঙ্কার, নৃত্যের দোলা এবং এই সকল মিলিয়া এক সুন্দর সামঞ্জস্য। ইহা আহ্লাদজনক।

ছন্দের এই সকল স্বরূপ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছন্দের কোন সঠিক সংজ্ঞার্থই এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। কাব্যের বিশেষ ক্ষেত্রে, ভাষা ও অক্ষরের পরিমিত সীমার মধ্যে, জিহ্বার বিরতি বা ভাবের ছেদে যে ছন্দদোলা অনুভূত হয়, আলঙ্কারিকগণ তাহারই সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য সুনীতিকুমার বলেন:

> বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়; পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।[১]

ছন্দের এই সংজ্ঞার্থটি ইংরাজি Metre-সংজ্ঞার প্রতিধ্বনির মত শুনাইলেও, 'ধ্বনিগত সুষমা' কথাটি গভীর তাৎপর্য্যবোধক। ইহা ছন্দের প্রাণধর্ম্মকে অনেকখানি সুস্পষ্ট করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছন্দকে রসোদ্বোধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন:

> যে ভাবে পদ-বিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়; তাহাকে ছন্দঃ বলে।[২]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন,—ছন্দ, অলঙ্কার কোনটিই রসাভিব্যক্তির উপাদান নয়। রসোদ্ভবনের একমাত্র উপাদান 'ভাব', ইহাই বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগে রসে পরিণত হয়। ছন্দ-অলঙ্কার রসের সঞ্চার করে না, রসানুকূল 'সৌন্দর্য্য' সৃষ্টি করে। ছন্দ, অলঙ্কার রসানুসারী সৌন্দর্য্য মাত্র, ইহা কাব্যের শোভাবর্দ্ধক। এগুলি কখনও ভাব জাগায় না, রসও সঞ্চার করে না,—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেয়। রসের আস্বাদন হয় হৃদয়ে আর সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয় মস্তিষ্কে। ছন্দের সৌন্দর্য্যকে আমরা হৃদয় দিয়া অনুভব করি না, স্থূল ইন্দ্রিয় (কর্ণেন্দ্রিয়) দিয়া উপলব্ধি করি। তাই আলঙ্কারিকগণ রসাস্বাদনের আনন্দকে বলেন Emotional pleasure আর অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিকে বলেন রম্যবোধ বা Intellectual pleasure

---

১ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২ বাংলা ছন্দের মূল সূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

(দ্রষ্টব্য 'কাব্যালোক'—প্রথম অধ্যায়)। অতএব ছন্দ রসসঞ্চার করে না, রসবোধ জাগ্রত করে : ধ্বনির গতিতে, সৌন্দর্য্যে, পারিপাট্যে 'ভূষণা উপলব্ধ হয়'। এই দিক হইতে উপরের সংজ্ঞার্থটি অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট।

'সৌন্দর্য্যতত্ত্বে'র ভিত্তিতে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছন্দের এইরূপ সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :

> কাব্যভাষার অন্তর্গত বিচিত্র ভঙ্গীর প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্য্যকে বলা হয় 'ছন্দ'।...সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে ছন্দ বা 'প্রবহমান ধ্বনি'-সৌন্দর্য্যের অর্থ দাঁড়ায়—একটি পূর্ণ ধ্বনি-প্রবাহের সুসমঞ্জস ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গী।[১]

যদিও এই নির্ব্বচনে রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত,—যে ছন্দ মানুষের জীর্ণবাক্যকে ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলে, ভাষাকে প্রযোজনীয় অর্থের বন্ধন মুক্ত করিয়া ভাবের স্বাধীন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়—সেই ছন্দের পূর্ণ পরিচয় নাই, তথাপি কাব্যছন্দের আলোচনায় শ্রীভট্টাচার্য্যের এই সংজ্ঞার্থটি গ্রহণীয়। ছন্দের ব্যবহারিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা রচিত। তবে ছন্দের সূক্ষ্মার্থ বিচারে মনে রাখিতে হইবে, রম্যবোধ চরিতার্থ করিয়া ছন্দ নিজস্ব গতিবেগদ্বারা ভাবকেও প্রভাবান্বিত করিতে পারে, ছন্দের স্পর্শে ভাব কখনও চটুল, কখনও বিলম্বিত হয়, কখনও ইহা হয় উচ্ছল, কখনও বা গম্ভীর।

১ ছন্দোবিজ্ঞান—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য।

২

ছন্দের মূলতত্ত্ব ও উপাদান

ছন্দের সংজ্ঞার্থ হইতে দেখা গিয়াছে, ধ্বনিপ্রবাহগত একটি সামঞ্জস্যের সুষমাই ছন্দের সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য সামগ্রিক ভাবে একটি কম্পন ও স্পন্দন হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্পন্দন হইল ছন্দের প্রাণ। একটি ছন্দে স্পন্দনের লীলাই ছন্দিত হয়, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে। ছন্দকে একটি ঊর্ম্মিমালার সহিত তুলনা করা যায়। অসংখ্য জলকণা নিজেদের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া স্পন্দিত হইতেছে, সেই স্পন্দিত জলকণা আবার বাইরের বাতাসের সংঘর্ষে এক একটি ধ্বনিমুখর তরঙ্গে পরিণত হইতেছে: তরঙ্গ একটি নয়, বহু; সেই শত শত তরঙ্গ শ্রেণীবদ্ধ হইযা কল্লোলিত ঊর্ম্মিমালার সৃষ্টি করিতেছে। সর্ব্বত্রই স্পন্দনের কলরোল: জলকণায় স্পন্দন, তরঙ্গে স্পন্দন, তরঙ্গমালায় স্পন্দন। ছন্দও ঠিক এমনই স্পন্দনাত্মক। ইহার ধ্বনিতে স্পন্দন, শব্দে স্পন্দন, শব্দমালায় স্পন্দন। স্পন্দন সৃষ্টির মধ্যেই ছন্দের মূলতত্ত্ব নিহিত।

স্পন্দন-সৃষ্টির মূল কারণ বিশ্লেষণ করিলে, গতি আর বিরতির নিয়মিত খেলা দেখা যায়। সুনিয়মিত ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, থামা আর চলা—এইগুলিই স্পন্দন সৃষ্টির কারণ। ছন্দে নানাদিক হইতে নানাভাবে, এই গতি ও বিরতির লীলা প্রকাশিত হয়। একটি ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই ছন্দস্পন্দন আত্মপ্রকাশ করে। ভাষার মূলীভূত উপাদান ধ্বনি, শব্দ, ভাব ইত্যাদি। একটি ছন্দেও একযোগে থাকে ধ্বনির বৈচিত্র্য, শব্দের ঝঙ্কার, ভাবের নিয়মিত ছেদ: ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ এইগুলির সমবায়েই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। এই যে ধ্বনির বৈচিত্র্য, শব্দের ঝঙ্কার, ভাবের সুসংযত বিন্যাস—ইহাদের মধ্যেও গতি আর বিরতির লীলা। ভাষার প্রকৃতিভেদে গতি ও বিরতির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে: ইংরাজি ছন্দে ছন্দস্পন্দন সৃষ্টি হয় accented ও unaccented syllable-সমূহের নিয়মসঙ্গত সমাবেশে, সংস্কৃত ছন্দেও দোলা জাগে লঘু-গুরু অক্ষরের নিয়মবিশিষ্ট বিন্যাসে—কিন্তু বৈদিক ছন্দে স্পন্দন সৃষ্টি হইত স্বরের উত্থান-পতনে। যে ভাবেই হউক, যে-সকল উপাদান লইয়া এই স্পন্দন সৃষ্টি হয়, তাহাই ছন্দ ও ছন্দসৃষ্টির উপকরণ। দেশভেদে ভাষার রূপগত পার্থক্য যাহাই থাকুক, অঞ্চলভেদে ইহার রূপান্তর যাহাই হউক প্রত্যেক দেশের ভাষা ও ছন্দের

কতকগুলি সাধারণ উপাদান বর্ত্তমান থাকে। এই উপাদানগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রথম প্রয়োজন। আমরা নিম্নে সেই উপাদান সমূহের আলোচনা করিতেছি।

ধ্বনি (Sound)

ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বাক্য পাওয়া যায়। বাক্যের উপাদান কতকগুলি পদ। পদের মূল প্রকৃতি শব্দ। এই শব্দ কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি। ধ্বনিই ভাষার অণুতম উপাদান। 'মা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে 'ম্+আ' —এই দুইটি ধ্বনি পাওয়া যায়; তেমনই 'অঙ্গুলি' শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় অ+ঙ্+গ্+উ+ল্+ই। ইংরাজি Foot শব্দটি F+oo+t—তিনটি ধ্বনি লইয়া গঠিত, truth শব্দটি t+r+u+th—চার ধ্বনিময়। সংস্কৃত 'নারীণাং' শব্দটিতে ন্+আ+র্+ঈ+ণ্+আং--ছয়টি ধ্বনি রহিয়াছে।

ধ্বনিই একটি ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ। তন্ত্রশাস্ত্রে ধ্বনিকে বলা হয় নাদ। নাদের মধ্যেই অব্যক্ত শক্তি অভিব্যক্ত হন। এই নাদের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারিটি অবস্থা। পরা অবস্থায় নাদ এক প্রকার নিস্পন্দ, পশ্যন্তী অবস্থায় সামান্য স্পন্দ অনুভূত হয়; হৃদয়ে আসিয়া এই নাদ বিশেষ স্পন্দে পরিণত হয়, বুকের ধুক্‌পুকি সেই বিশেষ স্পন্দ। কিন্তু তখনও ইহা উচ্চার্য্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হয় না। কণ্ঠে আসিয়া ইহা 'স্পষ্ট তার' অর্থাৎ স্পষ্ট ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই স্পষ্ট 'তার' আমাদের মুখের ধ্বনি (Sound); ইহা যেমন ভাষার মূল উপাদান, তেমনই ছন্দের মূল উপাদান।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লিপিমালায় আমরা যে বর্ণগুলি দেখি, তাহা ধ্বনি নয়, ধ্বনির মূর্ত্তি বা প্রতীকচিহ্ন। 'বর্ণ শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ'। এই বর্ণ কিন্তু ছন্দের উপাদান নয়। বর্ণচিত্র নয়, শ্রুতিগম্য ধ্বনিই ছন্দের মূল ভিত্তি। ছন্দ নয়নানন্দ নয়, কর্ণামৃত। ছন্দের 'শব্দভেদী বাণ' ধ্বনিকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়। ধ্বনির প্রকৃতি না জানিলে ছন্দোবোধ হয় না; শুধু তাই নয়, ধ্বনির স্বরূপ না জানিলে ছন্দোবিচারে অনর্থপাত ঘটে। রাজা দশরথ ধ্বনির প্রকৃতি না জানিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া যে মহা অনর্থের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সে সংবাদ কাহারও অবিদিত নয়।

ধ্বনি ও বর্ণ
ধ্বনিই ছন্দের উপজীব্য

স্বরূপতঃ ধ্বনি হইল স্পন্দন (Vibration): কোন বস্তুতে আঘাত লাগিলে যে কম্পন বা স্পন্দন সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেই ধ্বনির উৎপত্তি। বাতাসে যখন

কম্পন জাগে, তখন ধ্বনি সৃষ্টি হয়: 'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে।' প্রকৃতিতে, পশুপক্ষীর কণ্ঠে আমরা প্রতিনিয়ত ধ্বনি শুনি। প্রকৃতিজাত বা পশুপক্ষীর কণ্ঠজাত ধ্বনি কাব্যছন্দের ধ্বনি নয়। পশুপক্ষীর কণ্ঠধ্বনি সঙ্গীতের মূলাশ্রয়; সঙ্গীতের সপ্তস্বর (সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি)— এই ধ্বনি হইতে গৃহীত। কাব্যছন্দের ধ্বনি মনুষ্যের কণ্ঠোদ্গীর্ণ ধ্বনি। এই ধ্বনিতে যে কত বৈচিত্র্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা কখনও উচ্চ, কখনও নিম্ন: কখনও গম্ভীর, কখনও মৃদু; মানুষের বাগ্‌যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ইহার আরও কত বৈচিত্র্য। এই ধ্বনিই ছন্দের মূল ভিত্তি।

[ক] ধ্বনির প্রকারভেদ

মনুষ্যের কণ্ঠোদ্গীর্ণ ধ্বনিই, ভাষা বা ছন্দের ধ্বনি। সাধারণতঃ নিঃশ্বাস-বায়ু (অনাহত ধ্বনি) ফুসফুস হইতে কণ্ঠনালীতে আসে; কণ্ঠ হইতে তাহা মুখবিবর অথবা নাসিকাপথে বাহিরে আসে। কণ্ঠ হইতে বাহিরে আসিবার কালে এই বায়ু কণ্ঠে বা মুখবিবরে বাধা প্রাপ্ত হয়। এই বাধার ফলেই ধ্বনি সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাধার স্থান ও প্রকার অনুযায়ী ধ্বনিরও প্রকারভেদ ঘটে।

ধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি (হল্)। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন:

> যে ধ্বনি উচ্চারণে নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে স্বরধ্বনি (vowel) বলে।…মুখবিবরের মধ্যে যে-কোন স্থলে কোন্ রকম বাধার সৃষ্টি হইলে ব্যঞ্জনধ্বনির (consonant) উদ্ভব হয়।[১]

স্বরধ্বনি :—সংস্কৃতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এই স্বরধ্বনিগুলির প্রচলন দেখা যায়: তন্মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ হ্রস্বস্বর এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ—দীর্ঘস্বর। হ্রস্বস্বরের উচ্চারণে যতটা সময় লাগে, দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগে। সংস্কৃতে হ্রস্ব-দীর্ঘের উচ্চারণে এই কাল-দৈর্ঘ্য বাঁধাধরা, ইহার কোন ব্যত্যয় নাই। আহ্বানে, রোদনে বা গান করিবার সময়ে স্বরধ্বনিগুলি আরও একটু দীর্ঘকাল ধরিয়া উচ্চারিত হয় অর্থাৎ হ্রস্বের তিনগুণ হয়: এ-সব ক্ষেত্রে স্বরধ্বনিকে বলা হয় প্লুতস্বর।

১ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডাঃ সুকুমার সেন।

বাঙলা লিপিমালায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ—প্রভৃতি স্বরধ্বনি আছে। সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙলায় দীর্ঘস্বর গৃহীত হইলেও, সংস্কৃতে যেমন হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরধ্বনির উচ্চারণের কালপরিমাণ বাঁধাধরা, বাঙলায় তেমন নয়। সাধারণতঃ বাঙলায় সব স্বরের উচ্চারণই হ্রস্ব, প্রয়োজনগতিকে ইহাদের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়।

ঐ, ঔ-কে বাঙলায় যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর বা দ্বি-স্বর ধ্বনি (Diphthong) বলা হয়। কারণ ইহারা প্রকৃতপক্ষে দুইটি মৌলিক স্বরধ্বনির সংযোগে সৃষ্ট—ঐ=অ+ই (ও+ই) এবং ঔ=অ+উ (ও+উ)। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন, চলিত বাঙলা ভাষায় ইএ, এই, আই, আউ, উই প্রভৃতি ২৫টি সংযুক্তস্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়।[১] এস্থলে দুইটি স্বরধ্বনি পর পর দ্রুত উচ্চারিত হয় প্রথমটির উচ্চারণ স্পষ্ট, দ্বিতীয়টির উচ্চারণ অস্পষ্ট। বাঙলায় যৌগিক স্বর প্রকৃতপক্ষে একটি স্বরধ্বনিরই দ্যোতনা করে এবং ইহার দৈর্ঘ্যও একটি হ্রস্বস্বরের সমান। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বাঙলায়—অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা—এই সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন।

ইংরাজিতে স্বরধ্বনি পাঁচটি a, e, i, o, u : ইহাদেরও হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ হয়; যেমন fit (i=ই), feet (ee=ঈ) ; অনেকগুলি যৌগিক স্বরও (Diphthong) আছে, যেমন ai (Str*ai*t), ow (h*ow*) : কিন্তু ইংরাজি উচ্চারণে হ্রস্ব হউক, দীর্ঘ হউক বা যৌগিক হউক—উচ্চারণের কাল-দৈর্ঘ্যকে স্বীকার করা হয় না। ইংরাজি ছন্দের বিচারে এই কালদৈর্ঘ্যের কোন মূল্য নাই।

ব্যঞ্জনধ্বনি :— সংস্কৃতে ও বাঙলায় ং (অনুস্বার) ও ঃ (বিসর্গ) বাদে মোট ৩৩টি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। ক্ হইতে ম্, য্, র্, ল, ব্, এবং শ্, ষ্, স্, হ্ মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি। আর ক্ত, জ্ঞ, চ্য, প্র, হ্ল, স্ব প্রভৃতি সংযুক্ত ব্যঞ্জন। তিন বা চারটি ব্যঞ্জন মিলিয়াও সংযুক্ত ব্যঞ্জন হয়, যেমন জ্জ্ব (উজ্জ্বল), ষ্ঠ্য (ওষ্ঠ্য), র্দ্ধ (ঊর্দ্ধ)। বলা বাহুল্য ক্ষ (ক্+ষ্) সংযুক্ত ব্যঞ্জন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রত্যেক ভাষাতেই একমাত্র স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্বয়ংপূর্ণ এবং স্পষ্ট ; ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ অপূর্ণ ও অস্পষ্ট।

১ ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে 'যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ' বলা হইয়াছে। ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সর্ব্বথা স্বরাশ্রয়ী—স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ব্যঞ্জনধ্বনি রাখিয়া তবে তাহার উচ্চারণ হয়, যেমন, ক্+ই=কি, শ্+আ=শা, র্+উ=রু কিংবা, আ+র্ =আর্, এ+ক্=এক্, ই+শ্=ইশ্ ইত্যাদি। সংযুক্ত ব্যঞ্জনও স্বরযুক্ত হইয়াই উচ্চারণযোগ্য হয়। যেমন, [(শ্+র্)+ঈ]=শ্রী, [(ক্+র্)+অ] =ক্র। ধ্বনিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বরধ্বনিই রাজা, ব্যঞ্জন তাহার অধীনস্থ প্রজা। ছন্দের আলোচনায় স্বরধ্বনিরই বিশেষ প্রাধান্য। 'স্বয়ং রাজন্তে যে তে স্বরাঃ' —সার্থক স্বরের এই ব্যুৎপত্তি, বিশেষতঃ ছন্দের আলোচনায়।

[খ] ছন্দের গণনীয় ধ্বনি : অক্ষর

ধ্বনিই ছন্দের মূল উপাদান। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যষ্টিগতভাবে অনুচ্চার্য্য, একমাত্র স্বরধ্বনির উচ্চারণই স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চার্য্য ধ্বনি বা ধ্বনি-গুচ্ছই ছন্দের অণুতম উপাদান। এই উপাদানটিকে ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষর' বলা হয়। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন :

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি অক্ষরে একটি করিয়া স্বরধ্বনি থাকিবেই। তাহা হইলে বলিতে হয়,—বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত একটি স্বরাশ্রিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছই অক্ষর : মা, বৌ, চল্, ইশ্, শ্রী, ওম্, দুঃ— এক একটি অক্ষর। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন অক্ষরকে বলেন 'স্বর'। সংস্কৃতে অক্ষরকে 'দল'ও বলা হয়। শ্রীযুক্ত সেন অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'দল' (=স্বর) শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন।

ইংরাজির Syllable এবং বাঙলার 'অক্ষর' এক এবং অভিন্ন। Syllable —একটি vowel দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি : Infirm শব্দটিতে দুইটি Syllable—In-firm, Night শব্দটিতে একটি Syllable, Daffodil শব্দটিতে তিন Syllable—Da-ffo-dil. সংস্কৃতে সাধারণভাবে 'অক্ষর' বলিতে বর্ণ ও Syllable দুই-ই বুঝায়। 'অক্ষরাণামকারোঽস্মি' (গীতা)—এখানে অক্ষর=বর্ণ, কিন্তু 'বৃত্তমক্ষরসঙ্খ্যাতম্'—এখানে অক্ষর=Syllable ; সংস্কৃতেও অক্ষর স্বরাশ্রিত, 'স্বরা অক্ষরসংজ্ঞাঃ স্যু হলন্তদনুযায়িনঃ' (রুদ্রযামল)। 'নারীণাং'—শব্দটিতে তিনটি অক্ষর : 'চল সখি কুঞ্জং'—বাক্যটিতে ছয়টি অক্ষর।

বাঙলায় এককভাবে স্বরধ্বনি কিংবা সমষ্টিগতভাবে ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরধ্বনিই অক্ষরপদ-বাচ্য। কেবল ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়া অক্ষর হয় না। ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরের পৃষ্ঠে বা পরে বসিয়া অক্ষরযুক্ত হয়: কি, হৈ, এক্, ইশ্, শ্রী—প্রত্যেকে এক একটি অক্ষর।

অক্ষরের শ্রেণী-বিভাগ—উপরের অক্ষরগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কোন কোন অক্ষরের শেষধ্বনি একটি মৌলিক বা যৌগিক স্বর, যেমন, কি, হৈ, শ্রী, আবার কোন কোন অক্ষরের শেষধ্বনি একটি ব্যঞ্জন (হল্), যেমন, এক্, ইশ্। শেষের উচ্চার্য্য ধ্বনি অনুসারে বাঙলা অক্ষর তিনভাগে

(১) **মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর**=যে অক্ষরের শেষধ্বনি একটি মৌলিক স্বর; যেমন, অ-না-মি-কা, কা-লী, ঋ-তু, প্রী-তি ইত্যাদি। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে সবগুলি অক্ষরই স্বরান্ত: 'রাশি রাশি ভারা ভারা', 'যদি আঁখি পড়ে ঢুলে'।

(২) **যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর**=যে অক্ষরের শেষধ্বনি একটি যুগ্মস্বর (Diphthong): যেমন, হৈ-হৈ, বৌ, দই (অ+ই), ম্যাও (এ্যা+ও), খাই (আ+ই): হৈ-হৈ রৈ-রৈ। দাও দৈ চাই খৈ॥

(৩) **হলন্ত (ব্যঞ্জনান্ত) অক্ষর**=যে অক্ষরের শেষধ্বনি একটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি: যেমন, উট্, অপ্, মৎ, আন্, বন্-ধন্ (বন্ধন), মুশ্-কিল্। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে সবগুলি অক্ষরই হলন্ত: 'রাত-দিন ঝম্ ঝম্, রাত-দিন টুপ্ টুপ, 'চরকার ঘর্ঘর্, পড়শীর ঘর ঘর।'

বাঙলা অক্ষরের উচ্চারণ— বাঙলায় অক্ষরের গঠন ও উচ্চারণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক:

(১) সংস্কৃতে অ-কারান্ত শব্দের শেষের 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, যেমন, জল, ফল, সাগর, জলধর। এগুলি সবই স্বরান্ত অক্ষর। কিন্তু বাঙলায় পদান্তের 'অ' ধ্বনি প্রায়ই উচ্চারিত হয় না, ফলে উপরের শব্দগুলির উচ্চারণ হয়—জল্, ফল্, সাগর্, জলধর্। সংস্কৃতের অ-কারান্ত অক্ষর শব্দের শেষে আসিলে বাঙলায় হলন্ত হইয়া যায়, যেমন, 'শমন্ দমন্ রাবণ্ রাজা রাবণ্ দমন্ রাম্।'

তবে কয়েকটি শব্দে পদান্তের 'অ'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে, যথা—বড়, ছোট, এগার, বার, ষোল, শত, যত, কত, যেন, হেন, কাঁদ-কাঁদ, মৃগ, বৃষ,

মৃদু, জেয়, পেয়, মহত্তম, তর, মম ইত্যাদি : 'অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে। ললিত গীত-কলিত-কল্লোলে।'

(২) সংস্কৃতে পদমধ্যস্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়, যেমন—চ-ন্দ-না, স-ন্ধি, গু-ঞ্জি-ত—কিন্তু বাঙলায় ইহাদের—বিশিষ্ট উচ্চারণ হয়, চন্-দ-না, সন্-ধি, গুঞ্(ন্)-জি-ত।

(৩) বাঙলায় যে-কোন শব্দকে দুই অক্ষরের করিয়া উচ্চারণ করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। সংস্কৃতে যে-সকল শব্দ তিন বা চার অক্ষরের, বাঙলায় তাহাকেও দুই অক্ষরে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা চলে, যেমন, ব-ন্ধ-ন (তিন অক্ষর), বাঙলায় বন্-ধন্ (দুই অক্ষর) : সংস্কৃতে ভা-গি-নে-য় (চার অক্ষর), বাঙলায় ভাগ্-নে (দুই অক্ষর)। আবার সংস্কৃতের একাক্ষরী শব্দ 'শ্রী' বাঙলায় হয় সি-রি (=ছি-রি), স্ত্রী=ই-স্ত্রী (দুই অক্ষব)।

(৪) একাক্ষরী হলন্ত শব্দে স্বরধ্বনিকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা বাঙলা উচ্চারণের একটি প্রধান বিশিষ্টতা। বাঙলা লিপি অক্ষরাত্মক (Syllabic), এইজন্য এক অক্ষরেই যে দুই অক্ষর থাকে তাহা চোখে দেখিয়া বুঝা যায় না, উচ্চারণে ধরা পড়ে : বিশেষ করিয়া একাক্ষরী হলন্ত শব্দে দুই অক্ষরের অবস্থান লক্ষণীয়। যেমন, জল্—ইহার উচ্চারণ জ-ল্, সাপ্=সা-প্, এ্যাক্=এ্যা-ক্ ইত্যাদি। 'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান'—এখানে 'রাম্', 'দাস্', 'বান্' প্রভৃতি হলন্ত অক্ষরে দুইটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে : পংক্তিটিতে মোট অক্ষর আছে চোদ্দটি।

[গ] ধ্বনির বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম্ম

ধ্বনির বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। ধ্বনি কখনও তীব্র, কখনও মৃদু—কখনও গম্ভীর, কখনও গাম্ভীর্য্য-বিহীন। ইহা কখনও হ্রস্ব, কখনও দীর্ঘ, কখনও ইহার গতি দ্রুত—কখনও বিলম্বিত বা ধীর। মানুষের কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, তালু, দন্ত ও ওষ্ঠকে আশ্রয় করিয়াও ইহার কত না ভঙ্গি। ছন্দের নির্ম্মিতিতে ধ্বনির এই সকল বৈচিত্র্যের মূল্য অসাধারণ।

ধ্বনি-বিজ্ঞানের মতে ধ্বনির এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা হয় ধ্বনির ধর্ম্ম। ধ্বনির চারিটি প্রধান ধর্ম্ম, [এক] শক্তি, [দুই] দৈর্ঘ্য, [তিন] সুর ও [চার] জাতি।

[এক] ধ্বনির শক্তি বলিতে বুঝায়, কোন ধ্বনির উপর আরোপিত বল। একটি শব্দের সবগুলি ধ্বনির উচ্চারণ সমান জোরে করা যায় না— কোনটিতে জোর বেশি লাগে, কোনটিতে জোর কম লাগে। যেটির উচ্চারণকালে বেশি জোর প্রয়োজন হয়, সেখানে শ্বাসবায়ু অধিকতর বেগে বহির্গত হয়, তাহাতে ধ্বনির গাম্ভীর্য্যও বাড়িয়া যায়। উচ্চারণগত এই বল-প্রাধান্যকে ধ্বনির শক্তি বলা হয়।

সাধারণভাবে এই শক্তি বা জোরকে ইংরাজিতে accent বলে। ইংরাজী ছন্দে ধ্বনির শক্তিই প্রধানভাবে গণনীয়। এখানে শব্দগুলি accented ও unaccented syllable লইয়া গঠিত হয়: একটি শব্দের প্রধান অংশেই accent থাকে এবং অবস্থা-গতিকেও এই accent-এর স্থান পরিবর্ত্তিত হয় না। Accented ও unaccented syllable-এর নিয়ম-বিশিষ্ট বিন্যাসে ইংরাজি ছন্দের এক একটি foot (= গণ) গঠিত হয়, এইরূপ এক একটি foot-এর পুনরাবৃত্তিতে এক একটি ছন্দ গড়িয়া উঠে, যেমন,

(i) Iambic = Unaccented + Accented :

⏑ / ⏑ / ⏑ / ⏑ /
The *way* | was *long* | the *wind* | was *cold*

⏑ / ⏑ / ⏑ / ⏑ /
The *min* | strel *was* | in *firm* | and *old*

(ii) Trochaic = Accented + Unaccented :

/ ⏑ / ⏑ / ⏑ / ⏑
Gen tle | *ri* ver | *gen* tle | *ri* ver

/ ⏑ / ⏑ / ⏑ /
Lo thy | *streams* are | *stained* with | *gore*

এইরূপ Anapaestic = U + U + A, Dactylic = A + U + U ইত্যাদি।

সংস্কৃতেও অক্ষরের শক্তি ছন্দের প্রধান ভিত্তি। শক্তিভেদে অক্ষর দুই প্রকারের হয়—লঘু এবং গুরু। অল্প শক্তিতে উচ্চারিত ধ্বনি লঘু এবং বেশি শক্তিতে উচ্চারিত ধ্বনি গুরু। কোন্ কোন্ অক্ষর গুরু বা লঘু হইবে সংস্কৃতে তাহার বাঁধাধরা নিয়ম আছে:

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণসংযোগপূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি ॥ (ছন্দোমঞ্জরী)

—অনুস্বারযুক্ত অক্ষর, (কং, খং, গং, ঘং, ইত্যাদি), দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষর (আ, ঈ, ঊ, এ, ও, ঐ, ঔ), বিসর্গযুক্ত অক্ষর (অঃ, চঃ, শঃ ইত্যাদি), সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব অক্ষর (যেমন, অ-ঞ্জ-লি'র 'অ') এবং পাদান্ত অর্থাৎ শ্লোকের প্রত্যেক চতুর্থাংশের শেষ অক্ষর গুরু হইবে।

সংস্কৃতে অক্ষরগুলি লঘু-গুরু ভেদে সন্নিবিষ্ট হইয়া এক একটি 'গণ' সৃষ্টি করে। যেমন, 'ম' গণ = গুরু + গুরু + গুরু, (মা-য়া-বী, না-রী-ণাং); 'ন' গণ = লঘু + লঘু + লঘু (চ-ল-তি, হ-স-তি, ন-থ-লু); 'ভ' গণ = গুরু + লঘু + লঘু (সৈ-ক-ত, ব-ন্ধ-ন) ইত্যাদি। এইরূপ দশটি 'গণ' আছে। ছন্দের পাদে বা চরণে নিয়মানুসারে ইহাদের পুনরাবৃত্তি হয়; তাহার ফলে ধ্বনি-প্রবাহে তরঙ্গ উত্থিত হয়। যেমন,

| | | | || || | | | | || ||
(১) শশি বদনানাং | ব্রজতরুণীনাম্
| | | | || || | | | | || ||
বচন সুধোর্ম্মিং | মধুরিপুরৈচ্ছৎ ॥

ইহা ষড়ক্ষরা বৃত্তি; ত্রিলঘু + আদি লঘু গুরুদ্বয়শেষ—এইরূপ দুইটি 'গণ' লইয়া ইহার প্রতিটি পদ গঠিত; ছন্দের নাম 'শশিবদনা'।

| || | || | || | || | || | || | || | ||
(২) সুরদ্রুমূল মণ্ডপে বিচিত্র রত্ন নির্ম্মিতে
লসদ্বিতানভূষিতে সলীলবিভ্রমালসম্।

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি; (লঘু + গুরু + লঘু) + (গুরু + লঘু + গুরু) + লঘু + গুরু এইরূপ ৮টি অক্ষরের দুইবার আবৃত্তিতে মোট ষোল অক্ষরের পাদ সৃষ্টি হয়; ছন্দের নাম 'পঞ্চচামর'; এই ছন্দে একটি পদে যথাক্রমে (লঘু + গুরু) অক্ষর আট বার আবর্ত্তিত হয়।

শক্তিভেদে অক্ষরের বিন্যাস বাঙলা ছন্দের মুখ্য কথা নয়, কারণ বাঙলায় অক্ষরের লঘুত্ব বা গুরুত্ব সুনির্দ্দিষ্ট নয়। সাধারণ কথায়-বার্ত্তায় শব্দের আদ্য অক্ষরে যে শক্তি থাকে, অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত হইলে অক্ষরের সে শক্তি লোপ পায়। (দ্রষ্টব্য ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃঃ ৮৩)। তবে বাঙলা ছন্দে অক্ষরগত শক্তি হইতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় অন্যপ্রকারে অর্থাৎ প্রবল শ্বাসাঘাতের ফলে।

শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত

সাধারণভাবে কোন অক্ষরে যে শক্তি থাকে, প্রবল ঝোঁক দেওয়ার ফলে তাহাতে আরও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ঝোঁককে শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত

রূপে। বাঙলায় সাধারণতঃ প্রতিশব্দের আদ্য অক্ষরে এই ঝোঁক থাকে। কিন্তু অর্থানুসারে বা শ্বাসের অনুরোধে বাক্যকে যখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়, তখন বাক্যখণ্ডের প্রথম শব্দটির আদি অক্ষরেই প্রবল ঝোঁক পড়ে, তাহার ফলে, স্বতন্ত্র অবস্থায় সাধারণভাবে শব্দের আদিতে যে ঝোঁক থাকে, তাহা লোপ পায়। ইহা বাঙলা ভাষার উচ্চারণগত একটি প্রধান বিশিষ্টতা।

আদি অক্ষরে ঝোঁক দেওয়ার ফলে, অন্যান্য ধ্বনিতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে: (১) প্রথমাক্ষরে ঝোঁকের ফলে পরবর্ত্তী স্বরান্ত অক্ষর হলন্ত হইয়া যায়, যেমন, জল>/জল্, দিন>/দিন্, (২) এক শব্দে দুইয়েব অধিক অক্ষর থাকিলে, ঝোঁকের ফলে তাহা দুই অক্ষরে পরিণত হয়, যেমন, পাগলা /পাগ্‌লা, /পাগল্। এইরূপ শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যে একটি স্পন্দন-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, আহত-অনাহত অক্ষর পাশাপাশি অবস্থানের জন্যই এই তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাক্যখণ্ডের প্রথম শব্দটির আদি অক্ষরে ঝোঁক দেওয়ার ফলে বাঙলায় এক বিশিষ্ট ছন্দ-হিল্লোলের উদ্ভব হয়, যেমন,

/রাত পোহালো | /ফরসা হোলো | /ফুট্‌লো কত | /ফুল
/কাঁপিয়ে পাখা | /নীল পতাকা | /জুট্‌লো অলি | /কুল।

[**দুই**] দৈর্ঘ্য ধ্বনির আর একটি ধর্ম্ম। দৈর্ঘ্য বলিতে সেই ধ্বনিটির উচ্চারণেব কাল-পরিমাণকে বুঝায়। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'কালপ্রেরিতয়া শব্দসৃষ্টিঃ'—কাল-নিয়ন্ত্রিত হইযাই ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ ধরিয়া একটি ধ্বনি একটি বিশেষ অবস্থানে উচ্চারিত হয়, সেই সময়ের উপরেই ধ্বনিটির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। ধ্বনি-বিজ্ঞানে উচ্চারিত ধ্বনির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হয় একটি হ্রস্বস্বরের উচ্চারণকালের কাল-পরিমাণ দিয়া। ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায় অনুচ্চার্য্য—ইহার পূর্ণ ও স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না; স্বরধ্বনিই পূর্ণ ও স্পষ্ট উচ্চারিত ধ্বনি। অতএব ধ্বনির মাপ বলিতে, যে স্বরকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়, সেই স্বরের মাপকেই বুঝায়। একটি মৌলিক হ্রস্ব স্বরধ্বনির উচ্চারণের কাল-দৈর্ঘ্যই পূর্ণোচ্চারিত ধ্বনির স্বল্পতম দৈর্ঘ্য এবং ইহাই ধ্বনি মাপিবার মানদণ্ড।

ধ্বনি মাপিবার মানদণ্ড 'মাত্রা'

ধ্বনি মাপিবার এই মানদণ্ডকে বলা হয় মাত্রা (Mora); সংস্কৃতে মাত্রা শব্দটির অর্থ কাল-দৈর্ঘ্য। ইহাকে 'কলা' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। তন্ত্রে বলা হইতেছে,

কালেন যাবতা স্বীয়োহস্তঃ স্বং জানুমণ্ডলম্।
পর্য্যেতি মাত্রা সা তুল্যা স্বয়ৈক শ্বাসমাত্রয়া॥ (প্রপঞ্চসারতন্ত্র)

—নিজের জানুমণ্ডলে একবার মাত্র হাত বুলাইতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততটুকু কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে: একমাত্রা এক শ্বাস ফেলিবার কালপরিমাণ। ছন্দশাস্ত্রে মাত্রাকে বলা হয়—'অক্ষরাবয়বরূপা'। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রযাসে একটি মৌলিক স্বরাশ্রিত যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়, তাহার উচ্চারণের কাল-পরিমাণ এক মাত্রা। মাত্রাই ধ্বনি মাপিবার মান।

সাধারণতঃ আমরা বলিযা থাকি—এই অক্ষরটি এক মাত্রার, এই অক্ষরটি দুই মাত্রার। বস্তুতঃ অক্ষর মাত্রই এক মাত্রার, অক্ষর স্থিরমাত্রিক। ধর্ম্মশাস্ত্রে 'অক্ষর' কথাটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়: গুণতঃ, ধর্ম্মতঃ, অবয়বতঃ ও স্বরূপতঃ যাহার অপচয় (ক্ষরণ) নাই, তাহাই অক্ষর। অক্ষর নিরুপাধি। যে বর্ণধ্বনি অক্ষরকে আশ্রয় করে, তাহা উপাধিবিশিষ্ট—অর্থাৎ স্বর, ব্যঞ্জন—এইগুলি উপাধি-বিশিষ্ট, ইহাদের ক্ষরণ আছে, স্থিতি-স্থাপকতা আছে। যেহেতু ধ্বনি-গুচ্ছের মধ্যে স্বরধ্বনিই স্পষ্ট এবং স্বয়ংপূর্ণ—এইজন্য ধ্বনির দৈর্ঘ্য এই স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য অনুসারেই নির্ণীত হয়। মাত্রা (মাপ) প্রকৃতপক্ষে স্বরেরই মাপ। মাত্রা নির্ণয়ে প্রমাদ সৃষ্টি হয়, ধ্বনি-বর্ণের আকৃতি লইয়া। ব্রাহ্মীলিপি হইতে যে সকল লিপিমালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অক্ষরাত্মক (Syllabic), এইজন্য বর্ণের চেহারা দেখিয়া, তাহাতে কয়টি ধ্বনি আছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী 'জল' এবং বাঙলা উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী 'জল্' দুইই 'জল' লিখিয়া বুঝানো হয়: কিন্তু প্রথম রীতির উচ্চারণ অনুসারে উহাতে আছে 'জ্+অ+ল্+অ' এই চারিটি ধ্বনি, দুইটি অক্ষর; কিন্তু দ্বিতীয় রীতির উচ্চারণধর্ম্মানুসারে 'জল' শব্দটিতে আছে একটি অক্ষর, তিনটি ধ্বনি (জ্+অ+ল্); কিন্তু এই শব্দটিকে এককভাবে উচ্চারণ করিবার সময়, পরের 'অ'-কার লোপের ক্ষতি পূরণের জন্য পূর্ব্বের স্বরটি দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা হয়,—জ-অল্। অতএব 'জল্'-এর 'জ'-এর মধ্যে যে দুইটি অ-কার আছে

শব্দ-চিত্র দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বাঙলায় একক উচ্চারণে 'জল' হলন্ত অক্ষর এবং ইহার দৈর্ঘ্য দুই মাত্রা।

ইংরাজিতে স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা স্বীকার করা হয় না : স্বরাঘাত (শ্বাসাঘাত) দিয়া Syllable-এর বিচার করা হয় : সব Syllableকে এক মাপের মনে করা হয়। ইংরাজি উচ্চারণে 'Lit' এবং 'Light' একই মাপের। 'ই' উচ্চারণে যতটুকু সময় লাগে, 'আই' উচ্চারণেও ততটুকু সময় লাগে। এখানে অক্ষর ও স্বর উভয়ই স্থিরমাত্রিক,

In English···the length has nothing to do with the poetical accent (Bain)

সংস্কৃতে অক্ষরের লঘু-গুরুভেদ তো আছেই, উপরন্তু ইহাতে আছে হ্রস্ব-দীর্ঘের বিচার। ধ্বনির দৈর্ঘ্য বা কাল-পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রা এখানে নির্দ্দিষ্ট। উচ্চারণের কাল-পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংস্কৃতে স্বরধ্বনির হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিনটি ভাগ করা হইযাছে : একটি হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগে (অর্থাৎ উচ্চারণের কালপরিমাণ ডবল হয়) এবং প্লুত স্বরের উচ্চারণে হ্রস্বের তিনগুণ সময় লাগে। অতএব হ্রস্বস্বর একমাত্রিক, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক এবং প্লুতস্বর তিন মাত্রিক :

একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেযো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥

—অর্থাৎ অ, ই, উ, ঋ হ্রস্ব এবং এক মাত্রা, আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ, —দীর্ঘ এবং দুই মাত্রা। দীর্ঘ অর্থ হ্রস্বের দ্বিরাবৃত্তি বা সংযোগ, যেমন, আ= অ+অ, ঈ=ই+ই, ঊ=উ+উ। সংস্কৃতে হ্রস্ব স্বর কথনও দীর্ঘ হয় না, দীর্ঘও কথনও হ্রস্ব হয় না : কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘ নির্ব্বিশেষে সকল স্বরই আহ্বানে, রোদনে, বা গানে প্লুত (তিন মাত্রা) হইতে পারে : যেমন,

কি (=ক্+ই)—হ্রস্ব। কী [=ক্+ঈ (=ই+ই)]—দীর্ঘ।
কি-ই-ই বা কী-ঈ-ঈ —প্লুত

সংস্কৃতে লঘু ও গুরু অক্ষরেরও মাত্রা ভেদ আছে। 'হ্রস্বং লঘু। সংযোগে গুরু। দীর্ঘঞ্চ।'—লঘু হ্রস্ব, গুরু দীর্ঘ। কোন্ কোন্ অক্ষর গুরু হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট। অতএব সংস্কৃতে ধ্বনির দৈর্ঘ্য-নির্ণয়ে অর্থাৎ স্বরের মাত্রা-নির্ণয়ে কোন গোলযোগ নাই, সব নিয়মে বাঁধা।

কিন্তু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়, এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বর যেন তাহাদের নির্দিষ্ট মাত্রা হারাইয়া ইচ্ছামত দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইতেছে। তাই পিঙ্গল বলিতেছেন,

দীহো বিঅ বণ্ণো লহু জীহা পঢ়ই হোই সে বি লহু।
বণ্ণো বি তুরিঅ পঢ়িও দোত্তিণ্ণে একং জাণেই॥

—লঘুভাবে পাঠ করিলে দীর্ঘ বর্ণও লঘু হইয়া যায় অর্থাৎ দীর্ঘ তাহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। দ্রুত পঠনে—দুই বা তিন বর্ণও এক বর্ণের সামিল হয়।

হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে মাত্রাগত শিথিলতা, বাঙলা ভাষাতেই বেশি। মনে হয়, হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীকরণ এবং দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বীকরণ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতে চলিয়া আসিতে আসিতে, বাঙলায় হ্রস্ব-দীর্ঘত্বের বন্ধন একেবারেই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তাই বাঙলায় স্বরের দৈর্ঘ্য বাঁধাধরা নয়। স্বরের উচ্চারণে মুখবিবর বিবৃত (open) থাকে, এই জন্য অতি সহজে ইহার দৈর্ঘ্যের তথা মাত্রার সঙ্কুচন ও প্রসারণ সম্ভব। প্রয়োজনানুসারে স্থলবিশেষে একই স্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ বা প্লুত হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে। যেমন,

"অ্যাঁ" স্বরের সাধারণ উচ্চারণ হ্রস্বঃ 'গোটা দুই ছাগল **ম্যাঁ-ম্যাঁ** করিয়া ডাকিয়া উঠিল।' কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করিতে 'অ্যাঁ' দীর্ঘ হয়—'**অ্যাঁ**, বলো কি দাদা!' (অ্যাঁ = অ্যাঁ –)। আবার কান্নার সুরে 'অ্যাঁ' আরও দীর্ঘ, অর্থাৎ প্লুত উচ্চারণ হয়,

দাদা বলে গাধা তুই লিখবি পড়বি না?
অমনি আমি কেঁদে বলি, **অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ**॥

মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের উচ্চারণে স্বর এক মাত্রার হইয়াই উচ্চারিত হয় প্রয়োজনবিশেষে দীর্ঘও হয়, যেমন, '**হী হী** শবদে অটবী পুরিছে' বা '**আসিল** যত **বীরবৃন্দ**'—এখানে 'হী', 'আ', 'বী', দীর্ঘ ও দুই মাত্রার। যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর এবং হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণ সম্পর্কেও এই একই নিয়ম। ইহাও কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ,—'**কৈলাস** শিখর অতি মনোহর' কিংবা 'বড় **বৌ** লো, রান্না চড়া'—এখানে 'কৈ', 'বৌ'-হ্রস্ব এবং একমাত্রার, কিন্তু—'দারোয়ান গায় গান শোন **ঐ** রামা **হৈ**', কিংবা 'একি **কৌতুক** করিছ নিত্য ওগো **কৌতুকময়ী**'—এখানে ঐ, হৈ, কৌ—যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের স্বরগুলি দীর্ঘ ও দুই মাত্রার। 'হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী'—এখানে

'পাত্র'এর 'পাত্‌', 'সুন্দরী'র 'সুন্‌' প্রভৃতি হলন্ত অক্ষর এবং 'দ্রৌপদী'র 'দ্রৌ' যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর—সব একমাত্রার এবং 'বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার'—এখানেও 'য়ের্‌', 'ফুল্‌', 'টার্‌', 'লুদ্‌' প্রভৃতি একমাত্রার, কিন্তু 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'—এখানে 'তের', 'মান' প্রভৃতি হলন্ত অক্ষরগুলির স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ ও দুই মাত্রার।

তবে উচ্চারণ সম্পর্কে বাঙালী যে একেবারে মাত্রাজ্ঞানহীন তাহা বলা চলে না। বাঙলা উচ্চারণেও স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা সম্পর্কে দুই একটি নিয়ম প্রচলিত আছে :

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা দীর্ঘতা সম্বন্ধে বাঙলা উচ্চারণে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সমগ্র শব্দটির দৈর্ঘ্যের সহিত তদন্তর্গত স্বরধ্বনির দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বিজড়িত। Monosyllabic অর্থাৎ একাক্ষর পদ, সাধারণতঃ বাঙলায় দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় : দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র), দিন (=দিউন, আপনি দান করুন), দীন (মুসলমান ধর্ম্ম)—এই চারিটি একাক্ষর শব্দের উচ্চারণ এক প্রকারের—একক অবস্থিত বা উচ্চারিত হইলে, চারিটিই দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় ; কিন্তু একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে আসিলে, এই শব্দের ই-ধ্বনি দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব হইয়া দাঁড়ায় ; যথা দিন-কাল ; দীন-দুঃখী ; বইটি আমায় দিন্‌তো ; দীন-দুনিয়ার মালিক। তদ্রূপ 'এক' [অ্যা-ক্‌]—একাক্ষর এই শব্দে বাঁকা এ-কার দীর্ঘ ; কিন্তু 'একা,' 'একটা' প্রভৃতি একাধিক অক্ষরের পদে এ-কার হ্রস্ব ; 'জল'—এখানে অ-কার দীর্ঘ ; কিন্তু 'জলা, জলটুকু'—এখানে অ-কার হ্রস্ব। বাঙলা ছন্দে এইজন্য স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য বাঁধাধরা নহে, একই স্বরধ্বনি অবস্থান-গতিকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। সংস্কৃতে 'আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ' সর্ব্বদা দীর্ঘ ; বাঙলায় এগুলি হ্রস্বও হয়, দীর্ঘও হয়, তদ্রূপ সংস্কৃতে 'অ, ই, উ, ঋ' সদা হ্রস্ব, কিন্তু বাঙলায় এগুলি দীর্ঘও হয়।

=সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি=

এখানে 'সমরে' শব্দের এ-কার, 'চূড়া' শব্দের উ-কার ও আ-কার—সবগুলিই হ্রস্ব ; সংস্কৃতে এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না—ইহাদিগকে টানিয়া দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইত। আবার 'সম্মুখ' শব্দটিকে তিন

অক্ষরের [সম্-মু-খ] করিয়া না পড়িয়া, দুই অক্ষরের [সম্-মুখ্] করিয়া পড়িলে, 'মু'এর উ-ধ্বনি খ-এর অ-কারের লোপকে পূরণ করিবার জন্য, দীর্ঘ হইয়া উচ্চারিত হয়। আবশ্যকমত পরবর্ত্তী অক্ষরের লোপকে পূরণ করিয়া লইবার জন্য, পূর্ব্ব অক্ষরের দীর্ঘীকরণ ঘটে; ঐ অক্ষরের স্বরধ্বনি দীর্ঘ হইয়া যায় এবং একাক্ষর শব্দ স্বতন্ত্র অবস্থিত হইলে দীর্ঘস্বরযুক্ত হইয়া থাকে।[১]

মাত্রা স্থিরীকরণ সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় মোটামুটি এই নিয়মই অনুসরণ করা হয়।

ধ্বনির দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মাত্রা দ্বারাই বাঙলা ছন্দের বিচার হয়। মাত্রাসমকত্বই এই ছন্দে সামঞ্জস্য ও ঐক্যের সুষমা বিস্তার করে। তবে কোথায় কত মাত্রা হইবে, তাহা কান দিয়া স্থির করিতে হয়। কোন কোন ছন্দে মাত্রার ঘন ঘন দীর্ঘীকরণের ফলে চমৎকার ধ্বনি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, যেমন,

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
নন্দ-নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥

[**তিন**] ধ্বনির আর একটি বিশিষ্টতা ইহার সুর। শ্বাসবায়ু বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠতন্ত্রীতে একপ্রকার কম্পন জাগে; কণ্ঠনালীতে বেশি বায়ু জমা হইলে এই কম্পন উচ্চ বা ঘোষগ্রামে উচ্চারিত হয়। কম্পন যত দ্রুত হয়, সুরও তত তীব্র ও উচ্চ হইয়া উঠে, কম্পন ধীর হইলে সুরের তীব্রতা কমিয়া যায়। স্বরের এই উন্নয়ন-অবনমনকে বাক্যের সুর (Pitch বা musical accent) বলে।

কণ্ঠস্বরের উন্নয়ন-অবনমন-জনিত সুরের খেলা বৈদিক ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। স্বরের তীব্রতা ও মৃদুতা অনুসারে ইহা তিন প্রকারের হইত: উদাত্ত (উচ্চ), স্বরিত (মধ্যম), অনুদাত্ত (নিম্ন)। বাঙলা উচ্চারণের প্রধান বিশেষত্ব সুর নয়, ঝোঁক—এই জন্য কোন বিশেষ শব্দের উচ্চারণে ইহাতে সুর ওঠে না: 'ঝোঁকের বদলে সুর দিয়া যদি বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করা যায়,

১ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তাহা হইলে তাহা বড়ই হাস্যকর লাগিবে।' তবে দুই-একটি অব্যয়-শব্দে সুর যোগ করিয়া ধ্বনির উন্নয়ন ও অবনমন দেখানো সম্ভব ; যথা,

* ´হাঁ *—উচ্চ হইতে উন্নীষমান = প্রশ্নে

* ‾হাঁ *– উচ্চ সমরেখ সুর = স্বীকারে

* হাঁ (* হাঁ—:)* –আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ = অনাদরে।[১]

সাধারণতঃ স্বতন্ত্র শব্দে সুর না আসিলেও, সমগ্র বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা ছন্দে সুরের প্রয়োগ দেখা যায়। সুর গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; আর প্রাচীন বাঙলা কাব্যের অধিকাংশই ছিল গান। এইজন্য প্রাচীন বাঙলা ছন্দে সুরের সমাবেশ হইত। এখনও কথকঠাকুরদের কথকতায় সুরের অনুরণন শ্রুতিগোচর হয। সুরের টানে একদিকে যেমন ছন্দের মধ্যে ধ্বনির অল্পতা বা বাহুল্য দোষ কাটিযা যায়, তেমনই আবার ছন্দে গাম্ভীর্য্যও সৃষ্টি হয়। বাঙলা ছন্দের তান-প্রধান, ধ্বনি-প্রধান ছন্দের নামগুলি সুরের নিম্ন ও মধ্যম গতিভঙ্গি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য বলেন :

> দীর্ঘপর্ব্বের ছন্দে গম্ভীর সুরের, হ্রস্বপর্ব্বের ছন্দে তীব্র সুরের এবং মধ্যপর্ব্বের ছন্দে মধ্যম সুরের আগম স্বাভাবিক। (ছন্দোবিজ্ঞান)

[চার] জাতি ধর্ম্ম (Tone colour) ধ্বনির আর একটি বিশেষত্ব। এই ধর্ম্মদ্বারা কোন্ ধ্বনি কোন্ জাতের তাহা বুঝা যায়। পক্ষীর কূজন, হস্তীর বৃংহণ, অশ্বের হ্রেষা, মেঘের গর্জ্জন—এক এক জাতীয় ধ্বনি। মনুষ্যের কণ্ঠোদ্গীর্ণ ধ্বনি ভিন্নজাতের। মনুষ্যেব কণ্ঠধ্বনিতেও যে দ্রুততা ও ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও মৃদুতা, মাধুর্য্য ও কার্কশ্য থাকে, তাহা ধ্বনির এই জাতিধর্ম্মদ্বারাই অনুমেয়। স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে ধ্বনির দুইটি প্রধান শ্রেণী। উচ্চারণ-স্থান, নিঃশ্বাসের গতি, উচ্চারণের প্রণালী অনুসারে ইহারাও আবার নানা জাতিতে বিভক্ত। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে কণ্ঠ্য (ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, অ), তালব্য (চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, ই), মূর্দ্ধন্য (ট্, ঠ্, ড্, ঢ, ণ্, ঋ), দন্ত্য (ত, থ্, দ্, ধ্, ন্) এবং ওষ্ঠ্য (প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্, উ্) প্রভৃতি ধ্বনির উদ্ভব হয়। ইহা ছাড়াও আরও নানা জাতীয় ধ্বনি আছে, যেমন, উষ্মধ্বনি (শ্, ষ্, স্, হ্), নাসিক্যধ্বনি (ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্), অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ক্, চ্, ট্, ত্, প্ ; গ্, জ্, ড্, দ্, ব্), মহাপ্রাণ ধ্বনি (খ্, ছ্, ঠ্, থ্, ফ্ ;

১ ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্), কম্পনজাত ধ্বনি (র্), পার্শ্বিক ধ্বনি (ল্), কাকুধ্বনি (শীৎকার), চুমকুড়ি ধ্বনি ইত্যাদি।

ব্যষ্টিগত ভাবে ইহা শব্দমধ্যে ঝঙ্কার সৃষ্টি করে। সামগ্রিকভাবে ছন্দপ্রবাহে ঝঙ্কার সৃষ্টিতেও ধ্বনির জাতিধর্ম্মের দান কম নয়। সজাতীয় ধ্বনিদ্বারা ছন্দে চরণান্তিক মিল সৃষ্টি করা হইয়া থাকে;

ছন্দের মিল

যেমন, ইংরাজিতে: Over the world under the **tree**,
Nobody knows what things I **see**.

বাঙলায়: পান্নার অঙ্গুলি দিতে দিতে **আয় গো**
হরি-চরণ-চ্যুতা গঙ্গার **প্রায় গো**

স্বজাতীয় ধ্বনির পুনঃপুনঃ আবির্ভাবে, ছন্দে অনুপ্রাস-জনিত ঝঙ্কার সৃষ্টি হয়। যেমন,

ইংরাজিতে: The fair **b**reeze **b**lew
The white **f**oam **f**low
The **f**urrow **f**ollowed **f**ree.

সংস্কৃতে: পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥

বাঙলা ছন্দে নানাদিক হইতে সমজাতীয় ধ্বনি-প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। যেমন,—

(১) মশ্‌গুল বুলবুল বনফুল গন্ধে
বিল্‌কুল অলিকুল গুঞ্জরে ছন্দে } পদান্তিক ও চরণান্তিক মিল।

(২) রজনী গন্ধা বাস বিলালো
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো } প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে বর্ণগত মিল।

(৩) চন্দ্র চূড় জটা জালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী।
[এক জাতীয় তালব্যধ্বনি চ, ছ, জ-এর মিল]

(৪) একি এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার
অসীম আকাশ প্রায় নীল জল রাশি;
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

[প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে চরণান্তিক মিল। ইহাকে পর্য্যায় সম মিল বলে]

(৫) বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে
লো ভাষা পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে।

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে চরণান্তিক মিল; ইহাকে মধ্যসম মিল বলে।]

যে ছন্দে চরণান্তিক মিল থাকে না, সেখানে মিলের অভাব সমজাতীয় ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দ্বারা পূরণ করা হয়। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে এইরূপ ধ্বনি-সামঞ্জস্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়,—যথা,

(১) সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।

(২) দুর্দ্দান্ত দানবে দলি নিস্তারিলা তুমি
দেবদলে নিস্তারিণি; নিস্তার অধীনে
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে।

ছেদ ও যতি

ছেদ—একটি বাক্যের সমগ্র অংশকে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা অসম্ভব; ফুসফুসকে বিশ্রাম দিবার জন্য বাক্যমধ্যে কোথায়ও কোথায়ও থামিতে হয়। অবশ্য যেখানে-সেখানে থামিলে চলে না, যেখানে বাক্যাংশে একটি অর্থ পরিস্ফুট হয়, সেইখানেই বিরাম নিতে হয়। এইরূপ বিরামকে বাঙলায় ছেদ, ইংরাজিতে Breath pause বা Sense pause বলে। বাক্যের শেষে এই ছেদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়—এই জন্য ইহাকে 'পূর্ণছেদ' বলে; বাক্যের মধ্যে অর্থবাচক পদসমষ্টির পর যে সামান্য বিরতি দেওয়া হয়, তাহাকে 'উপচ্ছেদ' বলে। বাঙলায় পূর্ব্বে বাক্যমধ্যস্থ ছেদকে বুঝাইবার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হইত না, ইংরাজির অনুকরণে বর্ত্তমানে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে। প্রাচীন বাঙলা কবিতায় পূর্ণবিরতি বুঝাইবার জন্য এক দাঁড়ি (।) এবং দুই দাঁড়ি (॥) ব্যবহার করা হইত।

গদ্যে কিম্বা পদ্যে সর্ব্বত্রই বাক্যমধ্যে অর্থ অনুসারে বা শ্বাসের অনুরোধে এইরূপ ছোট ছোট ছেদ পড়ে; যথা—

(১) ভগবান! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের তো তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি; কিন্তু এতবড় একটা মহাপ্রাণ তুমি আজ পর্য্যন্ত কয়টা দিতে পারিলে? (শরৎচন্দ্র)

(২) কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়-ধন লয় কেহ হরি। (মাইকেল)

(৩) তুহিন, তুষার রাশি!
বাজ-বিদ্যুৎ!—তারি মাঝে প্রাণ উঠিযাছে উল্লসি'!
'নাদির! নাদির!'—আর কাজ নাই; বুঝিয়াছি কারে বলে--
মাটিতে এ মাথা রাখিবার আগে দ'লে নেওয়া পা'র তলে।
(মোহিতলাল)

যতি— কিন্তু অর্থ বা শ্বাসের বিরতি ছাড়াও কবিতায় আর এক প্রকার বিরতি দেখা যায়। কবিতার সৌন্দর্য্য প্রত্যুত এই বিরতির উপরেই নির্ভর করে। ছন্দশাস্ত্রে এই বিরতিকে বলা হয় 'যতি'। ইংরাজিতে 'যতি'কে বলা হয় Cæsura :

The measures of poetry are gathered together in groups, each group being cut off from that following it by a pause or cæsura. (Bain)

ইংরাজিতে একটি verse বা metrical line-এর শেষে পূর্ণ যতি থাকে এবং সেখানে মিল পড়ে; কিন্তু Blank Verse-এ এই পূর্ণ যতি (final pause) চরণের মধ্যেও পড়িতে পারে। ইংরাজি ছন্দে একটি verse line-এর মধ্যে যে বিরতি পড়ে, তাহাকেই বলে 'cæsura proper': সাধারণতঃ দুই বা তিন বা চার foot-এর পর এই যতি পড়িয়া থাকে, যেমন,

Eternal sunshine | of the spotless mind,
Each prayer accepted | and each wish resigned.

ইংরাজিতে এই যতি কখনও একটি শব্দের মধ্যে পড়ে না, সর্ব্বদাই শব্দের শেষে, দুই বা ততোধিক foot-এর পরে পড়ে।

সংস্কৃত ছন্দেও যতির কথা আছে :

যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রাম স্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥ (ছন্দোমঞ্জরী)

—জিহ্বা যে স্থলে স্বেচ্ছায় বিরাম গ্রহণ করে, সেই স্থানকে কবিগণ 'যতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; প্রয়োগকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে উক্ত যতিকে বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করা হয়।

এখানে 'যতির' একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে; শ্বাস বা অর্থের অনুরোধে নয়, জিহ্বার অনুরোধে যে বিরতি, তাহাই যতি। অর্থানুসারী হইয়া যে বিরাম ব্যবহৃত হয়, তাহা শ্বাস-যতি বা অর্থ যতি, ফুসফুসকে বিরাম দিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'যতি' জিহ্বার বিশ্রামস্থান। ধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুস যেমন ক্রিয়াশীল, বাগ্‌যন্ত্রস্থ জিহ্বাও তেমনই ক্রিয়াশীল থাকে; অতএব এক ঝোঁকে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণের পর ফুসফুসের যেমন বিশ্রাম প্রয়োজন, জিহ্বারও তেমন বিশ্রাম প্রয়োজন। গদ্যে কথা বলিবার সময় ফুসফুস ও জিহ্বা এক সঙ্গেই বিশ্রাম গ্রহণ করে, কিন্তু কবিতায় দুয়ের বিশ্রামস্থান এক কিম্বা পৃথক হইতে পারে। পৃথক হইলে কবিতায় আরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কবিতার ছন্দ-হিল্লোল, 'ছেদ' নয়, 'যতি'র উপরেই নির্ভর করে। যতির দ্রুত কিংবা মধ্যম অথবা বিলম্বিত সন্নিবেশহেতু কবিতার চরণে এক এক প্রকার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ছেদ ও যতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ছেদে ধ্বনির প্রবাহ অল্প সময়ের জন্য হইলেও একেবারে থামিয়া যায়, কারণ তখন শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকে; কিন্তু যতি-স্থানে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া চলিতেই থাকে অর্থাৎ ধ্বনির প্রবাহ ক্ষণমাত্রের জন্যও স্তব্ধ হয় না, অথচ তাহারই মধ্যে জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত উদাহরণে '*' দ্বারা ছেদ এবং '।' দ্বারা যতির অবস্থান দেখানো হইল:

ছেদ ও যতি

(১) ধনঞ্জয়* আনন্দাশ্রু। কর বরিষণ*।
তোমার* আমার* আজি। ভগ্নী সুভদ্রার।
সার্থক জীবন*॥ (নবীনচন্দ্র সেন)

(২) নাশ* মহেষ্বাস* তারে*। ভুলিব এ জ্বালা*।
এ বিষম জ্বালা* দেব*। ভুলিব সত্বরে*।
জন্মে মৃত্যু* বিধাতার। এ বিধি জগতে*।

যতি দুই প্রকার—পূর্ণযতি ও মধ্যযতি। একটি ধ্বনিপ্রবাহ যেখানে ভাবের দিক হইতে পূর্ণ বিরতি লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জিহ্বাও

বিশ্রাম গ্রহণ করে, সেইখানে পূর্ণ যতির অবস্থান। এই যতিস্থলে শ্বাসযন্ত্র ও জিহ্বা উভয়ই বিশ্রাম লাভ করিবার সুযোগ পায়। সাধারণতঃ কবিতার একটি চরণের শেষে পূর্ণযতি পড়ে। দুই একটি বিশেষ ছন্দে—ইংরাজির 'Non-stopt', 'Run on' বা 'Blank verse' কিংবা বাঙলার অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে : কিন্তু অন্যান্য ছন্দে একটি Verse line-এর শেষে 'ছেদ ও যতি' একস্থলে পড়ে। ইহাই পূর্ণ যতি বা final pause.

কিন্তু একটি ছন্দ-পংক্তিতে প্রথম * হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণযতি পর্যন্ত আরও এক বা একাধিক যতি থাকে। এই যতিদ্বারা ছন্দ-পংক্তিটি কয়েকটি সমান মাপের অংশে বিভক্ত হয়। এই 'যতি'কে বলা হয় মধ্য যতি বা Middle pause। এই মধ্যযতিই ছন্দ-পংক্তিতে গতি ও বিরতি-জনিত স্পন্দন সৃষ্টি করে। ইহা যে-কোন ছন্দের স্পন্দন-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, অর্থযতি বা শ্বাসযতির আধারেই এই মধ্যযতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা সত্য নয়। প্রাচীন বাঙলা ছন্দে ছেদস্থলেই যতি পড়িত, ইংরাজি ছন্দেও অনেকক্ষেত্রে ছেদস্থলেই যতি পড়ে, কিন্তু অনেক কবিতা সম্পর্কেই এ মত খাটে না। বাঙলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, অনেক স্থলে এমন স্থানে মধ্যযতি পড়ে, যেখানে অর্থের দিক হইতে কোন ছেদ নাই —দুই মধ্যযতির মধ্যে অবস্থিত শব্দসমষ্টি, শব্দ বা শব্দাংশ অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়। নিম্নে '।' চিহ্নদ্বারা মধ্যযতি এবং '॥' চিহ্নদ্বারা পূর্ণযতির অবস্থান নির্দেশ করিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) মহাভারতের কথা | অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান ॥

(২) কবে পড়িবে বেলা | ফুরাবে সব খেলা |
নিবাবে সব জ্বালা | শীতল জল ॥

(৩) তোহে জনমি পুন | তোহে সমাওত |
সাগর লহরী স | মানা ॥

(৪) ঘরেতে দু | রন্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি

[তৃতীয় ও চতুর্থ উদাহরণে অসম্পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পদাংশের পর মধ্যযতি পড়িয়াছে। এখানে ছেদ ও যতি অভিন্ন নয়।]

আমরা পূর্বে বলিয়াছি স্পন্দনই ছন্দের প্রাণ। নানা ভাবে স্পন্দন সৃষ্টি করিয়া ধ্বনি প্রবাহকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলাই ছন্দ রচনার লক্ষ্য। ধ্বনির

বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে শব্দ-মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। আহত ধ্বনির পাশে অনাহত ধ্বনি থাকিলে, গম্ভীর ধ্বনির পাশে মৃদুধ্বনি থাকিলে স্বাভাবিক ভাবেই দোলা সৃষ্টি হইয়া থাকে। ছন্দ পংক্তিতে এই স্পন্দন সৃষ্টি হয় পরিমিত কালের অন্তরে মধ্যযতির অবস্থানের ফলে। যতি ও গতির সমাবেশে অত্যাশ্চর্য্য ছন্দ দোলা জাগে। যতিরও আবার নিজস্ব একটি গতি আছে: কখনও এই গতি অতি দ্রুত, কখনও মধ্যম, কখনও বা বিলম্বিত। যতির গতির এই নির্দ্দিষ্ট কাল-পরিমাণকে বলা হয় 'লয়'। কথাটি একটু অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে; 'যতি' তো নিজে স্থির, ইহা এক প্রকার বিরতি—যতিব আবার গতি কি? চঞ্চল স্রোতে জড় উপলখণ্ড ফেলিয়া দিলে, তাহা যেমন গতিশীল হইয়া উঠে, তেমনই ধ্বনি-প্রবাহে বিধৃত হইয়া যতিও গতিত্ব প্রাপ্ত হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে 'লয়' কথাটিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কোথায়ও 'লয়' অর্থ নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির পরস্পর সঙ্গতি, কোথায়ও 'লয' অর্থ তালের নির্দ্দিষ্ট কাল-পরিমাণ। অমর কোষের টীকাকার আচার্য্য ভরত বলেন, 'গীতবাদ্য পাদন্যাসানাং ক্রিযা কালয়োঃ পরস্পর সমতাং লয়ঃ'।[১] এই স্বর এই পরিমাণ কালে উচ্চারিত হইবে, ইহা এতক্ষণ বিলম্বিত হইবে, ইহা এইরূপ দ্রুত হইবে উচ্চারণের কালগত পরিমাণের এই সমতাই 'লয়'। একটি ছন্দ-পংক্তিতে নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধ্বনিগুচ্ছ, এক যতি হইতে অন্য যতি পর্য্যন্ত, নির্দ্ধারিত কালানন্তর পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়। পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ধ্বনির উচ্চারণের এই যে গতি বা তাহার নির্দ্দিষ্ট কালপরিমাণ তাহাই 'লয়'। অথবা বলা যায়, এক যতি হইতে অন্য যতি পর্য্যন্ত ধ্বনির উচ্চারণের গতিই 'লয'। কতখানি কালানন্তরে একটি বিশিষ্ট ছন্দপংক্তিতে যতি অবস্থান করিবে, তাহার হিসাব দিয়াই লয়ের প্রকৃতি নিরূপণ করা হয়।

যতি ও লয়

লয় তিন প্রকার—দ্রুত, মধ্যম ও বিলম্বিত। লয যেখানে দ্রুত, সেখানে দুই যতির মধ্যবর্ত্তী ধ্বনিগুচ্ছ দ্রুত গতিতে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ যতি স্বল্প কালানন্তরে পুনরাবর্ত্তিত হয়,

রাত পোহাল | ফরসা হোল | ফুট্‌ল কতো | ফুল

—এখানে যতি অতি দ্রুত অর্থাৎ চার মাত্রার পরে পরে পড়িয়াছে। অতএব ইহার লয় দ্রুত।

১ দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুম, 'লয়' শব্দ

যেখানে যতি পাঁচ, ছয় অথবা সাত মাত্রার পরে পরে পুনরাবর্ত্তন করে, সেখানে লয় মধ্যম। মধ্যম লয়ের ছন্দে পদমধ্যস্থ কোন কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। এ জন্য লয় অতি দ্রুত হইতে পারে না :

আলোর নাচ | নাচায় চাঁদ | সাগর জলে | যবে

—এখানে যতির অবস্থান পাঁচ মাত্রাব পরে পরে—ইহা মধ্যম লয়ের ছন্দ।

যেখানে যতি আরও বিলম্বিত হয়, অর্থাৎ উহা আট বা দশ মাত্রার পরে অবস্থিত হয়, সেখানে লয় ধীর অর্থাৎ বিলম্বিত ; যেমন,—

এবার আসোনি তুমি | বসন্তের আবেশ হিল্লোলে | পুষ্পদল চুমি'

—এখানে যতি আট, দশ ও ছয় মাত্রার পবে পরে অবস্থিত। লয় বিলম্বিত।

যতির দ্রুত, মধ্যম বা বিলম্বিত অবস্থানের ফলে অর্থাৎ লয়ের তারতম্যে ধ্বনি-প্রবাহ যেমন বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, ভাবও তেমনই বিচিত্র রূপ ধারণ করে। ভুজঙ্গগতির মত দ্রুত লয়েব ছন্দে একটি চপল চটুল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় : হংসগতিবৎ মধ্যলয়ের ছন্দে ভাব যেন উচ্ছল রূপ ধারণ কবে : আবার গজেন্দ্র-গতিবৎ বিলম্বিত লয়ের ছন্দে একটা ভাব-গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি হয়। Blair বলেন,

> When the pause falls earliest, the briskest melody is thereby formed and the most spirited air given to the line. When the pause falls after the fifth syllable, the melody is sensibly altered. The verse becomes more smooth, gentle and flowing. When the pause proceeds to the sixth syllable, the tenor of the music becomes more solemn and grave.

বাঙলা ছন্দ হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পাবে :—

(১) আয় আয় সই | জল আনিগে | জল আনিগে | চল্ ॥

(২) আমার ছুটি | তোমারি ঐ | চপল চোখে | নাচে ॥
তোমার ছুটির | মাঝখানেতেই | আমার ছুটি | আছে ॥

(৩) আকাশ জুড়ে | মেঘ করেছে | সূয্যি গেছে | পাটে।
খুকু গেছে | জল আনতে | পদ্ম দীঘির | ঘাটে ॥
পদ্ম দীঘির | কালো জলে | হরেক বকম | ফুল।
হেঁটোর নীচে | দুলছে খুকুর | গোছা ভরা | চুল ॥

[এখানে চার মাত্রার পর পর যতি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায়, ছন্দের গতি যেন সর্পগতিবৎ। ভাবও লঘু-তরল ও চপল]

(৪) গভীর থির নীরে | ভাসিয়া যাই ধীরে |
পিক কুহরে তীরে | অমিয়া মাখা ॥
পথে আসিতে ফিরে | আঁধার তরুশিরে |
সহসা দেখি চাঁদ | আকাশে আঁকা ॥

[এখানে যতির সমাবেশ হইয়াছে সাত মাত্রার পরে পরে: উচ্চারণের গতি মধ্যম, যেন অনেকটা রাজহাঁসের গতির মত: ভাবও ধীর, শান্ত অর্থাৎ অচপল]

(৫) শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি ||
ব্যাকুল করেছে তাধে | মনে তার দিয়াছে সঞ্চারি ||
আকার-প্রকারহীন | তৃপ্তিহীন এক মহা আশা ||
প্রমাণের অগোচর | প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা ||

[এখানে অষ্টম ও অষ্টাদশ অক্ষরের পর যতি সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, উচ্চারণের গতি স্বভাবতই বিলম্বিত: ভাবের পরিমণ্ডলটিও গম্ভীর, প্রশান্ত]

পর্ব্ব

একটি ছন্দ-পংক্তির ধ্বনি-প্রবাহ যতি দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় একাধিক অংশে বিভক্ত হয়। এই যতি-খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পর্ব্ব বলা হয়। **প্রকৃতপক্ষে এক যতি হইতে অন্য যতি পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট শব্দ সমষ্টিই 'পর্ব্ব'**। কবিতা পাঠকালে বাগ্‌যন্ত্রের এক ঝোঁকে যতগুলি শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা লইয়াই পর্ব্ব গড়িয়া উঠে।

যেহেতু একটি ছন্দ-পংক্তিতে যতিগুলি সমান কালানন্তরে পুনরাবর্ত্তিত হয়, এই জন্য যতিমধ্যস্থ ধ্বনিগুচ্ছের দৈর্ঘ্যও সমান সমান হয়, অর্থাৎ একটি ছন্দে পর্ব্ব-দৈর্ঘ্য সমান মাপের হয়। একই মাপের ধ্বনিসমষ্টি বার বার উচ্চারিত হওয়ায় ছন্দে যেমন সামঞ্জস্য ও ঐক্যের সুষমা উপলব্ধ হয়, তেমনই আবার গতি ও যতির সমাবেশে অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তাহাতে ছন্দ-স্পন্দন সৃষ্টি হয়। বাঙলা ছন্দ গঠনে পর্ব্ব একটি প্রধান উপকরণ। একটি পর্ব্বান্তর্গত ধ্বনির মাত্রাসংখ্যা হইতে ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব। পর্ব্বের পরিচয়েই ছন্দের পরিচয়। সমান মাপের পর্ব্ব দ্বারা এক একটি বিশেষ ছন্দ গঠিত হয়।

বাঙলা ছন্দে যতির অবস্থান দ্বারাই পর্ব্ববিভাগ সম্পন্ন হয়ঃ দুই যতির মধ্যে অবস্থিত অংশই পর্ব্ব। উপরের উদাহরণগুলি হইতে দুই যতির অন্তর্গত শব্দ-সমষ্টিদ্বারা অতি সহজেই পর্ব্ব চিনিয়া লওয়া সম্ভব। আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে কোন্ পর্ব্বে কতগুলি দৃশ্যমান অক্ষর ও শ্রুতিগ্রাহ্য মাত্রা আছে তাহার সংখ্যাও দেওয়া হইতেছেঃ

(১) কৃষ্ণলীলা ভাগবতে। কহে বেদব্যাস॥
চৈতন্য লীলায় ব্যাস। বৃন্দাবন দাস।

—এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিযা পর্ব্ব। প্রথম পংক্তিতে দুই পর্ব্বে যথাক্রমে ৮ ও ৫ অক্ষর এবং দ্বিতীয় চরণে ৬ ও ৪ অক্ষর আছে। প্রতি পংক্তির মোট মাত্রা সংখ্যা ৮ + ৬ = ১৪।

(২) ইথে যদি | সুন্দরী | তেজবি | গেহ |
প্রেমক | লাগি | উপেখবি | দেহ॥

—এখানে প্রতি চরণে চারিটি করিযা পর্ব্ব। প্রথম চরণের পর্ব্বগুলিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর সংখ্যা যথাক্রমে ৪ + ৩ + ৩ + ২, দ্বিতীয় চরণে ৩ + ২ + ৪ + ২। প্রতিটি পর্ব্বের মাত্রা সংখ্যা ৪, এক এক চরণের মোট মাত্রা সংখ্যা ১৬।

(৩) রাখাল ছেলে | রাখাল ছেলে | বারেক ফিরে | চাও,
বাঁকা গাঁযের | পথটি চেয়ে | কোথায় চলে | যাও |

—এখানে প্রতি চরণে চারিটি করিযা পর্ব্ব। শেষের পর্ব্বটি বাদে, প্রতি পর্ব্বের অক্ষর সংখ্যা ৪, মাত্রা সংখ্যাও ৪, শেষ পর্ব্বে একটি যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর, মাত্রা সংখ্যা ২। প্রতি চরণের মোট মাত্রা সংখ্যা ১৪।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, এক একটি পর্ব্ব কয়েকটি শব্দ অথবা কয়েকটি অক্ষরের সমবায়েই গড়িয়া উঠে। কিন্তু পর্ব্বগুলির দৈর্ঘ্য এই দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষরের মাত্রাসংখ্যার উপর। পংক্তিতে পংক্তিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর সংখ্যা অসমান হইলেও, মাত্রাসংখ্যা সমান। বাঙলা ছন্দ দৃশ্যমান অক্ষরের সমকত্ব রক্ষা করে না, কিন্তু মাত্রাসমকত্ব রক্ষা করে। তাই কেহ কেহ বলেন, মাত্রা-সমকত্বই বাঙলা ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব।

সংস্কৃতে ছন্দের দুইটি বিভাগ আছে—বৃত্ত ও জাতি। ইহাদের মধ্যে বৃত্তছন্দে প্রতি পাদে অক্ষব সংখ্যা সমান থাকে, তাই বৃত্তকে বলা হয়, 'বৃত্তমক্ষর-সঙ্খ্যাতম্'—অর্থাৎ অক্ষর সংখ্যা দ্বারা বৃত্তছন্দের পরিমাপ হয়। কিন্তু জাতি-ছন্দের প্রতি পাদে অক্ষর সংখ্যা অসমান, মাত্রাসংখ্যা সমান, তাই বলা হয় 'জাতির্মাত্রাকৃতা'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব অক্ষর-সমকত্ব, আর জাতি ছন্দেব বিশেষত্ব মাত্রা-সমকত্ব।

সাধারণভাবে বাঙলা ছন্দকেও 'মাত্রাকৃতা' বলা হয়। কিন্তু দৃষ্টি-গ্রাহ্য অক্ষর নয়, শ্রুতি-গ্রাহ্য অক্ষর-ধ্বনি দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, বাঙলা ছন্দে অক্ষর-সমকত্বও রক্ষা করা হয়। যে স্থলে অক্ষর অসমান দেখা যায়, বুঝিতে হইবে সেস্থলে একই অক্ষবে একাধিক স্বর বা অক্ষর আছে—উচ্চারণকালে তাহা ধবা পড়ে। উপরেব উদাহরণে 'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস'—এই চরণে তেবটি অক্ষর আছে, কিন্তু শেষের অক্ষরে স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে দীর্ঘ হয়, ফলে ইহার উচ্চাবণ হয়,—কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদ ব্যা—স'; এইরূপ উচ্চারণে অক্ষর ও মাত্রাসংখ্যা উভয়ই হয় ১৪। তেমনই 'ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ'—ইহার উচ্চারণ হয়,—'ইথে যদি | সু-ন্দরী | তে-জবি | গে-হ-' তাহাতে প্রতি পর্ব্বের অক্ষর ও মাত্রা সংখ্যা হয় ৪। বাঙলা ছন্দেব পর্ব্ববিচারে উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন: উচ্চারণ ঠিক হইলে দেখা যাইবে—বাঙলা ছন্দ একাধারে অক্ষরসমক ও মাত্রাসমক।

সাধারণতঃ একটি পর্ব্বে চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা দশ মাত্রা থাকে। একটি পর্ব্বে কমপক্ষে চার এবং অনধিক দশটি মাত্রা থাকে। অধ্যাপক অমূল্যবাবু বলেন, 'পর্ব্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি।' এক একটি শব্দ এক, দুই, তিন বা চার মাত্রার পর্য্যন্ত হইতে পারে: এইরূপ কয়েকটি অখণ্ড শব্দ লইয়া পর্ব্ব গঠিত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এ নিয়ম খাটে, তাহা নয়। কখনও ছন্দের অনুরোধে পর্ব্বমধ্যে খণ্ডিত শব্দাংশও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যেমন, 'ঘরেতে দু | রন্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি'—এখানে প্রথম ও তৃতীয় পর্ব্বে খণ্ডিত শব্দাংশ লইয়া পর্ব্ব গঠিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্বের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি, উপরের '।' এবং '॥' চিহ্নগুলি দ্বারা যথাক্রমে এক ও দুই মাত্রার হিসাব দেওয়া হইল:

(১) **চার মাত্রার পর্ব্ব**

[ক] খনা ডেকে | বলে যান
রোদে ধান | ছায়ায় পান

[খ] তঁহি অতি | দূরতর | বাদর | দোল
বারি কি | বারই | নীল নি | চোল

(২) **পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব**

[ক] পঞ্চ শরে | দগ্ধ কোরে | করেছ একি | সন্ন্যাসী
বিশ্বময় | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে

[খ] ভুজঙ্গমণি | মন্দিরে | ঘন বিজুরি | সঞ্চরে |
মেঘরুচি | বসন পরি | ধানা

(৩) **ছয় মাত্রার পর্ব্ব**

[ক] ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্ব্বোধ অতি | ঘোর
যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর

[খ] বসিয়া বিরলে | থাকয়ে একলে | না শুনে কাহারো | কথা

(৪) **সাত মাত্রার পর্ব্ব**

[ক] এ সখি হমারি | দুখের নাহিক | ওর
ই ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর

[খ] ফুলের মালাগাছি | বিকাতে আসিয়াছি |
পরখ করে সবে | করে না স্নেহ

(৫) আট মাত্রার পর্ব্ব

॥ ॥ । । । । । । । । ॥ । । ॥ । । । । । । । ॥ ।
[ক] ইন্দী বব বব। উদর সহোদর। মেত্তুর মদ হর। দেহ

॥ । । ॥ । । । । । । । । । । ॥ । । ॥ । । ॥ ।
[খ] কণ্টক গাড়িক। মলসম পদতল। মঞ্জীর চীরহি। ঝাঁপি

। । । । । । । ॥ । । । । । । । ॥
[গ] দুঃখ কর অবধান। দুঃখ কর অবধান

(৬) দশ মাত্রার পর্ব্ব

। ॥ । ॥ । । । । ॥ । । ॥ । ।
[ক] এবার ফিরাও মোরে। লযে যাও সংসারের তীরে

॥ । । । । । ॥ । । ॥ । । । । । ।
[খ] এই তীর্থ দেবতার। ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে

। । ॥ । । । । । । । । । । । । । ।
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি। সাজাইনু সযত্ন চযনে

পর্ব্বের বিভিন্ন নাম—যে-কোন চরণের পর্ব্বগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে অধিকাংশ পর্ব্বই কযেকটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা লইযা গড়িয়া উঠে। ছন্দ অনুযাযী পূর্ণ মাত্রাসংখ্যা লইযা যে পর্ব্বগুলি গঠিত হয, তাহাকে 'পূর্ণ পর্ব্ব' বলে। 'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর' (উপরের উদাহরণ নং ৩ক)—এই পংক্তির পর্ব্বগুলির প্রথম তিনটি পর্ব্ব ছয় মাত্রার। উক্ত পংক্তিতে ওই তিনটি পর্ব্ব 'পূর্ণ পর্ব্ব'।

আবার অনেক সময় চরণের শেষ পর্ব্বটি মাপে পূর্ণ পর্ব্বের তুলনায় ছোট বা বড় হয়। ছোট হইলে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা পর্ব্ব বলিযা গণ্য করা হয়। এইরূপ পর্ব্বকে বলে 'অপূর্ণপদী পর্ব্ব' (Catalectic = Stopping short); যেমন,

[ক] মথুরাবাসিনী। মধুর হাসিনী। শ্যামবিলাসিনী। **রে**

[খ] কেও বিহরে। হরহৃদি পরে। হরমন হরে। **মোহিনী**

[গ] বিষ্টি পড়ে। টাপুর টাপুর। নদেয এলো। **বান**

যদি চরণান্তিক পর্ব্বটি মাপে অন্যান্য পর্ব্বের তুলনায বড় হয, তবে সে পর্ব্বকে বলা হয় 'অতি পূর্ণপদী পর্ব্ব' (hypermetrical = possessing something more); মাপে যেটুকু অংশ বড় হয়, তাহা সাধারণতঃ আলাদা পর্ব্ব হিসাবে গণ্য হয় না, শেষ পর্ব্বটির সহিত সংযুক্ত হইযা থাকে : যেমন,

(ক) সকল অহং | কার হে আমার | ডুবাও চোখের জলে

(খ) না জানি কতেক মধু | শ্যাম নামে আছে গো |
বদন ছাড়িতে নাহি পারে

(গ) অতি অবশেষ নিশি | গগনে উদয় শশী |
বলে উমা, ধরে দে উহারে

'অপূর্ণ পদী' এবং 'অতি পূর্ণপদী' পর্ব্ব ছাড়াও, কবিতার চরণের প্রারম্ভে আর এক প্রকার ধ্বনিগুচ্ছ থাকে, তাহাকে বলে 'অতিপর্ব্বিক ধ্বনি'। এই ধ্বনিটির সহিত মূল চরণের ধ্বনিপ্রবাহের কোন সম্পর্ক নাই ; ইহা চরণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক অংশ। অপূর্ণ বা অতিপূর্ণপদী পর্ব্ব যেমন চরণের অন্তর্গত একটি অংশ, অতিপর্ব্বিক ধ্বনি তাহা নয়। ইহা অতিরিক্ত ধ্বনিমাত্র, ছন্দের মাত্রা গণনায় এ অংশটুকুকে বাদ দিতে হয়। নীচের বন্ধনী-মধ্যস্থ অংশগুলি অতিপর্ব্বিক :

(ক) (বুঝি) সেদিন সজনি | এমনি রজনী | আঁধিয়ার
এমনি প্রখর | ঝটিকামুখর | চারিধার

(খ) (আছ) অনল অনিলে | চির নভো নীলে
ভূধর সলিলে গহনে |

(গ) এমন দিন কি | হবে তারা |
(যেদিন) তারা তারা | তারা বলে | তারা বেয়ে | পড়বে ধারা |

(ঘ) (ওরে) নড়ল কি | ঘোমটার | মেঘ_লা আ | ষাঢ়
(ওরে) উড়ল কি | পদ্মার | এতটুকু | পাড়

(ঙ) (দেখো) হত্তে পার্ত্তেম | নিশ্চয় একটা | উঁচু দরের | কবি,
(কিন্তু) লিখতে বসলে | অক্ষরগুলো | গরমিল হয় যে | সবই

পর্ব্বাঙ্গ

এক একটি পর্ব্বের গঠন বিচার করিলে দেখা যায়, পর্ব্বের মধ্যে আবার একটি বা দুইটি বা তিনটি করিয়া অঙ্গ থাকে। পর্ব্বের এই অঙ্গগুলিকে বলা হয় **পর্ব্বাঙ্গ**। ইংরাজিতে দুই যতির মধ্যে কয়েকটি করিয়া foot থাকে ; এই foot একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর শব্দ বা শব্দসমষ্টি লইয়া গঠিত। সংস্কৃতেও দুই যতির মধ্যে থাকে কয়েকটি 'গণ' : গণও একটি বা দুইটি

শব্দ লইয়া গঠিত যেমন, 'নারীণাং'—ত্রিগুরু অক্ষরবিশিষ্ট একটি গণ বা 'স খলু' —ত্রিলঘুঅক্ষরবিশিষ্ট একটি গণ। সংস্কৃত শ্লোকপাদ এইরূপ কয়েকটি 'গণ'-এর সমষ্টি। বাঙলায় দুই যতির মধ্যে যে পর্ব্ব সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহাতে foot বা 'গণ' থাকে না, থাকে-- একটি, দুইটি বা তিনটি শব্দ : এইরূপ একটি বা দুইটি শব্দ লইয়া এক একটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত হয়। 'তুই কি ভাবিস | দিন রাত্তির | খেলতে আমার | মন'—এই ছন্দপংক্তিতে প্রথম তিনটি পূর্ণপর্ব্ব : প্রথম পর্ব্বটিতে আছে তিনটি শব্দ 'তুই, কি, ভাবিস'—এই তিনটি শব্দ মিলিয়া দুইটি পর্ব্বাঙ্গ 'তুই কি : ভাবিস্', দ্বিতীয়টিতেও দুইটি পর্ব্বাঙ্গ 'দিন : রাত্তির', তৃতীয়টিতেও দুইটি পর্ব্বাঙ্গ 'খেলতে আমার'। 'যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর'—এই ছন্দ পংক্তিতে প্রথম পর্ব্বটিতে আছে তিনটি শব্দ 'যা, কিছু, হারায়' ; এখানে পর্ব্বাঙ্গও তিনটি 'যা . কিছু : হারায়'। পর্ব্বস্থ শব্দগুলির মধ্যে কযটি শব্দ লইযা একটি পর্ব্বাঙ্গ হইবে, তাহা নির্ভর করে শব্দগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও অনুপাতের উপব। পর্ব্বাঙ্গ সম্পর্কে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে,– (১) একটি পর্ব্বে দুইটিব কম বা তিনটির বেশি পর্ব্বাঙ্গ থাকে না এবং (২) পর্ব্বাঙ্গগুলির মাপ, হয় পরস্পব সমান হয় —না হয়, তাহাদের মাত্রা সংখ্যা ক্রমানুসাবে বিন্যস্ত হয অর্থাৎ 'পব পর পর্ব্বাঙ্গগুলি, হয় ক্রমশঃ হ্রস্বতর, না হয়, দীর্ঘতর হয়।' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিজোড়ে-বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাথ জোড'—পর্ব্বাঙ্গনির্ণয়ে এই সূত্রটিও স্মরণীয়। আমরা নিম্নে কয়েকটি পর্ব্বাঙ্গের সন্নিবেশ দেখাইতেছি, পর্ব্বমধ্যে ' : ' চিহ্নদ্বারা পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ সূচিত হইল এবং নীচে প্রতি পর্ব্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যাও দেওয়া হইল :—

(১) আতা . গাছে | তোতা : পাখী | ডালিম : গাছে | মৌ
২ + ২ ২ + ২ ২ + ২

এত : ডাকি | তবু : কথা | কও না : কেন | বৌ
২ + ২ ২ + ২ ২ + ২

(২) চলিলে . সাথে | হাসিলে . অনু | কূল
৩ + ২ ৩ + ২

তুলিনু যূথী | তুলিনু : জাতী | তুলিনু চাপা | ফুল
৩ + ২ ৩ + ২ ৩ + ২

(৩) পুণ্য : লোভীর | নাই : হল ভিড় | শূন্য : তোমার | অঙ্গনে
৩ + ৩ ২ + ২ + ২ ৩ + ৩

(৪) মেলাবেন তিনি | ঝড়ো হাওয়া আর |
৪ + ২ ২ + ২ + ১
পোড়ো বাড়ীটার | ঐ ভাঙা দরজাটা
২ + ৪ ১ + ২ + ৯

(৫) ঈশ্বরীরে : জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বরী পাটনী
৪ + ৪ ৩ + ৩
একা দেখি কুলবধূ | কে . বট আপনি
২ + ২ + ৪ ১ + ২ + ৩

(৬) এবার ফিরাও মোরে | লয়ে যাও সংসারের : তীরে
৩ + ৩ + ২ ৪ + ৪ + ২

পর্ব্বাঙ্গ সন্নিবেশে পর্ব্বমধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। বাঙলায় শব্দগুলি প্রায়ই কাটা কাটা উচ্চারণ হয়, ফলে এক শব্দ হইতে আর এক শব্দের উচ্চারণকালে অতি সামান্য একটু যতি পড়ে—তাহাতেই স্পন্দন জাগে। অধ্যাপক অমূল্যবাবু মনে করেন, পর্ব্বাঙ্গের নিজস্ব কোন তরঙ্গ নাই : পর্ব্বমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলেই তাহারা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই অভিমত সর্ব্বাংশে সত্য নয়, কারণ দুই বা তিন মাত্রার শব্দে আহত-অনাহত অক্ষরের সমাবেশে স্পন্দন সৃষ্টি হইতে পারে।

চরণ (Verse)

শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিন্যস্ত একটি সুন্দর তরঙ্গায়িত ধ্বনি-প্রবাহই ছন্দ। কিন্তু এই ধ্বনিপ্রবাহ যদি না থামিয়া একটানা চলিতে থাকে, তবে বাগ্‌যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, কর্ণ ও মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। সমাপ্তির প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। অর্থের দিক হইতে আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তি হইলে বাক্য সমাপ্ত হয় এবং পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। তেমনই ভাবের দিক হইতে একটি চলমান ধ্বনিপ্রবাহে যখন 'আকাঙ্ক্ষা'র নিবৃত্তি ঘটে, তখন পূর্ণ যতি (final pause) পড়ে। একটি পূর্ণ যতি দ্বারা খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহই একটি কবিতার 'চরণ'। এখানে ভাবের দিক হইতে ধ্বনির গতি পূর্ণ বিরতি লাভ করে : 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'—ইহা একটি চরণ।

প্রাচীন বাঙলা কবিতায় সাধারণতঃ পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি একই স্থানে অবস্থিত হইত, ফলে কবিতার এক একটি চরণ একটি স্বয়ংপূর্ণ বাক্য হইয়া উঠিত। যেখানে অর্থের দিক হইতে পূর্ণচ্ছেদ এবং ভাবের দিক হইতে

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার ছন্দ লইয়া বিচিত্র ধরণের চরণ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সপ্তপর্ব্বিক চরণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন,

হাওয়ার সঙ্গে | হাওয়া হয়ে | যাবো মা তোর | বুকে ব'য়ে |
ধরতে আমায় | পারবিনে তো | হাতে,
জলের মধ্যে | হব মা ঢেউ | জানতে আমায় | পারবে না কেউ |
স্নানের বেলা | খেলব তোমার | সাথে ॥

স্তবক (Stave)

কতকগুলি ধ্বনি একটি স্বরনিয়ন্ত্রিত হইয়া অক্ষরে পরিণত হয় (বি, অক্, কৌ) ; একটি অক্ষর বা কয়েকটি অক্ষর মিলিয়া একটি অর্থ প্রকাশ করিলে হয় **শব্দ** বা পদ (মা, এক্, বৌ, চন্‌-দন্, আ-মি, কৌ-তুক্) ; এই পদ লইয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠিত হয় ; এইরূপ কয়েকটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি লইয়া, মাত্রার দিক হইতে একটি বিশিষ্ট মাপ বা দৈর্ঘ্য সৃষ্টি হইলে হয় পর্ব্ব ('হে মোর চিত্ত,' 'পুণ্য তীর্থে,' 'জাগোরে ধীরে') ; এইরূপ কয়েকটি সমান মাপের পর্ব্ব একত্র হইয়া একটি ভাবের পূর্ণতা বুঝাইলে হয় একটি চরণ ('আয় আয় : সই | জল : আনিগে | জল্ : আনিগে | চল')

কিন্তু ছন্দোবিভাগের এইখানেই শেষ নয়। চরণগুলিও আবার পূর্ণ ভাব-বিরতি না হওয়া পর্য্যন্ত, দুইবার, তিনবার বা ততোধিক বার পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে দুই বা দুইয়ের অধিক চরণ, সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি ভাব-প্রবাহের পূর্ণ বিরতি সূচনা করিলে একটি **স্তবক** হয়। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Stave :

> Stave or staff, is the English name for a number of verses grouped together, generally with a definite pause at end. We might call it a metrical paragraph.*

ইংরাজিতে দেখা যায়, চরণের সংখ্যা অনুসারে 'স্তবক'-এর কত না নাম, Couplet (চরণান্তিক মিল সহ দুই চরণের স্তবক), triplet (তিন চরণের স্তবক), Quatrains (চার চরণের স্তবক), Sonnet (চৌদ্দ চরণবিশিষ্ট স্তবক)। সংস্কৃতেও, বিশেষ করিয়া বৈদিক ছন্দে, দ্বিপদা (বিরাজ্), ত্রিপদা

---

* **English composition & Rhetoric—Alexander Bain.**

(গায়ত্রী), চতুষ্পদা (অনুষ্টুভ্) স্তবকের প্রচলন ছিল। প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে প্রায় সমস্ত ছন্দই ছিল চতুষ্পদী : চরণান্তিক মিল থাকায়, প্রথম+দ্বিতীয় এবং তৃতীয়+চতুর্থ মিলিয়া দুই চরণের সৃষ্টি হইত : প্রাকৃত-অপভ্রংশে এইরূপ চরণান্তিক মিল সহ দুই চরণের স্তবককে বলা হইত 'দোহা' :

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥[১]

চৌপাই ও দোহা ছিল প্রাকৃত-অপভ্রংশের বিশিষ্ট স্তবক এবং এই নামেই ছিল ছন্দের নাম। সংস্কৃতে চতুষ্পাদবিশিষ্ট দুই চরণের কবিতাকে বলা হইত 'শ্লোক'। বাল্মীকিও তাঁহার "মা নিষাদ" বিখ্যাত ছন্দকে বলিয়াছেন শ্লোক :

পাদোবদ্ধোঽক্ষর সমতন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥[২]

বাংলাতেও বিভিন্ন প্রকারের 'স্তবক' দেখা যায়। তন্মধ্যে দুই চরণবিশিষ্ট চরণান্তিক মিল সহ 'পয়ার' ছন্দই প্রধান। আধুনিক কালে তিন বা ততোধিক চরণবিশিষ্ট বিভিন্ন 'স্তবক' দেখা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্তবক সুনির্দিষ্ট নয়। চৌদ্দ চরণ বিশিষ্ট 'সনেট'ও বাংলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা কয়েকটি 'স্তবকে'র দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে রাখিতে হইবে এক চরণকে ভাঙ্গিয়া অনেক সময় দুই ছত্রে বা তিন ছত্রে লেখা হয় : সেক্ষেত্রে কয়েকটি ছত্র মিলিয়া এক চরণ ধরিতে হইবে। বাংলার ত্রিপদী বা চতুষ্পদী ছন্দগুলিও দুই চরণের স্তবকান্তর্গত।

(১) দুই চরণের স্তবক

[ক] জঅ জঅ দুন্দহী | সাঁদ উছলিলাঁ |
কাহ্নু ডোম্বী | বিবাহে চলিলা ||
[প্রতি চরণে দুই পর্ব্ব]

[খ] ঢল ঢল কাঁচা | অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির | তরঙ্গ হিল্লোলে |
মদন মুরুছা পায়॥
[প্রতি চরণে তিন পর্ব্ব]

১ সরহবজ্রের দোহা। ২ বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড, ২।১৮

[গ] গুরু গুরু মেঘ | গুমরি গুমরি | গরজে গগনে | গগনে,
গরজে গগনে |
[প্রথম চরণে চার পর্ব্ব, দ্বিতীয় চরণে এক পর্ব্ব]

[ঘ] কত বৃষ্টি হয়ে গেছে | কত ঝড় অন্ধকার মেঘ |
আকাশ কি সব মনে রাখে,
আমারও হৃদয় তাই | সব কিছু ভুলে গিয়ে |
হল আজ সুনীল উৎসব |
[প্রতি চরণে তিনটি করিয়া দীর্ঘ পর্ব্ব]

(২) **তিন চরণের স্তবক**

[ক] কোথায় আছ তুমি | কোথায় মাগো,
কেমনে ভুলে তুই | আছিস্ হাঁ গো,
উঠিলে নব শশী | ছাদের পরে বসি | আর কি উপকথা | বলিবি না গো।
[প্রথম দুই চরণ দ্বিপর্ব্বিক, তৃতীয় চরণ চতুষ্পর্ব্বিক]

[খ] ভোর হোলো | দোর খোলো | খুকুমণি | ওঠরে,
ঐ ডাকে | যুঁই শাখে | ফুল-খুকি | ছোটরে
খুকুমণি | ওঠরে
[প্রথম দুই চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, দ্বিতীয় চরণ দ্বিপর্ব্বিক]

(৩) **চার চরণের স্তবক**

[ক] আমাদের এই | গ্রামের নামটি | খঞ্জনা
আমাদের এই | নদীর নামটি | অঞ্জনা
আমার নাম তো | জানে গাঁয়ের | পাঁচ জনে
আমাদের সেই | তাহার নামটি | রঞ্জনা।

{ চার চরণের স্তবক
প্রতি চরণে তিনটি পর্ব্ব }

[খ] বন পথে | চলেছে চার্ব্বাক
সূর্য্য তাপে | স্পন্দিত সে বন,
ক্লান্ত আঁখি | চিন্তিত নির্ব্বাক
বিনা কাজে | ফিরিছে ভুবন।

{ চার চরণের স্তবক
প্রতি চরণে ২ পর্ব্ব
পর্ব্বগুলি (৪ + ৬) = ১০ মাত্রার }

আধুনিক কবিতায় পাঁচ, ছয়, সাত বা আরো বেশি চরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া স্তবক রচনা করা হয়। চতুর্দ্দশপদী 'স্তবক'-এর কথা আমরা 'সনেট'-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

৩

বাঙলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ

জাতি বিষয়ক মতবাদ

বাঙলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগের কথা উঠিলেই জাতি-বিষয়ক মতবাদের কথা উঠে। আচার্য্য মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের মতে বাঙলা ছন্দ দ্বিজাতীয়—(১) পদভাগের ছন্দ ও (২) পর্ব্বভাগের ছন্দ। বাঙলা রামায়ণ, মহাভারতে যে সকল ছন্দ পাওয়া যায়, তাহা পদভাগের ছন্দ আর বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা প্রচলিত ঘুমপাড়ানী গান প্রভৃতিতে যে ছন্দ পাওয়া যায়, তাহা পর্ব্বভাগের ছন্দ।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তিন জাতীয় ছন্দের কথা বলিয়া থাকেন—(১) য়ৌগিক (২) মাত্রাবৃত্ত ও (৩) স্বরবৃত্ত ছন্দ। রামায়ণ-মহাভারতাদি কাব্যে যে-সকল ছন্দ আছে তাহা যৌগিক ছন্দ; ব্রজ-বুলিতে যে-সকল কবিতা রচিত, তাহা মাত্রাবৃত্ত এবং ছড়ায় ব্যবহৃত ছন্দের নাম স্বরবৃত্ত। এক একটি ছন্দের মাপক এক এক প্রকার: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ মাত্রা গুণিয়া নির্ণীত হয়, স্বরবৃত্ত ছন্দের মাপক স্বর (=অক্ষর) এবং যে-হেতু যৌগিক ছন্দে হলন্ত অক্ষরগুলি কোথাও এক-মাত্রিক, কোথাও দ্বি-মাত্রিক—সেইজন্য ইহার নাম যৌগিক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু বাঙলা ছন্দের একটি মাত্র জাতি স্বীকার করেন: তাঁহার মতে 'বাংলা ছন্দের ত্রিধা বিভাগ অনৈতিহাসিক'; সকল ছন্দেরই মাত্রাপদ্ধতি এক প্রকার এবং তাহারা মূলতঃ একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত, বাঙলা ছন্দোবন্ধনের নীতি একটি—Beat and Bar Theory (পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গবাদ)। তিনি আরও বলেন, বাঙলা ছন্দের জাতি এক, তবে রীতি (style) ভিন্ন ভিন্ন। রীতির দিক হইতে বাঙলায় তিনটি বিভিন্ন ঢঙের ছন্দ দেখা যায়—(১) ধীর লয়ের ছন্দ বা তান-প্রধান ছন্দ, (২) বিলম্বিত লয়ের ছন্দ বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ এবং (৩) দ্রুত লয়ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ।

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙলা ছন্দের ত্রিজাতীয়ত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে, 'পর্ব্বোচ্চারণ ভঙ্গিই হইতেছে ছন্দের জাতি-স্ব'। বাঙলায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পদ্যপর্ব্ব বিভিন্ন নিয়মে উচ্চারণ করিতে হয় বলিয়া বাঙলা পদ্যছন্দে জাতিভেদ বর্ত্তমান। "বাঙলা পদ্যছন্দ ত্রিজাতীয়। সাধারণ

ভঙ্গিতে উচ্চার্য্য ছন্দের নাম 'অক্ষর বৃত্ত', প্রবল ভঙ্গিতে উচ্চার্য্য ছন্দের নাম 'বলবৃত্ত', এবং দুর্ব্বল ভঙ্গিতে উচ্চার্য্য ছন্দের নাম—'মাত্রাবৃত্ত'।"

অন্যান্য ভাষার ছন্দ

বাঙলা ছন্দ এক জাতীয় বা দ্বিজাতীয় বা ত্রিজাতীয়—যাহাই হউক না কেন, সকলেই ইহার তিনটি প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলা কাব্যে তিন শ্রেণীর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তবে আধুনিক কালে ইহাদের যেমন বিচিত্র নাম-বৈচিত্র্য দেখা যায়, প্রাচীনকালে তাহা ছিল না। অক্ষববৃত্ত বা তান-প্রধান ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ, বলবৃত্ত (স্বরবৃত্ত) বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ—এই নামগুলি আধুনিক। প্রাচীন বাঙলায় ছন্দের নামের দৈন্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ইংরাজীতে 'foot'এর প্রকৃতি ও সংখ্যা অনুসারে এক এক ছন্দের এক এক নাম,—Trochaic, Iambic, Anapæstic ইত্যাদি; এগুলি আবাব Dimeter* (দুই foot বিশিষ্ট), Trimeter (তিন foot বিশিষ্ট), Tetrameter (চার foot বিশিষ্ট) ইত্যাদি নামেও অভিহিত। Hexameter ইংরাজির একটি বিশিষ্ট ছন্দ। Homer-এর প্রসিদ্ধ মহাকাব্যেও এই ছন্দ ব্যবহৃত হইযাছে। ইহা ছাড়াও স্তবক-সজ্জাব দিক হইতে ছন্দের আরও নাম আছে—Couplet (দুই চরণেব স্তবক-বিশিষ্ট), Triplet (তিন চরণ বিশিষ্ট স্তবক), Quatrains (চাব চবণের স্তবক), Sonnet (চৌদ্দ চরণেব কবিতা): 'Run on' বা 'Non-stopt' ছন্দ হিসাবে Blank verse-এর নামও উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজী ছন্দের নাম

সংস্কৃতে ছন্দের প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ—বৃত্ত ও জাতি। বৃত্তছন্দ 'অক্ষর-সঙ্খ্যাত' - ইহার প্রত্যেক শ্লোকপাদে সমানসংখ্যক অক্ষর থাকে, আব 'জাতি মাত্রাকৃতা'—ইহাব শ্লোকপাদে সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে। বৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত বহু ছন্দ আছে,—শ্লোকপাদের অক্ষর সংখ্যা অনুসারে তাহাদের বিভিন্ন নাম, নামগুলিও অশেষ কবিত্ব পূর্ণ — মালতী (ষড়ক্ষরা বৃত্তি), তোটক, পঞ্চচামর, ভুজঙ্গ প্রযাত (দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি), তূণক (পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি), মন্দাক্রান্তা (সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি) ইত্যাদি। জাতি-ছন্দের মধ্যে 'আর্য্যা' বিশিষ্ট ছন্দ, আর্য্যারও নানা বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ষোড়শ মাত্রার ছন্দ 'পজ্‌ঝটিকা' বিখ্যাত। প্রাকৃতের প্রধান বা একমাত্র ছন্দ এই আর্য্যা, তাহার বিশিষ্ট নাম 'গাহা' (গাথা)।

সংস্কৃত ছন্দেব নাম

অপভ্রংশেও ছন্দের নামকরণের দীনতা নাই। ইহার সকল ছন্দই মাত্রা-ছন্দ। এই ছন্দগুলির মধ্যে অধিকাংশই চতুষ্পদী (চউপঈ)। ইহাদের মধ্যে 'গাহা', 'দোহা' এবং বিশেষভাবে 'পাদাকুলক' (চৌপদী, প্রতি পাদে ১৬ মাত্রা), 'শঙ্করী,' 'ঝল্লণা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ নামের প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়।

অপভ্রংশ ছন্দ

প্রকারভেদে বাঙলা ছন্দের নাম

কিন্তু বাঙলায় ছন্দের নামের দৈন্য স্বীকার করিতেই হয়। একপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে নাম পাওয়া যায়, তাহা একটি চরণে কয়টি পর্ব্ব আছে, তাহারই পরিচায়ক। এগুলিকে বিশেষভাবে ছন্দের জাতি বা শ্রেণী বলা চলে না। চর্য্যাগীতিকায়, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, বৈষ্ণব পদাবলীতে কবিতার উপরে 'পটমঞ্জরী', 'গুঞ্জরী', 'রামক্রী', 'গবড়া', 'মালসী' প্রভৃতি নাম দেওয়া আছে। এগুলিও প্রকৃতপক্ষে কোন ছন্দের নাম নয়, রাগ-রাগিণীর নাম। চর্য্যাগীতিকার ছন্দ অপভ্রংশের 'দোহা' জাতীয়। বৌদ্ধ সহজিয়াদের কতকগুলি গানকে 'দোহা' বলা হয়। সরহবজ্রের অপভ্রংশ কবিতার টীকাকার অদ্বয়বজ্র —এগুলিকে 'দোহা' নামেই অভিহিত করিয়াছেন :

'লিখ্যতে **দোহা**কোষস্য সহজাম্নায় পঞ্জিকা'[১]

চর্য্যাগীতিকার টীকায় দুই চরণের শ্লোককে বলা হইয়াছে 'পদ' ; চর্য্যাগানেও প্রায় প্রত্যেক কবিতায় প্রথম দুই চরণের পরে 'ধ্রু' চিহ্নটি ব্যবহার করা হইয়াছে ; 'ধ্রু' মানে 'ধ্রুবপদ'। বিশেষ অর্থে 'পদ' শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন কবি জয়দেব, তিনি সাধারণ ভাবে তাঁহার গানকে বলিয়াছেন 'পদাবলী' (পদসমষ্টি)। জয়দেব গোস্বামীর 'পদ' বা 'পদাবলী' সংস্কৃত ছন্দে রচিত নয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ইহা অপভ্রংশের ছন্দ :

> জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানগুলি সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু সেগুলির ছন্দ অপভ্রংশের। অপভ্রংশ-ছন্দের শক্তির ও মাধুর্য্যের প্রায় সম্পূর্ণ পরিচয় এগুলিতে আছে।[২]

অতএব 'পদ' নাম দিয়া অপভ্রংশের মাত্রাছন্দকে হুবহু গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চলিয়াছে প্রাচীন বাঙলার গেয় গীতিকবিতাগুলির মধ্যে। চর্য্যাগীতিকায়, জয়দেবে এই ছন্দে রচিত গানকে বলা হইয়াছে 'পদ'। ব্রজবুলিতে ('অবহট্ঠ' ভাষার একপ্রকার

'পদ' ছন্দ বা তৎসম মাত্রা ছন্দ

---

১ সরহবজ্রের দোহাকোষ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। ২ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডাঃ সুকুমার সেন।

রূপভেদ ; ইহাতে বাঙলা, হিন্দী ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়) যে সকল গান পাওয়া যায়, তাহাও এই 'পদ'ছন্দে রচিত। পরবর্ত্তী কালের কবিরাও এইরূপ ছন্দোবন্ধকে বলিয়াছেন 'পদ' :

(১) কি-কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
—এই **পদ** গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

(২) রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির **পদ** গোবিন্দ দাস॥

তাহা হইলে বাঙলায় এক শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যাইতেছে, তাহা গানের ছন্দ বা 'পদ'ছন্দ। এই ছন্দ, হুবহু সংস্কৃত জাতি বা অপভ্রংশ মাত্রাছন্দের অনুকরণে গানের উদ্দেশ্যে রচিত। চর্য্যাগীতিকার টীকাকার, জয়দেব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিরাজ গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণ এই ছন্দে রচিত গানকে 'পদ' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। ইহা 'মাত্রাকৃতা' 'পদ'-ছন্দ। ইহাকে তৎসম ছন্দও বলা যায়।

পয়ার ছন্দ বা তদ্ভব ছন্দ

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে আর এক প্রকারের ছন্দ পাওয়া যায়, তাহা 'পাঁচালির' ছন্দ বা 'পয়ার' ছন্দ। কেহ কেহ বলেন, 'পাঁচালি' কোন ছন্দের নাম নয় ইহা 'গেয় গাথাকাব্য'। অবশ্য 'পাঁচালি' শব্দটি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাস যখন বলেন,

পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরাম **পাঁচালি**॥

—তখন 'পাঁচালি'র অর্থ গেয় গাথাকাব্যই বটে। কিন্তু যখন বলা হয়,

দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিলা **পাঁচালি** ছন্দে ভারত পুরাণে॥

—তখন 'পাঁচালি' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় এক প্রকার ছন্দের নাম। কবিকঙ্কণও একাধিক স্থলে 'ছন্দ' অর্থেই 'পাঁচালি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 'পঞ্চালিকা' শব্দ হইতে 'পাঁচালি' শব্দটি আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে 'পঞ্চালিকা'র অর্থ করা হইয়াছে 'শারিশৃঙ্খলা' বা 'ছক'। তাহা হইলে ইহাকেও এক প্রকার ছন্দই বলিতে হয়।

কিন্তু 'পাঁচালি' নাম হইতেও, গেয় গাথাকাব্যের ছন্দ হিসাবে প্রাচীন বাঙলায় 'পয়ার' নামটিই অধিক প্রচলিত। পাঁচালিই পয়ার, অথবা বলা যায়, পাঁচালি রচনার বিশিষ্ট ছন্দ—পয়ার। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, কবিকঙ্কণ, আলাওল সকলেই ছন্দের নাম হিসাবে 'পয়ার' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন,

> পয়ার কথাটি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হয়, ইহা 'পাদ' শব্দের অপভ্রংশে 'পায়া' বা 'পয়া' শব্দ-উৎপন্ন ; যথা, সেপায়া, চৌপায়া, খাটের পায়া ইত্যাদি এবং ঐ 'পয়া' হইতেই 'পয়ার' শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব 'পয়ার' শব্দের অক্ষরগত অর্থ পাদচরণ-বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপ ছন্দোবোধার্থে যোগরূঢ় হইযা উঠিয়াছে।[১]

পযার ছন্দই বাঙলা ছন্দের রাজা। সুপ্রাচীন কাল হইতে, এই ছন্দে বাঙলার শ্রেষ্ঠ কাব্যাদি রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি রচিত হইয়া আসিতেছে। গানের 'পদ'-ছন্দ হইতেই ইহার উৎপত্তি, অর্থাৎ অপভ্রংশের মাত্রাছন্দ বা সংস্কৃতের 'গীতময়' বৃত্ত হইতেই ইহার উদ্ভব : কিন্তু ইহা 'পদ' নয় 'পদাকার' অর্থাৎ পদের অনুরূপ। বাঙলার উচ্চারণ রীতি অনুসারে সংস্কৃত বা অপভ্রংশের লঘু-গুরু অক্ষর বা হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট মাত্রা গণনার পদ্ধতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, ফলে প্রত্যেক অক্ষরই এথানে একমাত্রিক হইয়া উঠে। উচ্চারণরীতির এই বৈশিষ্ট্য হইতে ক্রমশঃ 'পদ'ছন্দ (মাত্রাছন্দ)—পয়ারছন্দে পরিণত হয়। 'পদ' প্রাচীন মাত্রাছন্দের তৎসম রূপ, আর 'পয়ার' তাহার তদ্ভব রূপ। এই পয়ারেরই নানা প্রকারভেদ—একপদী, ত্রিপদী, নাচাড়ী (দীর্ঘ ত্রিপদী) এবং চৌপদী ছন্দে বাঙলা কাব্য পরিপূর্ণ।

ছড়ার ছন্দ বা দেশজ ছন্দ

গানের 'পদছন্দ' এবং গেয় গাথা-কাব্য পাঁচালির 'পয়ার'ছন্দ ছাড়াও আর এক প্রকার ছন্দের সাক্ষাৎ প্রাচীন বাঙলা কাব্যে মিলে। সে ছন্দ লোকের মুখে মুখে আনাগোনা করিত : লোকের মুখের ভাষাতেই এই ছন্দ গড়িয়া উঠিত। পণ্ডিতজনের শিষ্ট কাব্যে ইহার তেমন প্রয়োগ হইত না বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ছড়া রচনায়, ব্রতের মন্ত্র বা বিষতাড়ানো মন্ত্রে, ঘুমপাড়ানী গানে, গ্রাম্য গাথায়, বাউল সঙ্গীতে

---

১ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন

এবং শ্যামা সঙ্গীতে এই মৌখিক ছন্দের প্রচলন ছিল। এই ছন্দের প্রধান বিশিষ্টতা, প্রতি পর্ব্বের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রদান করা। ইহার কোন নাম প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না—'ছড়া', 'বচন', —এই সকল নামেই ইহার পরিচয়। এই ছন্দটিকে বলা চলে বাঙলার দেশজ ছন্দ।

অতএব প্রাচীন বাঙলাতেও ছন্দের তিনটি প্রকারভেদ ছিল। ছড়া, গান, পাঁচালি—এই তিন বিভাগ লইয়াই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য। ছন্দও ছিল তিন প্রকারের—[ক] ছড়ার ছন্দ [খ] গানের 'পদ' ছন্দ ও [গ] পাঁচালির 'পয়ার' ছন্দ। ইহাদের মধ্যে ছড়ার ছন্দকে দেশজ ছন্দ, গানের পদছন্দটিকে তৎসম ছন্দ এবং 'পয়ার' ছন্দকে তদ্ভব ছন্দ নামে অভিহিত করা চলে। এই ছন্দগুলিই আধুনিক কালে যথাক্রমে শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বলবৃত্ত, ধ্বনি-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত, তান-প্রধান বা অক্ষরবৃত্ত নামে পরিচিত।

বিভিন্ন শ্রেণীয় ছন্দের লক্ষণ ও পরিচয়

[ক] ছড়ার ছন্দ

(১) কে মেরেছে | কে ধরেছে | কে দিয়েছে | গাল
তাইতো খুকু | রাগ করেছে | ভাত খায়নি | কাল

(২) শিল শিলাটন | শিলে বাটন | শিল অঝ্‌ঝরে | ঝরে
কৈলাস হতে | জিজ্ঞাসেন শিব | (ওরা) কিবা ব্রত | করে

(৩) বলাই মাঝির | নৌকাখানা | গুণ টানে তার | গুপে
রঘো গিয়ে | ফেলে দিল | কেশেড়ার ওই | ঝোপে

(৪) নীল বানরে | সোনার বাংলা | করল এবার | ছারখার
অসময়ে | হরিশ মৈল | লঙের হৈল | কারাগার

(৫) রঙ্গে নাচে | রণ মাঝে | কার কামিনী | মুক্তকেশী

(হৈয়ে) দিগম্বরী | ভয়ঙ্করী | করে ধরে | তীক্ষ্ণ অসি

(৬) খাঁচার ভিতর ¦ অচিন পাখী | কেমনে আসে ¦ যায়

ধরতে পারলে | মন-বেড়ী খান্ | দিতেম পাখীর | পায়

ছড়ার ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে, স্বভাবতই কয়েকটি লক্ষণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে :

(১) প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথম অক্ষরে একটি প্রবল শ্বাসাঘাত (স্বরাঘাত) বর্ত্তমান।

(২) পর্ব্বগুলির দৈর্ঘ্য (উচ্চারণের কাল-পরিমাণ) অতিশয় হ্রস্ব, কারণ প্রতিটি পর্ব্বে মাত্র চারিটি করিয়া অক্ষর বা স্বর আছে এবং প্রত্যেকটি স্বরই এক-মাত্রিক অর্থাৎ পর্ব্বগুলি চতুর্মাত্রিক। কেবল শেষের পর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত ছোট, অপূর্ণপদী।

(৩) এই ছন্দের প্রতিটি চরণ চারিটি পর্ব্বদ্বারা গঠিত অর্থাৎ ইহার চরণ চতুষ্পর্ব্বিক।

(৪) বিশেষ করিয়া এই ছন্দের পর্ব্বগুলির দৈর্ঘ্য অত্যন্ত হ্রস্ব হওয়ায় যতিগুলি অতি দ্রুত পুনরাবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ পর্ব্বগুলি অতি দ্রুতবেগে উচ্চারিত হয়। এই ছন্দের লয় দ্রুত, উচ্চারণের গতি যেন সর্পগতিবৎ চপল।

(৫) আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ছন্দের পূর্ণ পর্ব্বগুলি স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরের মিশ্রণে গঠিত এবং অক্ষরগুলিতে স্বরধ্বনিরই প্রাধান্য।

অতএব বলা যাইতে পারে, যে-ছন্দের প্রতি পর্ব্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত (স্বরাঘাত) থাকে, পূর্ণপর্ব্বগুলি চতুর্মাত্রিক হয়, সাধারণতঃ চরণ হয় চতুষ্পর্ব্বিক এবং লয় অত্যন্ত দ্রুত, তাহার নাম **ছড়ার ছন্দ**।

ছড়ার ছন্দের বিভিন্ন নাম

উপরের লক্ষণ অনুসারে এই ছন্দকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। (১) যেহেতু ইহার প্রতি পর্ব্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত (=বল) থাকে, এইজন্য ইহার নাম শ্বাসাঘাত-প্রধান বা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ

অথবা বলবৃত্ত। (২) আবার এই ছন্দের প্রতি পর্ব্বে স্বরধ্বনির প্রাধান্য হেতু ইহাকে কেহ কেহ 'স্বরবৃত্ত'ও বলিয়া থাকেন। এই ছন্দে প্রত্যেকটি স্বরই হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। (৩) অত্যন্ত দ্রুত লয়ে এই ছন্দের পর্ব্বগুলি উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে 'দ্রুত লয়ের ছন্দ'ও বলা হইয়া থাকে। (৪) ছড়ায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম 'ছড়ার ছন্দ'। একমাত্র 'স্বরবৃত্ত' বাদে প্রত্যেকটি নামই সার্থক।

ছড়ার ছন্দের উপরি উক্ত লক্ষণের ব্যতিক্রম

অবশ্য উপরি উক্ত লক্ষণগুলি যে ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য, এমন কথা বলা চলে না। প্রতি শ্বাসপর্ব্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত দেওয়াই বাঙালীর উচ্চারণরীতির বিশিষ্টতা। এই শ্বাসাঘাতের ফলে পরবর্ত্তী স্বরান্ত অক্ষর হলন্ত হইয়া যায় এবং প্রত্যেকটি স্বরই হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকা সত্ত্বেও পরের অক্ষরের স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই ছন্দের প্রতিটি পর্ব্ব সাধারণতঃ চতুর্ম্মাত্রিক, কিন্তু কোন কোন স্থলে, চারিটি অক্ষরের পরিবর্ত্তে আরও অনেক বেশি অক্ষরের শব্দ ইহার পর্ব্বে সন্নিবেশিত হয়। অতি দ্রুত উচ্চারণ করিয়া অতিরিক্ত অক্ষরগুলিকে যথাসম্ভব চতুরক্ষর (চতুর্ম্মাত্রিক) করিবার চেষ্টা করা হয়। মনে রাখিতে হইবে, যে-পর্ব্ব চতুর্ম্মাত্রার কম বা বেশি, সে-পর্ব্ব এই ছন্দের মূল পূর্ণ পর্ব্ব নয়, সেগুলি বিশেষ পর্ব্ব। নিম্নে এইরূপ বিশেষ পর্ব্বের কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল :

(১) চারের কম অক্ষরের পর্ব্ব

[ক] হস্ত সারম্ | গলা সারম্ | আর সারম্ | মুখ

পেট পিঠ | চরণ সারম্ | আর সারম্ | বুক

[খ] ছেলাম | টেম্পল্ চাচা | আচ্ছা মজা | নিলে

ভোজং দিয়ে | ভোটিং খুলে | মিউনিসিপ্যাল | বিলে

[গ] বাইরে কেবল। জলের শব্দ। ঝুপ ঝুপ। ঝুপ্

দস্যি ছেলে। গল্প শুনে। একেবারে। চুপ্

(২) **চারের বেশি মাত্রার পর্ব্ব**

[ক] (তুমি) জেলের বেটা। নওরে সাধু। জাল বেয়ে না। খাবিরে

সওদাগরের পুত্র। তুমিরে সাধু '(তুমি) বণিজ করিতে। যাবিরে

[খ] সন্ধ্যা বেলা। চান্নি উঠে। সুরুজ বৈসে। পাটে

হেন কালেতে। কন্যা তুমি। যাইও জলের। ঘাটে

ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ ও বিভিন্ন রূপকল্প:

ছড়ার ছন্দকে কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন: ইহা কেবল হাসির রচনাতেই সার্থক—ইহা কেবল লঘু-চপল ভাব প্রকাশের উপযোগী; প্রাচীনকালে গ্রাম্য ও মেয়েলী রচনায় ইহার প্রয়োগ হইত। একথা কতকাংশে সত্য। ইহার দ্বারা লঘু-চপল ভাবেরই প্রকাশ হইত। শিষ্ট কাব্যে ইহার তেমন প্রয়োগ ছিল না। কবিরা সাধারণতঃ হাসির কথা রচনা করিতে এই ছন্দ ব্যবহার করিতেন, যেমন,

(১) অঙ্গদ বলে। সত্য করে। কওরে ইন্দ্র। জিতা
এই যত সব। বসে আছে। সবাই কি তোর। পিতা (কৃত্তিবাস)

(২) আই আই। এই বুড়া কি। ওই গৌরীর। বর লো
বিয়ের বেলা। এয়োর মাঝে। হৈল দিগ। ম্বর লো (ভারতচন্দ্র)

(৩) (ও কথা) আর বোলো না। আর বোলো না। বলছ বঁধু।
কিসের ঝোঁকে
(এ বড়) হাসির কথা। হাসির কথা। হাসবে লোকে।
হাসবে লোকে (ঈশ্বর গুপ্ত)

কিন্তু এই ছন্দে যে সর্ব্বদাই লঘু-চপল ভাবই প্রকাশ করা হইত, তাহা নয়। বাঙলার ব্যবহারিক ছড়া, বাউল ও শাক্ত-সাধকদের সাধন-সঙ্গীত—এই ছন্দে ছন্দিত হইত। তাহাতে অনেক করুণ, অনেক গুরুগম্ভীর গভীর ভাবও প্রকট

হইত। বাঙালীর অন্তরের অনেক কথাই যে এই ছন্দে প্রকাশ পাইত, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা-গুলিতে তাহার নিদর্শন আছে। নিম্নে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

(১) কুড়্‌বা কুড়্‌বা | কুড়্‌বা লিজ্জ্যে
কাঠায় কুড়্‌বা | কাঠায় লিজ্জ্যে

(২) (আমার) আপন খবর | আপ্‌নার হয় না।
(একবার) আপনারে | চিনলে পরে | যায় অচে | নারে চেনা

(৩) মজিল | মন ভ্রমরা | কালীপদ | নীলকমলে
(যত) বিষয় মধু | তুচ্ছ হৈল | কামাদি কু | সুম সকলে

অবশ্য কথ্য ভাষায় এই ছন্দ রচিত হইত বলিয়া ইহা একদিন শিষ্ট কাব্যে অনাদৃত ছিল, কিন্তু ইহার প্রাণশক্তি যে কত বেশি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের নিকট তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং আধুনিক অনেক কবির রচনায় এই ছন্দের বিবিধ রূপকল্প লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

(১) **দ্বিপর্ব্বিক ছড়ার ছন্দ**

/ফিরছে তরুণ | /স্ফূর্ত্তিতে
/ডালিমফুলী | /কুর্ত্তিতে

(২) **ত্রিপর্ব্বিক ছড়ার ছন্দ**

(ক) /সন্ধ্যে হোলো | /সূর্য্য নামে | /পাটে
/এলেম যেন | /জোড়া দীঘির | /ঘাটে

(খ) /পায়ের তলায় | /নরম ঠেকল | /কি
/আস্তে একটু | /চলনা ঠাকুর | /ঝি
/ওমা, এযে | /ঝরা বকুল | /নয় ?

(৩) **চতুষ্পর্ব্বিক ছড়ার ছন্দ**

(তোমরা) দেশোদ্ধারটা | কর্ত্তে চাও কি | করে মুখে | বড়াই ?

(তোমরা) বাক্যবাণে | শুধু ফতে | কর্ত্তে চাও কি | লড়াই ?

(তা'সে) হবে কেন !

[চতুষ্পর্ব্বিক চরণ, প্রতি চরণের পূর্ব্বে একটি অতিপর্ব্বিক ধ্বনি]

(৪) **ছড়ার ছন্দের দীর্ঘ ত্রিপদী**

বাদলা যখন | পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে | ভাববি মোরে
ঝরঝরানি | গান গাব ওই | বনে

[এখানে প্রথম দুই পাদে দুইটি পর্ব্ব, তৃতীয় পাদে তিনটি পর্ব্ব]

(৫) **প্রবহমাণ ছড়ার ছন্দ**

যেদিন ওরা | গিনি দিয়ে | দেখলে কনের | মুখ
সেদিন থেকে | মঞ্জুলিকার | বুক
প্রতি পলের | গোপন কাঁটায় | হোলো রক্তে | মাখা।
মায়ের স্নেহ | অন্তর্য্যামী | তার কাছে তো | রয়না কিছুই | ঢাকা

[অসম-পর্ব্বিক চরণ : প্রথমে চার পর্ব্ব, দ্বিতীয়ে তিন, তৃতীয়ে চার, চতুর্থ চরণে পাঁচ পর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা' কাব্যে চতুষ্পর্ব্বিক ছড়ার ছন্দকে চরণ উল্লঙ্ঘন করাইয়া প্রবহমাণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই অংশে একটি করুণ ভাবের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যত্র আরও বৈচিত্র্য দেখা যায়।]

ছড়ার ছন্দে বিদেশী ছন্দ

ছড়ার ছন্দে আহত-অনাহত অক্ষর পাশাপাশি অবস্থান করে বলিয়া এই ছন্দে অনেক সময় ইংরাজি ছন্দের Trochaic metre (accented + unaccented) এবং Dactylic metre (Accented + unaccented + unaccented) অনুবাদ করা সম্ভব। অবশ্য ছড়ার ছন্দে প্রতি পর্ব্বে থাকে চার অক্ষর, ইংরেজি ছন্দে প্রতি ফুটে দুই বা তিন অক্ষরের বেশি থাকে না। তথাপি,

(1) Hope is | banished =Trochaic Dimeter

Joys are | vanished

(2) Gentle | river | Gentle | river =Trochaic Tetrameter

Lo thy | streams are | stained with | g'ore

—প্রভৃতি ছন্দের সহিত বাঙলার এই ছন্দের মিল দেখা যায়, যেমন,

যদি : বর্ষে | মাঘের : শেষ

ধন্য : রাজা | পুণ্য : দেশ

ছন্দোরাজ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরাজি ছন্দের অনুকরণে বাঙলায় ছন্দ রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু দুই ভাষার প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ায় তাহা ঠিক ইংরাজি ছন্দ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বাঙলার স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের ভিত্তিতে কাজী নজরুল ইসলাম ফারসী 'গজল' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন : কেহ কেহ এই ছন্দের আধারে 'রুবাঈ' রচনা করিয়াছেন। গজলে প্রথম চরণের শেষ অক্ষরের সহিত, প্রতি যুগ্ম চরণের শেষাক্ষরের মিল থাকে : যেমন,

(বাগিচায়) বুলবুলি তুই | ফুল শাখাতে | দিসনে আজি | **দোল**।
(আজো তার) ফুল কলিদের | ঘুম টুটেনি | তন্দ্রাতে বি | **লোল** ॥
(আজো হায়) রিক্ত শাখায় | উত্তরী বায় | ঝুরছে নিশি | দিন
(আসেনি) দখ্‌নে হাওয়া | গজল্ গাওয়া | মৌমাছি বি | **ভোল** ॥

একটি রুবাঈ :

বিনিদ্র কাল | কাটল নিশি | একলা জেগে | তোমার ব্যথায়,
অশ্রুমণির | হার গেথেছি | নয়ন পাতার | ঝালর সুতায়।
তোমার তরে | প্রাণ পোড়ানি | কইতে নারি | কারুর কাছে,
আপন মনে | তাই সারাদিন | আপন ব্যথা | কই আপনায়। (ডাঃ শহীদুল্লা)

'রুবাঈ' চারি চরণের কবিতা : তৃতীয় চরণ ভিন্ন অন্য তিন চরণের শেষে মিল থাকে। কিন্তু বাঙলায় ওমর খৈয়ামের যে রুবাঈ অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে রুবাঈ-এর মিল রক্ষা করা হয় নাই : উহা বাঙলায় চতুষ্পর্ব্বিক চরণের, চতুর্ম্মাত্রিক পর্ব্বের, প্রতি চরণের শেষে মিলযুক্ত ছড়ার ছন্দই হইয়া উঠিয়াছে, যেমন,

/ / / /
এই দুনিয়ার | উর্দ্ধে অধে | ডাইনে বায়ে | যেদিকে চাই,
/ / / /
আতসবাজির | কারসাজি সব | আর কিছু নাই | আর কিছু নাই।

[খ] গানের 'পদ' ছন্দ

(১) সোনে | ভরিতী | করুণা | নাবী =৪ মাত্রার পর্ব্ব

রূপা | থোই | মহিকে | ঠাবী

ঘুন্টি | উপাড়ি | মেলিলি | কাচ্ছি

বাহতু | কামলি | সদ্‌গুরু | পুচ্ছি

(২) মন্দির | বাহির | কঠিন ক | পাট =৪ মাত্রার পর্ব্ব

চলইতে | শঙ্কিল | পঙ্কিল | বাট

(৩) পঞ্চশরে | দগ্ধ করে | করেছ একী | সন্ন্যাসী =৫ মাত্রার পর্ব্ব

বিশ্বময় | দিয়েছে তারে | ছড়ায়ে

(৪) বর্ষণ গীত | হল মুখরিত | মেঘ মন্দ্রিত ছন্দে =৬ মাত্রার পর্ব্ব

কদম্ব বন্ | গভীর মগন্ | আনন্দ ঘন | গন্ধে

(৫) এ সখি হমারি | দুখের নাহিক | ওর =৭ মাত্রার পর্ব্ব

ই ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর

৮ মাত্রার পর্ব্ব

(৬) রে সতী রে সতী | কাঁদিল পশুপতি | বিকলিত ক্ষুব্ধ প | রাণে
ভিক্ষুক বিষধর | হরষিত অন্তর | সংসার রতি নির | বাণে

(৭) আমিআ আচ্ছন্তে | বিস গিলেসিরে | চীঅ পসর বস , অপা
ঘারে পারে | কা বুঝ ঝিলে মরে , থাইব মই দুঠ কু | গুবা

(৮) পাঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মারাঠা | দ্রাবিড় উৎকল | বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল | যমুনা গঙ্গা | উচ্ছল জলধি ত | রঙ্গ

পদ ছন্দের বৈশিষ্ট্য

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এই ছন্দের

(১) প্রতিটি পর্ব্ব স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের সংমিশ্রণে অথবা কেবল স্বরান্ত (মৌলিক কিংবা যৌগিক) অক্ষর দ্বারা গঠিত।

(২) প্রতিটি পর্ব্বের অক্ষরগুলির মধ্যে একটি বা দুইটি অক্ষরের স্বর দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত এবং উচ্চারণের রীতি ও মাত্রা গণিবার পদ্ধতি অনেকটা সংস্কৃত 'জাতি' অথবা অপভ্রংশের 'মাত্রা'ছন্দের অনুসারী।[১]

(৩) পর্ব্বগুলিতে চার, পাঁচ, ছয়, সাত অথবা আট মাত্রা থাকে; এবং এইরূপ একই মাপের পর্ব্ব একটি চরণে বারবার উচ্চারিত হইয়া ছন্দস্পন্দন সৃষ্টি করে।

(৪) এই ছন্দে দ্রুতও নয়, খুব ঢিমাও নয়, মধ্যম রকমের গতিতে পর্ব্বগুলি উচ্চারিত হয় এবং নাতি-দ্রুত-বিলম্বিত কালানন্তরে যতি পড়ে: ফলে

১ সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর (অ, ই, উ) এক মাত্রা, দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, এ, ও, ঐ, ঔ) দুই মাত্রা। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বস্বর এবং অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত স্বর এবং হলন্ত অক্ষরের স্বর দুই মাত্রা ও পাদান্তের হলন্ত অক্ষরের স্বরও দুই মাত্রা; অপভ্রংশের উচ্চারণ রীতিও প্রায় এই প্রকার, কেবল যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী বা অন্যত্রও 'এ', 'ও', একমাত্রা, পাদান্তের 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত এবং বিকল্পে পাদান্তের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ (দুই মাত্রা) এবং দীর্ঘস্বর হ্রস্ব (এক মাত্রা)। মাত্রা ছন্দে প্রতি পর্ব্বে মাত্রা স্থির করিবার এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রাচীন বাঙলা কবিতায় যথাসম্ভব রক্ষা করা হইত।

এই ছন্দের লয় 'মধ্য'। ছন্দের গতিটি যেন মরালগতির ন্যায় নাতিদ্রুত, নাতিমন্থর।

(৫) উপরন্তু এই ছন্দের প্রতি পর্ব্বে অক্ষরগুলি দুর্ব্বল ভঙ্গিতে উচ্চারিত হওয়ায়, অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি পর্ব্বেই হলন্ত অথবা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হওয়ায়, পর্ব্বমধ্যে তথা সমগ্র চরণে একটি গতি-মন্থর সুর বা ধ্বনি সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ধ্বনি এই ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অতএব বলা চলে, যে-ছন্দের উচ্চারণরীতি ও মাত্রা গণনার পদ্ধতি প্রাচীন ছন্দের অনুসারী, যে-ছন্দের পূর্ণ পর্ব্ব এই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আট মাত্রা'র অক্ষর লইয়া গঠিত, যে ছন্দের পর্ব্বগতি নাতিদ্রুত ও নাতিমন্থর অর্থাৎ মধ্যম, এবং যাহাতে দুর্ব্বল উচ্চারণভঙ্গিজনিত, অর্থাৎ হলন্ত ও যৌগিক অক্ষরের স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ বশতঃ একটি ধ্বনির সৃষ্টি হয়—তাহাকে 'পদ ছন্দ' বলা হয়।

পদছন্দের বিভিন্ন নাম

ছন্দের উপরিউক্ত লক্ষণগুলি বিচার করিয়া, পদছন্দকে বিভিন্ন নামে অভি-হিত করা হইয়া থাকে। (১) এই ছন্দে প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাত্রা গণনা করা হয়, সেইজন্য ইহার একনাম 'মাত্রাবৃত্ত'। ইহা সংস্কৃত ও অপভ্রংশের মাত্রাছন্দের অনুকরণেই রচিত; ইহা বাঙলার তৎসমছন্দ। অতএব ইহার 'মাত্রাবৃত্ত' নামটি সমর্থনযোগ্য। (২) ইহাকে মধ্যলয়ের ছন্দও বলা হয়, কারণ এই ছন্দের গতি হংসগতিবৎ নাতিদ্রুত, নাতিমন্থর। অমূল্যধন বাবু ইহাকে 'বিলম্বিত লয়ের ছন্দ' বলিয়াছেন। তিনি মনে করেন, এই ছন্দের প্রতি পর্ব্বেই একটি দুইটি স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হয়, ফলে ইহার গতি ও লয় হয় বিলম্বিত। যেখানে পর্ব্বের দৈর্ঘ্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট, সেখানে পর্ব্বস্থ মাত্রার সংখ্যা কম থাকিলে, কোন কোন স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া মাত্রাসংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবেই। এই দীর্ঘীকরণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট লয়ের তারতম্য হইতে পারে না এবং নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বদৈর্ঘ্যও দীর্ঘতর হয় না। অতএব উক্ত কারণে ইহার লয়কে বিলম্বিত বলা অসমীচীন। মাত্রাছন্দের উচ্চারণগতি ছড়ার ছন্দের মত অতি দ্রুতও নয়, আবার পয়ার ছন্দের মত অতিমন্থরও নয়; ইহার গতি মৃদুমন্দ। অতএব ইহাকে মধ্য লয়ের ছন্দ বলাই সঙ্গত। (৩) তৃতীয়তঃ এই ছন্দে দুর্ব্বল ভঙ্গিতে ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ হলন্ত অক্ষর এবং যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত

হয় বলিয়া, উচ্চারণে একটি গীত-ধ্বনির সৃষ্টি হয়; এই ধ্বনির প্রাধান্যহেতু ইহাকে'ধ্বনি-প্রধান ছন্দ' নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। মধ্যম ধরণের লয় এবং পর্ব্বস্থ মাত্রার অপূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য স্বরের দীর্ঘায়ত উচ্চারণজনিত একটা গীতধ্বনি এই ছন্দের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। অতএব ইহার 'ধ্বনি-প্রধান ছন্দ' নামটিও সার্থক।

মাত্রাছন্দে নির্দ্দিষ্ট মাত্রাপদ্ধতির ব্যতিক্রম

কিন্তু 'মাত্রা' নির্ণয় প্রসঙ্গে এই ছন্দ যে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাহা যে সর্ব্বথা সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী তাহা বলা চলে না। সংস্কৃতে 'এ, ও' দীর্ঘস্বর -দুই মাত্রা। পাদান্তের হ্রস্বস্বর—দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রা। কিন্তু প্রাকৃত অপভ্রংশে এই নিয়মের শিথিলতা দেখা যায। অপভ্রংশে 'এ, ও' প্রায় সর্ব্বত্রই হ্রস্ব, পাদান্তের দীর্ঘস্বর বিকল্পে এক মাত্রা, হ্রস্বস্বর দুই মাত্রা। প্রাকৃত-অপভ্রংশে এ নিয়মও ছিল,—'দীহো বিঅ বণ্ণো লহু জীহা পঢ়ই, হোই সে বি লহু'। বাঙলা ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের শিথিলতা আরও বেশি করিয়া দেখা দিযাছিল: এই জন্য দেখা যায, চর্য্যাপদে ও ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী মাত্রাবৃত্তের ঢঙ অনুসরণ করিলেও হ্রস্বস্বর কোথাও দীর্ঘ, দীর্ঘ কোথাও হ্রস্ব হইয়া উচ্চারিত হইতেছে। যেমন,

(১) এক স ডু লী | সরুই নাল |

('ডু' 'ই' হ্রস্ব হইযাও দীর্ঘ)

(২) জে জে আ ই লা | তে তে গে লা

অবণাগবণে কাহ্নু | বিমনা ভইলা

(প্রথম 'জে' 'তে,' শেষের 'লা' দীর্ঘ, দ্বিতীয় চরণে 'ণা', 'ণে', 'ক' হ্রস্ব।

(৩) ই ভ রা বা দ র | মা হ ভা দ র | শূ ন্য ম ন্দি র | মো র

(ভরা-র 'রা' হ্রস্ব, কিন্তু বাদর-এর 'বা' দীর্ঘ)

তথাপি চর্য্যাপদে ও ব্রজবুলিতে নির্দ্দিষ্ট মাত্রার প্রতি আনুগত্য আছে; বিশেষ করিয়া হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর সর্ব্বত্রই দীর্ঘ। আধুনিক

বাঙলা মাত্রাবৃত্তে—একমাত্র হলন্ত ও যৌগিক অক্ষরের স্বরের উচ্চারণ-দীর্ঘতা অর্থাৎ দ্বিমাত্রিকতা রক্ষিত হয়, অন্যান্য স্বর (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা) হ্রস্ব অর্থাৎ এক মাত্রার : বাঙলা উচ্চারণে 'ঈ' 'ঊ'-এর দীর্ঘত্ব কোথাও রক্ষা করা হয় না। অতএব আধুনিক বাঙলা ভাষার মাত্রাবৃত্তে, প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রা-নিষ্ঠা কেবলমাত্র হলন্ত ও যৌগিক অক্ষরের স্বরের উচ্চারণে। বর্ত্তমানে মাত্রাবৃত্তের প্রায় প্রতি পর্ব্বে হলন্ত ও যৌগিক অক্ষরের এই দীর্ঘীকরণ লক্ষণীয় :

। । ॥ । । । । । । ॥ ॥ ।
(১) পাষাণের | স্নেহধারা | তুষারের | বিন্দু

। । । । । । ॥ । । ॥ ॥ ।
ডাকে তোরে | চিতলোল্ | উতরোল্ | সিন্ধু

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ ।
মেঘ হানে | জুঁইফুলী | বৃষ্টি ও | অঙ্গে

। । । । ॥ । । । । । ॥ ।
চুমা চুম | কির্ হারে | চাঁদ ঘেরে | রঙ্গে

। । । । ॥ । । ॥ । । ॥ ।
ধূলা ভরা | দ্যায় ধরা | তোর লাগি | ধর্ণা

॥ ।
ঝর্ণা

৪ মাত্রার পর্ব্ব : অন্যান্য সব স্বর এক মাত্রিক, কেবল হলন্ত ও যৌগিক অক্ষরের স্বর দুই মাত্রার।

॥ । ॥ ॥ । । । ॥ । ॥ ॥ । ॥
(২) নন্দপুর | চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন্ | অন্ধকার

। । । ॥ । । । ॥ । । । । । ॥ । ॥
চলে না চল্ | মলয়ানিল্ | বহিয়া ফুল | গন্ধভার

পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব, প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ (=দুই মাত্রার)

॥ । । ॥ । । ॥ । । । । ।
(৩) ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে

। । ॥ । । । । ॥ । । । । ।
জল সঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে

৬ মাত্রার পর্ব্ব : প্রতিটি যৌগিক ও হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ।

কিন্তু সঙ্গীতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে : বাঙলার প্রাচীন গানে তো বটেই আধুনিক গানেও 'আ' 'ঈ' 'ঊ' 'এ' এবং 'ও' প্রায়ই দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রার হয়, যেমন,

। । । । । । ॥ । । ॥ ॥ । । । । ॥ । ।
(১) সজনি সজনি | রাধিকা লো | দেখ অবহুঁ | চাহিয়া

। । । । । । ॥ । ॥ । । । । ॥ । ॥ । ।
মৃদুল গমন | শ্যাম আওয়ে | মৃদুল গান | গাহিয়া

৬ মাত্রার পর্ব্ব

(২) নীল সিন্ধু জল ¦ ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল
অম্বর চুম্বিত | ভাল হিমাচল } ৮ মাত্রার পর্ব্ব

* (৩) পীযূষ-সিঞ্চিত | সমীর-চঞ্চল | কাঞ্চন-অঞ্চলে | দোলেরে...
মাতিল ত্রিভুবন | বাক্য বিধায়িনী | বাণী জয়রব | বোলেরে

মাত্রাছন্দের বিবিধ রূপ-কল্প

আমরা বলিয়াছি বাঙলা পদছন্দ বা মাত্রাছন্দই তৎসম ছন্দ। ইহা এক প্রকার আভাঙ্গা সংস্কৃত 'বৃত্ত' ও 'জাতি' এবং অপভ্রংশের 'মাত্রাছন্দ'। অতএব সংস্কৃত ও অপভ্রংশের ছন্দে যে সকল ছন্দ বাঙলায় রচিত হইয়াছে, তাহা এই পদছন্দেরই অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই ছন্দের নিম্নলিখিত রূপগুলি বাঙলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে :-

সংস্কৃত ছন্দ

ভুজঙ্গপ্রয়াত—এই ছন্দে প্রতি চরণে ১২টি অক্ষর থাকে।
'লঘু+গুরু+গুরু' এই ক্রমে তিনটি করিয়া অক্ষর চারবার পুনরাবর্ত্তিত হয়। প্রতি চরণের মাত্রাসংখ্যা ২০। যথা,—

ভুজঙ্গ প্রযাতে কহে ভারতী দে
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে (ভারতচন্দ্র)

তোটক—এই ছন্দেরও প্রতি চরণে ১২টি অক্ষর থাকে। ইহাতে 'লঘু+লঘু+গুরু' —এই ক্রমে তিনটি করিয়া অক্ষর চারবার পুনরাবৃত্ত হয়। প্রতি চরণের মাত্রাসংখ্যা ১৬। যথা,—

বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া

।। ॥।। ॥।। ॥ ।। ॥
গুণ সাগর নাগর আগর হে
।।॥ ।।॥ ।।॥ ।। ॥
নট না কর না কর না কর হে (ভারতচন্দ্র)

তূণক ঃ—ইহাতে প্রত্যেক চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে। এই ছন্দে অক্ষরগুলি 'গুরু+লঘু+গুরু' এবং 'লঘু+গুরু+লঘু'—এই ক্রমে দুইবার আবর্ত্তিত হয় এবং শেষে 'গুরু+লঘু+গুরু' অক্ষরের সমাবেশ থাকে। অক্ষরগুলি সাজাইলে গুরু+লঘু—ক্রমে ইহারা সাতবার পুনরাবর্ত্তিত হয় এবং শেষের অক্ষরটি গুরু হয়। ইহাতে প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা থাকে ২৩। প্রতি যুগ্ম অক্ষরের পর বিরাম নেওয়া যায় বলিয়া ছন্দটি শ্রুতিমধুর। যথা,

॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ।॥। ॥ ।॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে
॥। ॥। ॥।॥।॥। ॥।॥ ।॥
ভারতের তূণকের ছন্দো বন্ধ বাড়িছে (ভারতচন্দ্র)

রুচিরা ঃ—এই ছন্দে ১৩টি অক্ষর থাকে। প্রতি চরণে অক্ষরগুলি 'লঘু+গুরু+লঘু' + 'গুরু+লঘু+লঘু'+ 'লঘু+লঘু+গুরু'+'লঘু+গুরু+লঘু'+গুরু—এই ক্রমে সাজানো থাকে। ইহাতে চতুর্থ ও ত্রয়োদশ অক্ষরের পরে যতি সন্নিবেশিত হয়। ইহার মোট মাত্রা সংখ্যা ১৮। যথা,

। ॥ । ॥ ।।।। ।॥ । ॥ ।॥
তখন কাহার আঁচলে গোপন যুথীর মালা
। ॥ । ॥ ।।।। ॥ । ॥ । ॥
মধুর মধুর ছড়াইত বাস কে সেই বালা? (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

মালিনী ঃ—এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে, অক্ষরগুলি গণানুসারে 'লঘু+লঘু+লঘু' ২ বার+'গুরু+গুরু+গুরু'+('লঘু+গুরু+গুরু') ২ বার—এই ক্রমে সাজানো থাকে। অষ্টম ও পঞ্চদশ অক্ষরের পরে যতি বসে। ইহার প্রতি চরণের মাত্রা সংখ্যা ২২। যথা,

।। ।। ।। ॥ ॥ ॥।॥ ॥। ॥ ॥
উড়ে চলে গেছে বুলবুল। শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর।
।। ।।। ।॥ ॥ ॥। ॥ ॥। ॥ ॥
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন। যৌবনের জীর্ণ নির্ভর। (সত্যেন্দ্রনাথ)

পঞ্চচামর ঃ—এই ছন্দে প্রতি চরণে ১৬টি অক্ষর থাকে, অক্ষরগুলি 'লঘু+গুরু+লঘু'+'গুরু+লঘু+গুরু'+লঘু+গুরু—এই ক্রমে দুইবার

আবৃত্ত হয় এবং অষ্টমে ও ষোড়শে যতি সন্নিবেশিত হয়। ইহাতে প্রতি চরণের মাত্রাসংখ্যা—২৪। অক্ষরগুলি পর পর সাজাইলে 'লঘু+গুরু' ক্রমে আটবার আবৃত্ত হয়। যথা,

। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥
মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর। বরণ তোমার তমঃ শ্যামল।

। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥
মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক। শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

(সত্যেন্দ্রনাথ)

মন্দাক্রান্তা ঃ—ইহার প্রত্যেক চরণের অক্ষরসংখ্যা ১৭; অক্ষরগুলি 'গুরু+গুরু+লঘু' + 'গুরু+লঘু+লঘু' + 'লঘু+লঘু+লঘু' +গুরু+ গুরু+(লঘু+গুরু+গুরু) ২ বার--এই ক্রমানুসাবে বিন্যস্ত হয়। ইহাতে চতুর্থ, দশম ও সপ্তদশ অক্ষরের পরে যতি থাকে প্রতি চরণেব মাত্রা সংখ্যা ২৬। কালিদাসের বিখ্যাত মেঘদূত কাব্য এই ছন্দে বচিত ঃ--

॥ ॥ । ॥ । । । । । । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥
পিঙ্গল বিহ্বল। ব্যথিত নভতল। কই গো কই মেঘ উদয় হও।

॥ ॥ । ॥ । । । । । । ॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥
সন্ধ্যায় তন্দ্রার। মূরতি ধরি আজ। মন্দ মন্থর বচন কও। (সত্যেন্দ্রনাথ)

বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই সকল অনুকবণ তেমন সার্থক হয় নাই। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত উচ্চারণ রীতিব অনুসবণে ভুজঙ্গ প্রয়াত, তোটক, তূণক ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং সকল অক্ষবকেই স্বরান্ত ধরিয়াছেন। তাহাতে বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণরীতি ক্ষুণ্ণ হইযাছে। সংস্কৃত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে, ভুজঙ্গ প্রয়াতের উচ্চারণ হইবে—'ভুজঙ্গ—প্রযাতে—কহেভা—রতীদে' এবং তোটক ছন্দটিও অনুরূপ উচ্চারণে বিশ্রী শুনাইবে, এই জন্য ভারতচন্দ্র পয়ার ছন্দের যতি পদ্ধতির আধারেই ছন্দগুলি রচনা করিযাছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্কৃত ছন্দগুলি বাঙলা উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বচিত; তিনি শব্দান্তের হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রার ধবিয়া, অন্যান্য অক্ষরকে লঘু অর্থাৎ হ্রস্ব ধরিয়াছেন। তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণ রীতি ক্ষুণ্ণ হইলেও ছন্দগুলি মোটামুটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

অপভ্রংশ ছন্দ ঃ—সংস্কৃত ছন্দ হইতেও যেমন, তেমনই অপভ্রংশের কতিপয় ছন্দেরও অবিকল দৃষ্টান্ত বাঙলায় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মাত্রাছন্দ প্রাকৃত-

অপভ্রংশেরই সম্পদ। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, সংস্কৃতে যে মাত্রাছন্দ দেখা যায়, তাহা প্রাকৃত হইতেই গৃহীত। গাহা (<গাথা) নামক মাত্রাবৃত্তা আর্যা ছন্দটি প্রাকৃতের প্রধান ছন্দ। অপভ্রংশে কিন্তু ছন্দের সংখ্যা অনেক বেশি। এই ছন্দগুলি অধিকাংশই চতুষ্পদী বা চউপঈ। অধিকাংশ ছন্দেরই প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে মিল থাকায় ছন্দগুলি দুই দ্বিপদার সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। অপভ্রংশের প্রধান প্রধান ছন্দ এই ধরণের দ্বিপদা। এই ছন্দগুলির মধ্যে বাঙলা মাত্রাছন্দে, 'পাদাকুলক' (ইহা সংস্কৃত জাতিছন্দ 'পজ্ঝটিকা'র অনুরূপ), 'অতিশক্করী' এবং 'ঝল্লণা' এই কয়েকটি ছন্দের হুবহু অনুবৃত্তি দেখা যায়। পাদাকুলক ও ঝল্লণা ছন্দ দুইটিকে যথাক্রমে বাঙলার প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের মূল বলিয়া মনে হয়। আমরা প্রয়োজনবোধে এই ছন্দগুলির আকৃতি লইয়া আলোচনা করিতেছি, উদাহরণ বাঙলা সাহিত্য হইতেই দেওয়া যাইতেছে।

পাদাকুলক ঃ—ইহা চতুষ্পদী ছন্দ। প্রতি পাদে ষোলটি করিয়া মাত্রা, অষ্টম ও ষোড়শ অক্ষরের পর যতি। প্রতি দুই পাদ বা চরণের অন্তে মিল। এই ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের বন্ধনও অনেকটা শিথিল। প্রাকৃত পৈঙ্গলে এই ছন্দ সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

লহু গুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা।
পঅ পঅ লেক্‌খহি উত্তম রেহা॥
সুকই ফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং।
সোলহ মত্তা পাআকুলঅং॥

সংস্কৃতের জাতি ছন্দের অন্তর্গত 'পজ্ঝটিকা' ছন্দটিও পাদাকুলকের মত। 'পজ্ঝটিকা'—'প্রতিপদ যমকিত ষোড়শমাত্রা'—ইহা ষোড়শমাত্রার ছন্দ, ইহার চরণের প্রতি যুগ্মমাত্রায় যতি থাকে এবং প্রতি পাদান্তে মিল থাকে। বাঙলায় প্রাচীন কাল হইতেই এই ছন্দ দুইটির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে ঃ—

॥ ॥ । । । । ॥ । । । ॥ ॥
(১) কায়া তরুবর | পঞ্চবি ডাল

॥ । । ॥ ॥ । । ॥ ॥ ॥
চঞ্চল | চীএ | পইঠো কাল

। । । । । । । ॥ । । । । । ॥ ॥
দিঠ করিঅ মহা | সুহ পরিমাণ

। । । । । । । ॥ ॥ । । । ॥ ॥
লুই ভণই গুরু | পুচ্ছিঅ জাণ

| | | | | | | | | | | | || | | | || |
(২) আজু হাম কি পেখনু | নবদ্বীপ চন্দ।
| | | || | | ||| | | | | | ||| |
করতলে করই | বয়ন অবলম্ব ॥

| | | | | | || | | | | | || |
(৩) যাঁহা পহুঁ অরুণ | চরণে চলি যাত।
| | | | | | || | | | | | || |
তাঁহা তাঁহা ধরণী | হইযে মঝু গাত ॥

অতিশকরী ঃ—এই ছন্দে প্রতিপাদে পনেরটি মাত্রা থাকে। অষ্টমে ও পঞ্চদশে যতি। মনে হয়, শেষ পর্ব্বে পাদাকুলকের এক মাত্রা কমিয়া অতিশকরীর উৎপত্তি হইয়াছে : টানিয়া পড়িলে ইহা প্রায় পাদাকুলক ছন্দই হইয়া দাঁড়ায় : যেমন,

|| | | | | | | || | | || |
(১) হাথক দরপণ | মাথক ফুল
| | | | || | | | | | || | |
নয়নক অঞ্জন | মুথক তাম্বুল
| | | | | | | | || | | || |
হৃদয়ক মৃগমদ | গীমক হার
|| | | | | | | || | | || |
দেহক সরবস | গেহক সার

| | | | || | | || || | ||
(২) কি কহব রে সখি | আনন্দ ওর
| | | | || | | || | || ||
চিরদিন মাধব | মন্দিরে মোর

ঝুল্লণা ঃ—এই ছন্দও দুই চরণের সমষ্টি। ইহার প্রতিটি চরণে ৩৭ মাত্রা থাকে—দশমে, বিংশতি মাত্রার পরে এবং চরণের শেষে যতি থাকে। অর্থাৎ ইহা এক প্রকারের ত্রিপদী ছন্দ : প্রতি চরণ ১০ + ১০ + ১৭ মাত্রায় বিভক্ত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে এই ছন্দ সম্পর্কে বলা হইয়াছে :—

| | | | | || | || | | | | | || | ||
পঢ়ম দহ দিজ্জিআ পুণবি তহ কিজ্জিআ
| | | | | | || | | | | | | || ||
পুণবি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।

এই ছন্দের অনুকরণ দেখা যায় চর্য্যাগীতিকায়। অবশ্য তথায় কোথায়ও কোথায়ও প্রতিপদের দুই-একটি মাত্রা ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে : যেমন,

|| || | | | | || | | || ||
নানা তরুবর মোউলিল রে
| | | | || ||| || ||
গঅণত লাগেলী ডালী।

। । ॥ । । ॥ । । । ॥ । ॥
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই
॥ । ॥ । । ॥ । ॥ ॥
ক র্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী ॥

ব্রজবুলিতে পাওয়া যায়,—

॥ । । । ॥ । ॥ । । । । । ॥ । ॥
তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে
॥ । । । । । । । । । ॥ ॥
মেঘরুচি বসন পরিধানা

রবীন্দ্রনাথের

'পঞ্চশরে দগ্ধ করে | করেছ একি সন্ন্যাসী | বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে' —ছন্দটির মধ্যেও এই ঝল্লণার ছাঁচ আসে। মনে হয় বাঙলার নাচাড়ী ছন্দ এই ঝল্লণার তদ্ভব রূপ।

মাত্রাছন্দের প্রবহমাণতা

যে ছন্দে হৃদযভাব ধ্বনিপ্রবাহের বিরতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অনেক দুব পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, অর্থাৎ ছন্দের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে চরণের পর চরণ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে, তাহাকেই প্রবহমাণ ছন্দ বলা চলে। পয়ার ছন্দে এই প্রবহমাণতা আনিয়াছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার পরে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ ছড়ার ছন্দেও প্রবহমাণতা সঞ্চার করেন। মাত্রাছন্দেও যে ভাবের স্বাধীন গতি অব্যাহত রাখা চলে, রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ক্ষণিকা,' 'সাগরিকা'য় মাত্রাছন্দের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণ নানাভাবে বিন্যাস করিয়া তিনি এই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন বাঙলাতেও মাত্রাছন্দের কিছুটা প্রবহমাণতা বর্ত্তমান ছিল ; চার মাত্রার পর্ব্বকে আট মাত্রার করিয়া অথবা ছয় মাত্রার পর্ব্বকে বার মাত্রার করিয়া ভাবানুযায়ী ছন্দকে অগ্রসর করানো হইত। যেমন,

(১) কণ্টক : গাড়ি ক | মল সম : পদতল
মঞ্জীর : চীরহি | ঝাঁপি,
গাগরি : বারি | ঢারি করি : পীছল
চলতহি : অঙ্গুলি | চাপি।

[এ ছন্দটি, চারি মাত্রার অতি ছোট ছোট পর্ব্ব লইয়া, আট মাত্রার পরে যতি রাখিয়া ত্রিপদী ছন্দোরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।]

(২) মঞ্জু : বিকচ : কুসুম : পুঞ্জ
মধুপ : শব্দ : গঞ্জি : গুঞ্জ
কুঞ্জ : র গতি : গঞ্জি : গমন
মঞ্জু : ল কুল : নারী

[এখানে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা আরও কম, অর্থাৎ তিন ; ৩ × ৪ = ১২ মাত্রার পর যতি রাখিয়া ইহাকে চৌপদীর রূপ দেওয়া হইয়াছে]

রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে। এখানে ছন্দের প্রবহমাণতা প্রাচীন ছন্দের অনুসারী। ইহা হইতে অধিক বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শন করিয়াছেন পরবর্ত্তী কবিতাবলীতে। চরণের ভাব-গতিকে অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি এই ছন্দে অত্যাশ্চর্য্য বহমানতা সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন,

(১) দেখিনু তারে | উপমা নাহি | জানি,
ঘুমের দেশে | স্বপন এক | খানি,
পালঙ্কেতে | মগন রাজ | বালা
আপনভরা | লাবণ্যে নি | রালা (সোনার তরী)

[পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব, শেষের পর্ব্বটি খণ্ডিত ; অর্থের প্রবহমাণতা অক্ষুণ্ণ।]

(২) শতেক যুগের | কবিদল মিলি | আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে | মত্ত মদির | বাতাসে
শতেক যুগের | গীতিকা। (কল্পনা)

[ছয় মাত্রার পর্ব্ব, শেষেরটি খণ্ডিত, এখানেও প্রবহমাণতা অব্যাহত।]

(৩) সমুখে রাখিয়া | স্বর্ণ-মুকুর |
বাঁধিতেছিল সে | দীর্ঘ চিকুর |
আঁকিতেছিল সে | যত্নে সিঁদুর |
সিঁথির সীমার | পরে। (কথা)

এখানে অর্থ-প্রবাহ তো নয়ই, ধ্বনি-প্রবাহও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চরণের শেষে যদি খণ্ডপর্ব্ব না থাকে, তবে ধ্বনির প্রবহমাণতাও অব্যাহত থাকে। যেমন,

(৪) যারা আসে যায় | হাসে আর চায় |
পশ্চাতে যারা | ফিরে না তাকায় |
নেচে ছুটে ধায় | কথা না শুধায় | ফুটে আর টুটে | পলকে,
তাহাদেরি গান | গারে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে। (ক্ষণিকা)

রবীন্দ্রনাথ মাত্রাছন্দকে আরও প্রবহমাণ করিয়া তুলিয়াছেন 'সাগরিকা' কবিতায়। যেমন,

(৫) হেরিনু রাতে | উতল উৎ | সবে
তরল কল | রবে
আলোর নাচ | নাচায় চাঁদ | সাগর জলে | যবে
নীরব তব | নম্র নত | মুখে,
আমারি আঁকা | পত্রলেখা | আমারি মালা | বুকে

[গ] পয়ার ছন্দ

(১) বিলাপ করেন রাম | লক্ষণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা | সদা মনে জাগে॥

(৮+৬=১৪ অক্ষর, ১৪ মাত্রা; দুই চরণের শেষে মিল। ইহাই প্রচলিত পয়ার)

(২) উ-শব্দে বুঝহ শিব | মা শব্দে শ্রী তার
বুঝিয়া মেনকা উমা | নাম কৈল সার

(৩) এই গীতি পথপ্রান্তে | হে মানব তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি | নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে

(৮+১০=১৮ অক্ষর, ১৮ মাত্রা; দুই চরণের শেষে মিল। ইহাকে মহা পয়ার বলে।)

(৪) জিনি শতদল | বদন কমল | অধর বন্ধুক ভোর
পরিহরি ব্রীড়া | করে কত ক্রীড়া | নয়ন খঞ্জন জোর
(৬+৬+৮=২০ অক্ষর, ২০ মাত্রা; সরল ত্রিপদী পয়ার)

(৫) কৃষ্ণকরপদতল | কোটিচন্দ্র সুশীতল |
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি
তার স্পর্শ নাহি যার। যাউ সেই ছারখার
সেই বপু লোহসম জানি
(৮+৮+১০=২৬ অক্ষর, ২৬ মাত্রা, দীর্ঘ ত্রিপদী বা নাচাড়ী)

(৬) জগতের তুমি | জীবিত রূপিণী |

জগতের হিতে | সতত রতা

পুণ্য তপোবন | সরলা হরিণী |

বিজন কানন | কুসুম লতা

(৬+৬+৬+৫=২৩ অক্ষর, ২৩ মাত্রা লঘু চৌপদী ছন্দ)

(৭) ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে | ঘেরে ঘেরে শোক করে |

অরণ্য পূরিল তার | কাতর ক্রন্দনে

(৮+৮+৮+৬=৩০ অক্ষর, ৩০ মাত্রা, দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ)

(৮) একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে |

কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা | আঁধার কুটীরে নীরবে।

(৮+৬=১৪ অক্ষর ও ১৪ মাত্রার আধারে রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ)

[উপরের '‿' চিহ্নিত অক্ষরগুলিতে প্রাণ অক্ষর আছে দুইটি, মাত্রাও দুইটি]

পয়ার ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ

উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে পয়ার ছন্দের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে :

(১) বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গি [১] অনুসারে এই ছন্দ রচিত।

(২) স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী ইহার প্রতিটি পর্ব্বের সমস্ত অক্ষরের স্বরের দৈর্ঘ্য এক মাত্রা, কেবল একাক্ষর শব্দের এবং শব্দান্তের হলন্ত অক্ষরেব উচ্চারণ দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রা। (যেমন, ১নং উদাহরণের 'লাপ্', 'রেন্', 'রাম্', 'পের্',—প্রত্যেকটিতে দুইটি অক্ষর, দুই মাত্রা)

১ স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গি বলিতে—(i) প্রতি শ্বাস পর্ব্বের আদি অক্ষরে একটু ঝোঁক দেওয়া, (ii) তাহার ফলে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ এবং স্বরান্ত অক্ষরের হলন্ত অক্ষরে পরিণতি, (iii) সেই লুপ্ত অ-কারান্ত অর্থাৎ শব্দান্তের হলন্ত অক্ষরটিকে দুই অক্ষরের অর্থাৎ দুই মাত্রার করিয়া উচ্চারণ করা, (iv) একাক্ষরী যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরকে টানিয়া দুই অক্ষরের (দুই মাত্রার) করিয়া উচ্চারণ করা এবং (v) অন্যান্য প্রত্যেকটি অক্ষরকে যৌগিক স্বরান্ত বা হলন্ত, লঘু বা গুরু, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নির্ব্বিশেষে এক মাত্রা হিসাবে ধরা—এইগুলি বুঝায়।

(৩) এই ছন্দের পর্ব্বগুলি ছয়, আট বা দশ মাত্রার শব্দ বা অক্ষর লইয়া গঠিত এবং অন্যান্য ছন্দের তুলনায় ঈষৎ দীর্ঘ।

(৪) এই ছন্দে যতি কখনও বিজোড় মাত্রার পরে অবস্থান করে না, একেবারে অল্পসংখ্যক মাত্রার পরেও যতি বসে না। ছয়, আট বা দশ মাত্রার পর পর যতির অবস্থান: এইজন্য পর্ব্বোচ্চারণের গতি ধীর অর্থাৎ বিলম্বিত। ইহার গতিকে 'গতি জিনি গজরাজ' বলা চলে। গজেন্দ্রের মতই ভারিক্কি চলন: দীর্ঘ, ধীর অথচ সলীল পদবিক্ষেপ। তাই ইহার 'লয়' বিলম্বিত।

(৫) এই ছন্দের প্রতি চরণ, দুই, তিন অথবা চারিটি পর্ব্ব লইয়া গঠিত হয়। পর্ব্বগুলিকে বলা হয় 'পদ'। 'পদ'-এর সংখ্যানুসারে ইহার এক একটি রূপ-কল্পের নাম হয়—পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি। প্রতি চরণের অন্তে মিল থাকে। চরণ-গঠনের এই রীতি অন্যান্য ছন্দেও দেখা যায়।

(৬) সর্ব্বোপরি পয়ার ছন্দে সমগ্র চরণ ব্যাপিয়া একটি সুরের টান থাকে। অক্ষরধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া এই টানটি প্রধান হইয়া উঠে। অমূল্যধন বাবু ইহাকে বলিয়াছেন 'তান' (Vocal drawl) ; এই 'তান' এই ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ।

(৭) আর একটি লক্ষণ গৌণ হইলেও, এই ছন্দ সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান। পদান্তের হল্ বর্ণ বাঙলায় হসন্ত দিয়া লেখা হয় না: ফলে এই হল্ বর্ণকে অকারান্ত অক্ষরের মতই মনে হয়। হসন্তবিহীন এই হল্ বর্ণটিকে একটি 'অক্ষর' (Syllable) বলিয়া মনে করিলে, এই ছন্দে প্রতিটি দৃষ্টিগ্রাহ্য সংযুক্ত বা বিযুক্ত বর্ণ এক একটি অক্ষর হইয়া দাঁড়ায়। দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণ ও শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষর যেন এখানে হরিহরাত্মা হইয়া যায়। যেমন ১নং দৃষ্টান্তে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর আছে দশটি, 'বি-লাপ-ক-রেন-রাম-ল-ক্ষ-ণের-আ-গে' ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'লাপ', 'রেন', 'রাম', 'ণের'—প্রভৃতি অক্ষরে দুইটি করিয়া শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষর বর্ত্তমান, অতএব অক্ষর সংখ্যা ১৪টি। উচ্চারণকালে এই চৌদ্দ অক্ষরের সংখ্যা ধরা পড়ে। কিন্তু উচ্চারণ না করিয়া, উক্ত চরণের সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত বর্ণগুলি গণিয়া গেলেও উক্ত অক্ষরসংখ্যার সহিত মিলিয়া যাইবে, যেমন, 'বি-লা-প-ক-রে-ন-রা-ম-ল-ক্ষ-ণে-র-আ-গে' (=১৪)। পয়ার ছন্দে বর্ণ গণিয়া, প্রতি পর্ব্বে তথা প্রতি চরণে কতগুলি অক্ষর বা মাত্রা আছে, তাহা নিরূপণ করা যায়।

এই সকল লক্ষণ বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে, যে-ছন্দের পর্ব্বোচ্চারণ ভঙ্গি সাধারণ গদ্যের মত, যাহাতে একাক্ষরী শব্দ ও শব্দান্তের হলন্ত অক্ষরের স্বরগুলি সবই দীর্ঘ এবং অন্যান্য সব অক্ষর একমাত্রিক, যাহার পর্ব্বগুলি তুলনায় ঈষৎ দীর্ঘ অর্থাৎ ছয়, আট বা দশ মাত্রার অক্ষর লইয়া গঠিত, (যাহাতে পর্ব্বের অক্ষরের সংখ্যা, বর্ণসংখ্যা দেখিয়াই নির্ণয় করা সম্ভব) ও বিলম্বিত লয়ে উচ্চারিত এবং সর্ব্বোপরি যে-ছন্দের সমগ্র চরণে একটি সুরের টান বর্ত্তমান, তাহাই পয়ার ছন্দ।

পয়ার ছন্দের বিভিন্ন নাম

উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিচার করিয়া এই ছন্দের নানারূপ নাম নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে (১) বিলম্বিত লয়ের ছন্দ (২) তান-প্রধান ছন্দ (৩) অক্ষরবৃত্ত ও (৪) পয়ার নামগুলিই প্রধান এবং এই ছন্দের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

(১) **বিলম্বিত লয়ের ছন্দ** :—পয়ার ছন্দের পর্ব্ব-দৈর্ঘ্য অন্যান্য ছন্দের তুলনায় দীর্ঘতর। যতিগুলিও ছয়, আট বা দশ অক্ষর বা মাত্রার পরে পরে অবস্থিত হয়। ইহার ফলে যতি-খণ্ডিত ধ্বনিগুচ্ছের উচ্চারণ-গতি স্বভাবতই মন্থর হইয়া থাকে : 'জিনিয়া মাতঙ্গ গতি'—ইহাব গমনভঙ্গি। কাজেই ইহার লয় বিলম্বিত। ইহা 'বিলম্বিত লয়'-এর ছন্দ। ছন্দের গতিপরিমাণের দিক হইতে এই নামটি সার্থক। অমূল্যধন বাবু ইহাকে 'ধীর লয়'-এর ছন্দ বলিয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে 'ধীর' ও 'বিলম্বিত' একার্থবোধক শব্দ। কিন্তু অমূল্যধন বাবু 'ধীর' ও 'বিলম্বিত' শব্দ দুইটিকে ভিন্নার্থক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'মাত্রাছন্দ' বিলম্বিত লযেব ছন্দ আর পয়ার ছন্দ ধীর লয়ের ছন্দ। আমাদের মতে, মাত্রাছন্দকে 'মধ্য' লয়ের ছন্দ বলাই সমীচীন। পয়ার 'ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ, ইহার দীর্ঘায়ত পদক্ষেপ, ভারিক্কি চাল।

(২) **তান-প্রধান ছন্দ** :—পয়ার ছন্দের 'তান-প্রধান' নামটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাতে সমগ্র ধ্বনিপ্রবাহে একটি সুরের টান থাকে, ইহাই তান (vocal drawl) ; এই টান অনেক সময় অক্ষর ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। এই টান বা তান নানাদিক হইতে এই ছন্দের ত্রুটি আচ্ছাদন করিয়া ইহাকে অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। (ক) পর্ব্বের দৈর্ঘ্য অসমান হইলেও এই টানের ফলে অবলীলাক্রমে 'লয়' মিলিয়া যায় ; (খ) ইহা হ্রস্বকে দীর্ঘ, দীর্ঘকে হ্রস্ব, লঘুকে গুরু, গুরুকে লঘু

করিয়া সব কিছু একাকার করে : রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'পয়ারের শোষণ শক্তি' এই তান-সঞ্জাত। অমূল্যধন বাবু বলেন :

> স্রোতের মধ্যে ছোট বড় উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের একটানা সুরের মধ্যে তদ্রূপ মৌলিক স্বরান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে।[১]

(গ) তান থাকার জন্যই পয়ার ছন্দে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে ছেদ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে মূল ধ্বনিপ্রবাহের মাপ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না; (ঘ) সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, সুরের টান থাকার দরুণ পয়ারের চরণকে ইচ্ছামত শিথিল বা গাঢ়বদ্ধ করা সম্ভব। ইহাতে 'দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'—এর মত ওজনভারি চরণও যেমন স্থান পাইতে পারে, তেমনই হালকা, শিথিল 'পাষাণ মিলিয়া যায় গায়ের বাতাসে'-এর মত চরণও অতি সহজে স্থান পায়। তানকে এই ছন্দের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই অন্যান্য ছন্দ হইতে ইহার বিশিষ্টতা রক্ষা করে।

(৩) **অক্ষরবৃত্ত** :—'পয়ার' ছন্দকে অনেকেই নিজ নিজ যুক্তি অনুসারে 'অক্ষরবৃত্ত' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'অক্ষরবৃত্ত' নামটি যেমন বহুল প্রচলিত, তেমনই সার্থক। তবে এই নামকরণের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপ রায় মহাশয় বলেন :

> সেই ছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত—যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দের শেষে থাকলে সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে (টেনে) উচ্চারণ করে ধরা হয় দু মাত্রা; আর শব্দের মধ্যে থাকলে সচরাচর সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে (ঠেসে) উচ্চারণ করে ধরা হয় একমাত্রা।[২]

এই ব্যাখ্যায় অক্ষরবৃত্তে কোন্ অক্ষর কি ভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অক্ষরবৃত্তের সংজ্ঞার্থ ব্যাখ্যাত হয় নাই। শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেন উপরের যুক্তি অনুসারে অক্ষরবৃত্তকে 'যৌগিক ছন্দ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনিও বলেন, এই ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথাও একমাত্রিক, কোথাও বা দ্বিমাত্রিক; অতএব ইহা যৌগিক বা মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ।

১ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ২ ছন্দসিকী (ভূমিকা)—দিলীপ কুমার রায়

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য বলেন :

> সাধারণ ভঙ্গীতে উচ্চার্য ছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত।···অক্ষরই সকল ছন্দের মূল উপাদান, তাই অক্ষরবৃত্ত নামে সাধারণ-ভঙ্গীর উচ্চারণ ভিন্ন অন্যান্য ভঙ্গীর উচ্চারণ সূচিত হয় না।[১]

এই ব্যাখ্যাদ্বারাও অক্ষরবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে আবার অক্ষর = বর্ণ ধরিয়া, বর্ণবৃত্ত অর্থে অক্ষরবৃত্ত নামটি সমর্থন করেন। বর্ণ হইল শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ। দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দেখিয়া শ্রূয়মাণ ধ্বনির সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারটি বিস্ময়কর হইলেও, পয়ার ছন্দে একদিক দিয়া তাহা সম্ভব হয়। পয়ার ছন্দে মাত্রার তারতম্য ঘটে কেবলমাত্র শব্দান্তের হলন্ত অক্ষরে। এই অক্ষরটি বাঙলায় দুইটি বর্ণ বা হরফে লেখা হয়, যেমন ১নং উদাহরণের 'লাপ', 'রাম' ইত্যাদি : অতএব এই দুইটি বর্ণকে দুইটি স্বতন্ত্র অক্ষর ধরিলে, চরণের অক্ষর, বর্ণ, মাত্রাসংখ্যা সব মিলিয়া যায় ; অতএব অক্ষর = বর্ণ এবং বর্ণবৃত্ত = অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু হসন্ত হল্ বর্ণকে অক্ষর (syllable) বলিয়া মনে করিয়া 'অক্ষর বৃত্ত' নামের সমর্থন কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহাতে শব্দান্তের হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত হয় এবং অবৈজ্ঞানিক উপায়ে মাত্রাহীন হল্‌ধ্বনি এক মাত্রার হইয়া উঠে।

অক্ষরবৃত্ত নামের তাৎপর্য্য অন্যদিক হইতে বিচার্য্য। অক্ষর বর্ণ নয়, syllable—এই দিক হইতেই অক্ষরবৃত্তের বিচার করিতে হইবে। শ্রূয়মাণ অক্ষরধ্বনিই বাঙলা ছন্দের মূল উপাদান, এই অক্ষর সর্ব্বদাই একমাত্রিক। সংস্কৃতে প্রতি অক্ষর একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইলেও, দৃশ্যমান কোন্ অক্ষরে কতটি অক্ষর, কতটি মাত্রা থাকিবে তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল, এবং সেই অনুসারেই দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরদ্বারা একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা নির্ণয় করা হইত। সংস্কৃত মাত্রাছন্দে এবং অপভ্রংশ মাত্রাছন্দেও অনুরূপ মাত্রা গণনার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। চর্য্যাগীতিকায়, ব্রজবুলিতে এবং বাঙলার 'পদ ছন্দে' মাত্রাগণনার সেই রীতিই অনুসরণ করা হইত। কিন্তু বাঙলা দেশের উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ক্রমে দেখা গেল, প্রাচীন পদ্ধতিতে দৃশ্যমান অক্ষর দেখিয়া মাত্রা গণনার রীতি, প্রায়ই নিয়মভঙ্গ করিতেছে ; অতএব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না মানিয়া শ্রূয়মাণ অক্ষরধ্বনি অনুসারে মাত্রা গণনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল এবং

---

১ ছন্দোবিজ্ঞান

শ্রুতিগোচর অক্ষর দ্বারা মাত্রা স্থিরীকৃত হইতে লাগিল। এই ভাবে শ্রূয়মাণ অক্ষর হইল মাত্রাগণনার ভিত্তি, এক অক্ষর (syllable), এক মাত্রা। এই দিক হইতেই বাঙলা পয়ার নূতন নিয়মে 'অক্ষর সঙ্খ্যাত' হইয়া উঠিল। 'পদ' ছন্দ হইতে 'পয়ার'-এর পার্থক্যও এইখানে। মাত্রাছন্দের মাত্রা গণনা হইত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে—দৃশ্যমান অক্ষর অনুসারে, পয়ারের মাত্রা গণনা হয় শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষরধ্বনির সাহায্যে। যেমন,—'বিতুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলঈ'—এই চরণে, দৃশ্যমান অক্ষর আছে ১৪টি, বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ, 'ঈ' দীর্ঘ—অতএব ইহার মাত্রাসংখ্যা হইবে ১৬।—মাত্রা গণনার এই নিয়ম চর্য্যাপদে ও ব্রজবুলিতে যথাযথ রক্ষিত হইযাছে; কিন্তু বাঙালীর কণ্ঠে 'কণ্ঠ'-এর 'ক'-এবং 'মেলঈ'র 'ঈ' কখনই স্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, উহারা হ্রস্ব ও একমাত্রা। অতএব বাঙলার সাধারণ উচ্চারণরীতি অনুসারে 'বিতুজন লোঅ তোরে কণ্ঠন মেলঈ' হইল ১৪ অক্ষর, ১৪ মাত্রা। ইহাই বাঙলার অক্ষরবৃত্ত বা 'অক্ষর সঙ্খ্যাত' বৃত্ত। ইহাতে শ্রূয়মাণ অক্ষরই মাত্রা গণনার, পর্ব্বদৈর্ঘ্য বিচারের, লয়ের সমতা নির্ণয়ের এবং চরণের ধ্বনিপ্রবাহ মাপিবার য়ুনিট। এই দিক হইতেই পয়ার ছন্দের অক্ষরবৃত্ত নামটি সার্থক ও সমর্থনযোগ্য। অক্ষর দ্বারা (অবশ্য শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষর) মাত্রা গণনার রীতি ক্রমে মাত্রাছন্দ ও ছড়ার ছন্দেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্থিরমাত্রিক অক্ষরই (এক অক্ষর = এক মাত্রা) এখন যে-কোন বাঙলা ছন্দ মাপিবার একক (Unit)।

(৪) **পয়ার**ঃ—আধুনিক যুগে যাহাকে বলা হয অক্ষরবৃত্ত, প্রাচীন কালে তাহাকেই বলা হইত পয়ার। ছন্দের পয়ার নামটি যেমন সার্থক, তেমনই বহুল প্রচলিত। তদ্ভব শব্দগুলি যেমন বাঙালীর নিজের সৃষ্টি, নিজস্ব সম্পদ, পয়ার ছন্দটিও তেমনই বাঙালীর 'আপনমনের মাধুরী' দিয়া গড়া। এই ছন্দেই বাঙলার রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি রচিত: এই ছন্দের ভিত্তিতেই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর, গিরীশচন্দ্রের 'গৈরীশ ছন্দ', রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র প্রবহমাণ ছন্দ গঠিত।

পয়ারের ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক গবেষণা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, বাঙলার পয়ার ফারসীর 'বয়েৎ' নামক ছন্দ হইতে আসিয়াছে, কেহ বলেন সংস্কৃত জাতিছন্দ 'পজ্ঝটিকা' (প্রতিপদযমকিত ষোড়শ মাত্রা') হইতে ইহার উৎপত্তি, কেহ বলেন, অপভ্রংশের 'পাদাকুলক'

('পঅ পঅ লেকথহি উত্তম রেহা · সোলহ মত্তা পাআকুলঅং') হইতে ইহার উৎপত্তি। ভাষাতত্ত্ববিদ ডাঃ সুকুমার সেন বলেন :

> 'পজ্ঝটিকা' (=পদ্ধতিকা), 'পাদাকুলক', 'পয়ার' (<পদাকার) —এই তিনটি নামের ব্যুৎপত্তিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি চতুষ্পদী হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালার চর্য্যাগীতিকার অধিকাংশই এই ছন্দে লেখা। চতুষ্পদী (অর্ব্বাচীন অপভ্রংশে 'চউপঈ') 'অতি শক্করী' জাতীয় ছন্দ পনেরো মাত্রার। বাঙলা পয়ার ছন্দের ইহাই মূল। চতুষ্পদীর পনেরো মাত্রার একমাত্রা যতিতে খাইয়া গিয়া চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার উৎপন্ন হইয়াছে।[১]

'পদাকার'—এই শব্দ হইতে 'পয়ার' শব্দটি আসিয়া থাকিলে, সংস্কৃত ও অপভ্রংশের মাত্রাছন্দ (পদছন্দ) হইতে যে ইহার উৎপত্তি, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নও বলেন, "সংস্কৃতের 'গীতময় বৃত্ত' হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।" আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মাত্রাছন্দ এদেশে 'দোহা' ও 'পদ' নামে অভিহিত হইত। 'দোহা' ও 'পদে' সাধারণতঃ প্রাচীন রীতি অনুসারে মাত্রা গণনা করা হইত : এই সকল ছন্দে দৃশ্যমান অক্ষরের সমতা না থাকিলেও প্রতি পদে মাত্রার সমতা থাকিত। তাহার মানে দৃশ্যমান অক্ষরগুলির মধ্যে কোন কোন অক্ষরকে দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হইত এবং সেই ভাবেই অক্ষরগুলি উচ্চারিত হইত। কিন্তু অপভ্রংশেই এই উচ্চারণ-রীতির শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল :

দীহো বিঅ বণ্ণো লহু জীহা পঢ়ই হোই সে বি লহু।
বণ্ণো বি তুরিঅ পঢিও দোত্তিণ্ণে এক্কং জাণেই ॥

—উচ্চারণগত এই বৈশিষ্ট্য বাঙলা ভাষাতেও সংক্রামিত হওয়ায়, অক্ষরের লঘু-গুরুভেদ, স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতার পার্থক্য একেবারেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। তখন দৃশ্যমান অক্ষর দেখিয়া তাহার লঘুত্ব বা গুরুত্ব নির্ণয় করা, স্বরের হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব বিচার করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, বাঙালীকে নির্ভর করিতে হইল শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষর-ধ্বনির উপর। এই অক্ষর স্থিরমাত্রিক, এক অক্ষর—এক মাত্রা। অক্ষর মৌলিক স্বরান্তই হউক, যৌগিক স্বরান্তই হউক, আর হলন্তই হউক—সব একমাত্রিক। এই ভাবে অক্ষর ও মাত্রা অভিন্ন হওয়ায়,

---

১ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডাঃ সুকুমার সেন

বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণরীতি অনুযায়ী মাত্রাবৃত্ত হইল অক্ষরবৃত্ত; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে 'মাত্রাকৃতা' ছন্দ, শ্রূয়মাণ 'অক্ষর সখ্যাত' হইয়া উঠিল। 'পদ' নিজস্ব মাত্রা গণনার রীতি হারাইয়া 'পয়ার'-এ পরিণত হইল। 'পদ' হইতেই 'পয়ার'-এর সৃষ্টি; পার্থক্য এই যে 'পদ' প্রাচীন মাত্রাছন্দের তৎসম রূপ, আর 'পয়ার' তাহার তদ্ভব রূপ: অর্থাৎ পয়ার ঠিক পদ নয়, **পদাকার**, পদের অনুরূপ। পদের মাত্রা গণনার ভিত্তি দৃশ্যমান অক্ষর, আর পয়ারের মাত্রা গণনার ভিত্তি শ্রুতিগম্য অক্ষর-ধ্বনি। ছন্দের পয়ার (<পদাকার) নামটি এই দিক হইতে সার্থক। প্রাচীন কবিরা 'পয়ার' নামেই এ ছন্দকে চিহ্নিত করিয়াছিলেনঃ অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ইত্যাদি নাম তাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা 'পয়ার'কেই চিনিতেন, তাই 'পয়ারপ্রবন্ধে'ই তাঁহারা কাব্য রচনা করিতেন: একপদী, ত্রিপদী, চৌপদীতে তাঁহাদের পয়ার ছন্দ আনন্দে নৃত্য-চপল হইয়া উঠিত।

পয়ার ছন্দের বিভিন্ন রূপকল্প

(১) একপদী পয়ার বা একাবলী

একাবলী একাদশাক্ষর এগার মাত্রার ছন্দ। সাধারণতঃ একটি পয়ারের চরণ ৬, ৮, বা ১০ অক্ষর (=মাত্রা) বিশিষ্ট পর্ব্ব লইয়া গঠিত হয়। ইহাই পয়ারের পূর্ণপর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যা। একাবলী একাদশাক্ষরা বলিয়া ইহাতে ৬ মাত্রার অথবা ৮ মাত্রার একটি মাত্র পূর্ণ পর্ব্বই থাকে, অপর পর্ব্বটি অপূর্ণপদী হওয়ায় ইহাকে প্রথম পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করা হয়। একটি মাত্র পূর্ণ পর্ব্ব লইয়া ইহার চরণ গঠিত হওয়ার জন্য এই পয়ার ছন্দের নাম 'একপদী' পয়ার।[১] নানাভাবে ইহার অক্ষর বা মাত্রাসংখ্যা বিন্যস্ত হইতে পারে:

[ক] ৬+৫ = ১১ অক্ষর

বহুদিন পরে | বঁধুয়া এলে
দেখা না হইত | পরাণ গেলে

[খ] পাকা চাঁপাকলা | করিয়া জড়
খেতে মনে সাধ | করেছি বড়
থোড় উড়ুম্বর | ইচ্‌লা মাছে
খাইলে মুখের | অরুচি ঘুচে।

১ কবিকঙ্কণ এই ছন্দকে 'একপদী ছন্দ' নামে অভিহিত করিয়াছেন

[গ] ৮+৩=১১ অক্ষর

সভাস্থলে নরপতি | আসিয়া
মন্ত্রিবরে কহিলেন | হাসিয়া

(২) ত্রিপদী পয়ার

যে পয়ারের প্রতি চরণে তিনটি করিয়া পর্ব্ব থাকে, তাহাকে ত্রিপদী বলে। ত্রিপদী দুই প্রকার : লঘু-ত্রিপদী (৬+৬+৮) ও দীর্ঘ-ত্রিপদী (৮+৮+১০)

[ক] **লঘু-ত্রিপদী**

এক দিঠ করি | ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে
চণ্ডীদাস কয় | নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে

[খ] **দীর্ঘ-ত্রিপদী বা নাচাড়ী ছন্দ**

অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মাযে ইহা সহিতে কি পারে॥

(৩) চৌপদী

[ক] **লঘু চৌপদী**

বিধুমুখে তোর | আধ আধ বাণী | অমৃত বরষে | শ্রবণে মোর
আপনা আপনি | হরিষ পরাণী | হরষ নাচনী | হেরিলে তোর

[খ] **দীর্ঘ চৌপদী**

অম্বরে অরুণোদয় | তলে দুলে দুলে বয় | তমসা তটিনী রাণী | কুলু কুলু স্বনে
নিরখি লোচন লোভা | পুলিন বিপিন শোভা | ভ্রমেণ বাল্মীকি মুনি |
ভাবভোলা মনে।

(৪) প্রচলিত পয়ার

প্রতি চরণে ৮+৬=১৪ অক্ষর এবং চরণান্তে মিল থাকে।

[ক] রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম | যান বনবাসে
শিরে হাত দিয়া কাঁদে | সবে নিজ বাসে

[খ] **তরল পয়ার :** চরণান্তিক মিল বাদেও ইহাতে চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে অনুপ্রাস থাকে :

দেখ দ্বিজ | মনসিজ | জিনিয়া মুরতি
পদ্ম পত্র | যুগ্ম নেত্র | পরশয়ে শ্রুতি

[গ] **মালঝাঁপ পয়ার :** চরণান্তিক মিল ছাড়াও চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে অনুপ্রাস :

ঠুকে তাল | আঁখি লাল | কি করাল | মূর্ত্তি
মহাকায় | হরি প্রায় | যেন পায় | স্ফূর্ত্তি

[ঘ] **ভঙ্গপদী পয়ার :**

যে পয়ারে প্রথম চরণের অক্ষর সংখ্যার সহিত দ্বিতীয় চরণের অক্ষর সংখ্যার মিল থাকে না ; অথবা আটে, চতুর্দ্দশে যতির পরিবর্ত্তে পয়ারের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যেখানে সেখানে যতি পড়ে তাহাকে ভঙ্গপদী পয়ার বলে :

(i)	দুঃখ কর অবধান | দুঃখ কর অবধান	৮+৮=১৬
	লঘু বৃষ্টি হইলে | কুড়্যাতে আসে বান	৭+৭=১৪
(ii)	নারদের গানে শিব | শঙ্কর মোহিল	৮+৬=১৪
	বিদীর্ণ রসাতলে | পদতল পশিল	৭+৭=১৪
(iii)	কন্যা বলি পৃথিবী | সীতারে ডাকে ঘনে	৭+৭=১৪
	কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে	৭+৭=১৪
(iv)	নৃপ নন্দন ভট্টেরে | জিজ্ঞাসে বাণী	৭+৫=১২
	কহ সে সুন্দরী | কেমন রাণী	৬+৫=১১

* *

শুনি সুন্দর | আনন্দে নিবাস যায়	৫+৮=১৩
চল বর্দ্ধমান | বলে ভারত রায়	৬+৭=১৩

পয়ারের গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, জোড় অক্ষরের শব্দের সহিত জোড় অক্ষরের শব্দ এবং বিজোড় অক্ষরের সহিত বিজোড় অক্ষরের মিলন না হইলেই পয়ারে ছন্দ পতন ঘটে। পয়ারের চরণে অক্ষর সমাবেশ সম্পর্কে সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন,

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ ফেলে ঘুরে যাও মোড়॥

(৫) দীর্ঘ পয়ার

একটি চরণে চৌদ্দ অক্ষরের বেশি অক্ষরের সমাবেশ করিয়া এইরূপ চরণান্তিক মিলযুক্ত দুইটি চরণ লইয়া যে পয়ার গঠিত হয়, তাহাকে দীর্ঘ পয়ার কহে। দীর্ঘ পয়ারের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়:

[ক] ৮+৮=১৬ অক্ষরের চরণ

আর কেন কাঁদ রাণী | উমারে আনিতে যাই
গেলে যদি কৃত্তিবাস | না পাঠান ভাবি তাই

[খ] ৮+১০=১৮ অক্ষরের চরণ; এইরূপ পয়ারকে মহাপয়ার বলা হয়:

বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা | সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র শূন্য | বড়ো ক্ষুদ্র বড়ো অন্ধকার,
অন্ন চাই প্রাণ চাই | আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল চাই স্বাস্থ্য | আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

(৬) সনেট বা চতুর্দ্দশ পদী

পয়ার ছন্দের আর একটি বিশিষ্ট রূপকল্প 'সনেট' বা চতুর্দ্দশপদী। ইহাতে পয়ারের অনুরূপ চরণের চৌদ্দটি চরণ থাকে। অধ্যাপক Bain বলেন,

The Sonnet [diminutive from Italian 'sono'=sound] is a short lyrical poem complete in one stanza, containing fourteen lines of five measured verse.

ইউরোপে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সনেট রচিত হইয়া আসিতেছে। ইতালিতে প্রথম সনেট রচনা করেন সুপ্রসিদ্ধ কবি পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪ খ্রীঃ)। ইংরাজি সাহিত্যে সনেটের প্রবর্ত্তক ওয়াট ও স্যুরে। পরে সেক্সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতি কবি সনেট রচনা করেন। আধুনিক কালে কবিতা রচনায় সনেট বহুল ব্যবহৃত। পেত্রার্কা একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যক্তি-নিষ্ঠ ভাবকে সনেটের সংহত বন্ধনের মধ্যে প্রকাশ করেন।

একটি সনেটে চৌদ্দটি চরণ থাকে; এই চৌদ্দ চরণ দুই ভাগে বিভক্ত—আট চরণের octave বা অষ্টক এবং ছয় চরণের sestet বা ষট্‌ক। প্রথম আট চরণে (octave) একটি ভাব রূপ ধারণ করে এবং শেষের ছয় চরণে (sestet), সেই ভাবটি ব্যাখ্যাত হয় ও তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এইরূপ সনেটকে বলা হয় Classical sonnet; ইহাতে চরণান্তিক মিলটিও নিয়মবদ্ধ। মিলের নিয়ম—(ক খ খ ক+ক খ খ ক)+(গ ঘ ঙ+গ ঘ ঙ)

অথবা (গ ঘ ঙ+ঘ গ ঙ)। পেত্রার্কার সনেটগুলি এই নিয়মানুযায়ী রচিত। ইংরাজিতে মিল্টন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সনেটও এই পদ্ধতিতে রচিত। সেক্ষপীয়রের সনেটগুলিতে অষ্টক ও ষট্‌ক-এর বন্ধনও যেমন শিথিল, তেমনই ইহা কেবল ব্যক্তি-নিষ্ঠ ভাবের প্রতিমূর্ত্তি নয়, বস্তু-নিষ্ঠও বটে। সর্ব্বোপরি Classical sonnet-এর মিলের নিয়মও তিনি রক্ষা করেন নাই। তাঁহার সনেটের চরণান্তিক মিল এইরূপ, ক খ ক খ+গ ঘ গ ঘ+ঙ চ ঙ চ+ছ ছ। পরবর্ত্তী কালের কবিরা কেহ বা প্রাচীন পদ্ধতিতে, কেহ বা সেক্ষপীয়রের পদ্ধতিতে সনেট রচনা করিয়াছেন। ডি. জি. রসেটির একটি সনেট এইরূপ; ইহাতে সনেটের প্রকৃতিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে:

A Sonnet is a moment's monument— A
Memorial from the soul's eternity B
To one dead deathless hour. Look that it be, B
Whether for lustral rite or dire portent, A
Of its own arduous fulness reverent: A
Carve it in ivory or in ebony, B
As Day or Night may rule; and let Time see, B
Its flowering crest impearl'd and orient. A
A Sonnet is a coin: its face reveals, C
The soul;—its converse, to what power 'tis due:— D
Whether for tribute to the august appeals C
Of life, or dower in Love's high retinue, D
It serve; or 'mid the dark wharf's cav'rnous breath, E
In Charon's palm it pay the toll to Death. E

বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেট রচনার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ছিল এবং 'কবি মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট তিনি পূর্ব্বে রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসীর ভার্সেল্‌স্ নগরে বসবাস করিবার সময়েই মাইকেলের অধিকাংশ সনেট রচিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বসাককে লিখিত একটি পত্র হইতে তাহা জানা যায়:

I have been lately reading Petrarca—the Italian poet and scribbling some 'sonnets' after his manner······ I dare say, the sonnet চতুর্দ্দশপদী will do wonderfully in our language.

পেত্রার্কার সনেটই মাইকেলের আদর্শ। 'ফ্রাঞ্চিস্কো পেত্রার্কা কবি' "কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি' (অর্থাৎ সনেট)—ইতালীয় ভাষার মন্দিরে বাগদেবীর চরণে এই উপহার অর্পণ করিয়াছিলেন। মাইকেল তাঁহার যশোগাথা গাহিয়াছেন, বলিয়াছেন, তাঁহার আদর্শেই তিনি চতুর্দ্দশপদী রচনা করিয়া ভারত-ভারতীর চরণে অর্পণ করিয়াছেন :

ভারতে ভারতীপদ উপযুক্ত গণি,
উপহাররূপে আজি অরপি রতনে।

কিন্তু পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করিলেও, মাইকেলের সনেট 'receives an original shape'; ইউরোপীয় সনেটের চরণ pentameter verse line-যুক্ত, মাইকেলের সনেটের চরণ পয়ার চরণের ভিত্তিতে চতুর্দ্দশাক্ষরে রচিত। সনেটের 'চতুর্দ্দশপদী' নামকরণটিও মাইকেলের নিজস্ব। অষ্টক ও ষট্‌কের নিয়মও মাইকেল সর্ব্বত্র রক্ষা করেন নাই; সনেট রচনায় মিল রক্ষার বিষয়ে মাইকেল ইচ্ছামত পর্য্যায়সম বা মধ্যসম পয়ারের মিল রক্ষা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কতকগুলি কবিতায় শেষ দুই চরণ রচনায় তিনি সেক্ষপীয়রের মত দুই চরণের দোহা (couplet) সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন,

পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।

অথবা,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান ॥

অবশ্য পেত্রার্কার মিল-বন্ধনের আদর্শও মাইকেলে আছে, যেমন,—

অষ্টক (octave)

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে ... ক
কালীদহে। বসি বামা শতদল দলে .. খ
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে . খ
মনোহরা) বামকরে সাপটি হেলনে ... ক
গজেশে গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে। ... ক
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে, ... খ
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে। ... খ
কার না ভোলে রে মনঃ, এহেন ছলনে। ... ক

ষটক (Sestet)

কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ, ... গ
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ সুধাদানে ... ঘ
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী .. ঙ
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ ... গ
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে? ঘ
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী। ... ঙ

মধুসূদন সনেটের প্রবর্ত্তক, তিনিই আবার ইহার সার্থক স্রষ্টা। তাঁহার হাতেই বাঙলা সনেট পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছে। সনেটের গাঢ়বন্ধ চরণের মধ্যে তিনি নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের আত্মপরিচয় লাভ করিতে হইলে তাঁহার সনেটগুলি পাঠ করা প্রয়োজন। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া নিজের দেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের প্রেম সনেটগুলিতে প্রমূর্ত্ত হইয়াছে। ইহা সত্যই চকিত চপল মুহূর্ত্তের কীর্ত্তিস্তম্ভ (Moment's monument)। ইহাদের মধ্যে কবি স্ব-হৃদয়টিকে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

মাইকেলের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, মোহিত-লাল প্রমুখ কবি সনেট রচনা করিযাছেন। রবীন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশপদীকে চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন, 'সুন্দরী সনেট': এগুলি যেন 'শরৎ প্রভাতে সিক্ত শুভ্র শেফালিকা'! "কড়ি ও কোমল" 'চৈতালি', 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে সুন্দর সুন্দর সনেট আছে। রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনায় পয়ার চরণের লয় এবং চরণান্তিক মিল উভয়ই রক্ষা করিয়াছেন, অন্যান্যরূপ বৈচিত্র্যও আছে, যেমন,

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় ... ক
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় ... ক
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার .. খ
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার . খ
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত .. গ
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো ... গ
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায় .. ঘ
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় ... ঘ
তোমার মন্দির মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার ... ঙ
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার। ... ঙ
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে ... চ
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ॥ ... চ
Couplet { মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া, ... ছ
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। ... ছ

[অন্যান্য চরণে পয়ারের মত মিল থাকিলেও, ভাবের প্রবহমাণতার জন্য সে মিল স্পষ্ট নয়। কিন্তু শেষ দুই চরণের মিল অতি স্পষ্ট, ইহা সেক্সপীয়রের couplet-এর মত।]

সনেট রচনায় প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্বও স্মরণযোগ্য। তাঁহার 'সনেট পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থ বিখ্যাত। তিনি সনেট রচনায় পেত্রার্কার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু নবম ও দশম চরণে Couplet সৃষ্টি করিয়াছেন। এই লক্ষণটি বীরবলী সনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিম্নলিখিত সনেটটিতে প্রমথ চৌধুরী সনেটের প্রকৃতি এবং তাঁহার সনেট রচনার আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন :

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ, ... ক
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার। ... খ
একমাত্র তাবে গুরু করেছি স্বীকার, খ
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ! ক
নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ। ক
বাণী যার মনশ্চক্রে না ধরে আকার, ... খ
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার, .. খ
একথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ ॥ . ক
Couplet { ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, .. গ
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন ॥ গ
ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ, ... ঘ
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট। . ঙ
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহা বিজাতীয় গন্ধ ... ঘ
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট ! ... ঙ

সনেট রচনায় মোহিতলাল মজুমদারের কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার সনেট প্রাচীনপন্থী, রচনাও গাঢ়বন্ধ। এরূপ নিয়মানুগ, সুসংহতভাবের সনেট

সচরাচর দেখা যায় না। সনেট রচনায় মোহিতলাল মহাশয়ারের চরণকে (৮+১০) অবলম্বন করিয়াছেন :

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা, ছন্দ বিলাসিনী। ... ক
কতকাল নৃত্য করি ভুলাইবে মধুমত্ত জনে ... খ
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু, বাঁকায়ে সঘনে, ... খ
চপল চরণ ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী। ... ক
আন বীণা সপ্তস্বরা-স্বর্ণতন্ত্রী তন্দ্রা বিনাশিনী ... ক
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে— ... খ
যে বাণী আকাশে উঠে,—শিখা যার হোম হুতাশনে, ... খ
পশে পুনঃ রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী। ... ক
করি উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন ... গ
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল আশ্রমে ; ... ঘ
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন .. গ
পশিল সে মহার্ণবে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে। ... ঘ
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ ? . গ
কোথায় জাহ্নবী-ধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ? ... ঘ

উপরিউক্ত কবিতায় কবি—এদেশের মুক্তবন্ধ ছন্দের আবাহনী গাহিয়াছেন। চতুর্দ্দশপদীতেও নূতন রূপকল্প হয়তো দেখা দিবে। আধুনিক গদ্য কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, চর্য্যাগীতিকার কবিতাগুলিতে চতুর্দ্দশপদীর পূর্ব্বরূপ পাওয়া যাইতেছে। এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। চর্য্যাগীতির কবিতা অধিকাংশই দশ বা দ্বাদশ চরণে সমাপ্ত। কেবল ১০নং চর্য্যা (নগর বাহিরে ডোম্বী ইত্যাদি), ২৮নং চর্য্যা (উচঁা উচঁা পাবত ইত্যাদি) এবং ৫০নং চর্য্যা ('গঅণত গঅণত ইত্যাদি)—চতুর্দ্দশপদী। এসমস্ত কবিতায় সনেটের গাঢ়বদ্ধতা, স্তবকবন্ধের নিয়ম কিছুই নাই। এগুলি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি ধ্রুবপদের সমষ্টি। ভাবের আরোহ ও অবরোহও সুস্পষ্ট নয়। অতএব ইহাদিগকে কোনক্রমেই সনেটরূপী চতুর্দ্দশপদীর পূর্ব্বরূপ বলা সঙ্গত নয়।

(৭) প্রবহমান পয়ার

সুতীব্র আবেগকে শৃঙ্খলিত করিবার উদ্দেশ্যেই একদিন ছন্দোবন্ধের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ছন্দ অসংযত আবেগকে সংযত করে, উচ্ছৃঙ্খল

ভাবকে শৃঙ্খলার মধ্যে বিধৃত করে, অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসকে দমন করে। ছন্দের নিয়মানুবর্ত্তিতায় ভাব গাঢ়বদ্ধ ও সুসংযত হইবার সুযোগ লাভ করে; শুধু তাই নয় ছন্দের সহায়তায় ভাব অলৌকিক রসলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় এই ছন্দই আবার কল্পনার প্রকাশে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠে: মনোগত ভাব সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়: শৃঙ্খলাকে মনে হয় শৃঙ্খল। অনেকে তখন ছন্দের বন্ধন হইতে মুক্তি কামনা করেন, অনেকে আবার ছন্দকে ভাবের অনুগত করিয়া ইহাকে নূতন মূর্ত্তি দান করিয়া থাকেন। ইউরোপে এইরূপ ছন্দকে বলা হয় 'Run on', 'Non stopt verse' অথবা Blank verse। ইহাই প্রবহমাণ ছন্দ।

বস্তুত: কবিতা হইতেছে, 'Spontaneous overflow of powerful feelings' (Wordsworth); স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই সুতীব্র ভাবকে সব সময় ক্ষুদ্র চরণ-বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, তাই ইংরাজিতে—Dimeter হইতে heptameter পর্য্যন্ত চরণের দৈর্ঘ্য দেখা যায়; বাঙলাতেও একপদী হইতে চতুষ্পদী পর্য্যন্ত এক একটি চরণ হইতে পারে। যে-কোন মাপেরই হউক, এইরূপ একটি বা দুইটি চরণেব মধ্যে ভাবের পূর্ণ ছেদ টানিতে হয়: ভাবের এই ছেদ বুঝাইবার জন্য প্রতি চরণেব শেষে একটি মিলও রক্ষা করা হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় কবিগণ ভাবের প্রবহমাণতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য 'run on' বা Non stopt verse-এর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ কবিতার প্রধান রূপকল্প Blank verse। ইহাতে ভাব চরণান্তিক বিরতি স্থলে না থামিয়া ইচ্ছামত অপর চরণের মধ্যে থামিতে পারে। এই ছন্দে চরণমধ্যস্থ যতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হয; এইজন্য, চরণান্তিক যতি গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে এবং সাধারণতঃ চরণান্তিক মিল পরিত্যক্ত হয়। Milton-এর Paradise Lost কাব্যে, Shakespeare-এর নাটকে ও অন্যত্র Blank verse-এর প্রয়োগ দেখা যায়। Miltonic Blank verse-এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

I now see
Bone of my bone, flesh of my flesh, myself
Before me ; woman is her name, of man
Extracted ; for this cause he shall forego
Father and mother, and to his wife adhere ;
And they shall be one flesh, one heart, one soul.*

* Paradise Lost, Book viii.

বাঙলা কবিতা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত পয়ারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল : ছেদ ও যতির মিলিত অবস্থান, চরণান্তিক মিল এবং সমাপ্তগতি দুই চরণের মধ্যে ভাবের অবশ্যম্ভাবী বিরতি—এইগুলিই ছিল পয়ারের বিশিষ্টতা। প্রচলিত পয়ারই হউক, ত্রিপদীই হউক,—কবি-কল্পনাকে দুই চরণের মধ্যেই থামিতে হইত। ভাবকে বিলম্বিত করিবার জন্য কবিরা কখনও পয়ারকে টানিয়া একটু বড় করিতেন, কখনও দীর্ঘ ত্রিপদী অর্থাৎ নাচাড়ী ছন্দের আশ্রয় লইতেন। তথাপি ছন্দের অনুরোধে মনোগত ভাবকে সঙ্কুচিত করিতেই হইত—দুই চরণের শেষে ভাবার্থের ছেদ পড়িত। কোন কোন স্থলে প্রথম চরণটি অসমাপ্তগতি হইলেও দ্বিতীয় চরণে অবশ্যই গতির সমাপ্তি ঘটিত ; যেমন,

পদ্মমুখী পদ্মালয়া সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।

সর্ব্বোপরি চরণগত অন্ত্যানুপ্রাস বজায় রাখিতে হইত বলিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও বাক্যকে দুই চরণের অধিক সম্প্রসারিত করা সম্ভব হইত না ; ছন্দের অনুরোধে, মিলের অনুরোধে, ছেদ ও যতির মিত্রতার অনুরোধে, ভাবের গতি আপনিই শৃঙ্খলিত হইত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

ভাবেব এই শৃঙ্খল মোচন করিয়া, বাঙলা ছন্দে নূতনত্ব আনয়ন করিলেন—তখনকার দিনের 'Tremendous literary rebel' মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক মাইকেল

তিনি দেখিলেন, মিত্রাক্ষর ছন্দে কবির ভাব পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহার স্বাধীন গতি থাকে না। ভাষার এই বন্ধন দশা মধুসূদনের চিত্তকে বেদনা-বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এই মনোভাব মাইকেল পরবর্ত্তী যুগে একটি সনেটে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে![১]

---

১ চতুর্দ্দশপদী কবিতা, 'মিত্রাক্ষর'।

মাইকেলের সম্মুখে ছিল পাশ্চাত্ত্য Blank verse-এর আদর্শ, তাহারই অনুসরণে তিনি ভাবের বন্ধন-মুক্তি সম্পাদন করিলেন। আগে যেখানে ভাব ছন্দের দাসত্ব করিত, মাইকেল সেখানে ছন্দকেই ভাবের দাসত্বে নিযুক্ত করিলেন। মাইকেল দেখিলেন, ভাবের ছেদ (অর্থগত ছেদ) এবং ছন্দের যতি একস্থানে পড়ে বলিয়া—ভাবকে চরণান্তিক যতির পরে আর টানিয়া সম্প্রসারিত করা যায় না; তাই তিনি ছেদ ও যতির মিত্রতা ছিন্ন করিলেন, ফলে ছন্দে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবহমাণতা সঞ্চারিত হইল অর্থাৎ অর্থের দিক হইতে সমাপ্তগতি চরণ, অসমাপ্তগতি চরণে পরিণত হইবার সুযোগ লাভ করিল। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বিশিষ্টতা।

মধুসূদন আরও লক্ষ্য করিলেন পয়ারাদি ছন্দে চরণান্তিক মিলটিও ভাবের স্বচ্ছন্দ গতির পক্ষে প্রতিবন্ধক। প্রতি চরণের অন্ত্যানুপ্রাস এখানে এত স্পষ্ট যে, এই অনুপ্রাসের অনুবোধে ভাবকে চরণান্তে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়। সুস্পষ্ট মিল রক্ষা করিলে বাক্যকে অধিক দূর টানিয়া লওয়া যায় না, বাক্যে মিলের ছেদ পড়ে। তাই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে চরণান্তিক মিলটিকেও উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই মিল-বর্জন মাইকেল-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের গৌণ বিশিষ্টতা। ছেদ ও যতির অমিত্রতাই এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইখানেই পয়ারে ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে পার্থক্য। প্রচলিত পয়ার হইতে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাতন্ত্র্য কোথায়, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট করা যাইতেছে। যতি বুঝাইতে '|' চিহ্ন এবং ছেদ বুঝাইতে '*' চিহ্ন ব্যবহার করা হইল। পয়ারে ছেদ ও যতির অবস্থান এইরূপ :—

অমিত্রাক্ষর ও পয়ার

(i) তথাস্তু বলিয়া দেবী* | দিলা বর দান* |
দুধে ভাতে থাকিবেক* | তোমার সন্তান* |

(ii) চণ্ডীদাস বলে* | শুনহ সকলে* | বিনয় বচন সার* |
বিনয় করিয়া* | বচন কহিলে* | ভুলনা নাহিক তার* |

প্রাচীন পয়ারে ছেদ ও যতির এই যুগনদ্ধ অবস্থান লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু, অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির, কোথায়ও কোথায়ও মিত্রতা থাকিলেও অমিত্রতাই প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। যথা,

আনায় মাঝারে বাঘে | পাইলে কি কভু |
ছাড়ে রে কিরাত তারে* | বধিব এখনি |

অবোধ* তেমতি তোরে* | জন্ম রক্ষঃকুলে |
তোর* ক্ষত্রধর্ম্ম* পাপি* | কি হেতু পালিব |
তোর সঙ্গে* মারি অরি | পারি যে কৌশলে* |

অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির এই অমিত্রতা তখনকার দিনে অনেকেই অনুধাবন করিতে পারেন নাই : তাঁহারা মনে করিতেন, চরণান্তের মিলহীনতাই বুঝি এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর গুপ্তও এই দিক হইতে এই ছন্দের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া বলিয়াছিলেন,

কবিতা কমলা কলা পাকা বড় কাঁদি।
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট পূরে খাই॥

কিন্তু এই কটাক্ষ রচনায় গুপ্ত কবি মিলহীন পয়ারই রচনা করিয়াছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়। তিনি এই ছন্দের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। এইরূপে আরও অনেকে, এমন কি বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত—এই ছন্দের প্রতি প্রথম প্রথম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পয়ার শ্রবণে অভ্যস্ত কান লইয়া পাঠ কবিলে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ শ্রুতিকটু এবং অর্থহীন বলিয়া মনে হইবেই। ছেদের জায়গায় না থামিয়া কেবল যতির জায়গায় থামিয়া পড়িলে ইহা 'হরেকরকম্বা'র মত শুনাইবে। যেমন,

উর দযাময়ি |
বিশ্বরমে গাইব মা | বীর রসে ভাসি |
মহাগীত উরি দাসে | দেহ পদ ছাযা |

এইজন্যই মধুসূদন বার বার ছেদ অনুসারে এই ছন্দ পাঠ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিন্দা করিতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া মধুসূদন একটি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,

Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language. My advice is Read, Read and Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

অনেক বাদানুবাদ ও বিতর্কের পরে, অবশেষে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙলায় 'noblest measure' রূপেই গৃহীত হইয়াছে। পয়ার ছন্দ হইতে ভিন্ন হইলেও, অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ারের আধারেই রচিত। পয়ারের চরণ যেমন

চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত, অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণও তেমনই চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত ; পয়ারে যেমন উচ্চারণের দিক্ হইতে স্বাভাবিক গদ্য উচ্চারণভঙ্গির অনুসরণ করা হয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তিও সাধারণ উচ্চারণভঙ্গি।

পয়ারে যেমন, অষ্টম আর চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর যতি বসে, অমিত্রাক্ষর ছন্দেও তেমনই অষ্টমে ও চতুর্দ্দশে যতি ; 'পয়ারের লয়টাকে সে অমান্য করে না।' পয়ার ছন্দের মধ্যেও এমন একটি শক্তি আছে যে, ইহাতেও ভাবকে অবলীলাক্রমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। সুরের টান থাকায়, যেখানে-সেখানে ছেদ বসাইতেও বেগ পাইতে হয় না। উপযুক্ত ছেদ বসাইয়া পড়িলে পয়ারেও প্রবহমাণতা অনুভূত হইবে, যেমন,

(i) এই মত—কহিতে কহিতে দুই ভাই
বায়ুবেগে চলিলেন ; অন্য জ্ঞান নাই ;
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে
'সীতা সীতা'--বলিয়া ডাকেন বারে বারে—
শূন্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী। —কৃত্তিবাস

(ii) কহি নিজ সাধ, শুন গো দাসী,
পান্তওদনে ব্যঞ্জন বাসী,
বাথুয়া ঠনঠনি, তেলের পাক
ডগডগি লাউ, ছোলার শাক,
মীন চড়চড়ি, কুমড়া বড়ি
সরল সফরী, ভাজা চিঙ্গড়ী,
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়
খেতে মনে সাধ হযেছে বড়। —কবিকঙ্কণ

কিন্তু প্রাচীন পয়ারে প্রবহমাণতা থাকা সত্ত্বেও, চরণান্তিক অনুপ্রাসের জন্য তাহা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইত। তাই ধ্বনিপ্রবাহ এবং ভাবপ্রবাহকে গতিশীল করিয়া রাখিবার জন্য মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে মিলের বন্ধন বর্জ্জন করিয়াছিলেন। পয়ারের প্রবহমাণতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিরঙ্কুশ : অথচ তাহা পয়ারের লয়সমন্বিত, যথা,

অতিথি আসিত নিত্য | করভ করভী, ||
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, | স্বর্ণঅঙ্গ কেহ, ||

কেহ শুভ্র, কেহ লাল, | কেহ বা চিত্রিত ||
—যথা বাসবের ধনুঃ | ঘনবর শিরে—||
অহিংসক জীব যত। |

মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস বর্জ্জন করিলেও, ইহা ঝঙ্কারবিহীন নয়। ইহাতে একদিকে যেমন আছে গম্ভীর মেঘমন্দ্র, অন্যদিকে তেমনই রহিয়াছে মৃদঙ্গের সুমিষ্ট ঝঙ্কার। এক জাতীয় সংযুক্ত ধ্বনি ব্যবহার করিয়া, প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিন্যাস করিয়া মধুসূদন এই ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাসের ত্রুটি পূর্ণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, বৃত্ত্যনুপ্রাস-ছেকানুপ্রাসাদির সুনিপুণ প্রয়োগে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে অত্যাশ্চর্য্য ধ্বনি-কল্লোল সৃষ্টি হইয়াছে : নিম্নে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

(১) থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে,
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি,
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে। [ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ]

(২) দুর্দ্দান্ত দানবে দলি নিস্তারিলা তুমি
দেব-দলে, নিস্তারিণি, নিস্তার অধীনে
মহিষমর্দ্দিনি মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে। [ছেকানুপ্রাস]

(৩) ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে [বৃত্ত্যনুপ্রাস]

(৪) যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে [তৎসম শব্দের প্রয়োগ]

মাইকেল 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করেন, সেখানে এই ছন্দ ত্রুটিহীন ছিল না, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বজ্ররব ও মৃদঙ্গ ঝঙ্কার দুইই উঠিয়াছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নয়। সাধু ভাষার সহিত গ্রাম্য ভাষার মিশ্রণ—

'লড়িল মস্তকে জটাজুট',
'টানিল হুড়ুকা ধরি',
'স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে',

—এইরূপ প্রয়োগ—এই ছন্দকে দোষযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই ছন্দ একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'। বীরাঙ্গনার ভাষা যেমন গম্ভীর ও মার্জ্জিত, ছন্দও তেমনই নির্দ্দোষ ও ত্রুটিহীন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে যে-কোন রসকে প্রমূর্ত্ত করা সম্ভব, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবর্ত্তন

মাইকেল প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম দিকে নিন্দিত হইলেও কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে ইহা বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল।

জগদ্বন্ধু ভদ্রের ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য

ঈষৎ পরবর্ত্তীকালে জগদ্বন্ধু ভদ্র মেঘনাদবধ কাব্যের প্যারডি 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন ঃ রচনাটির নমুনা,—

> রুক্মিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহ ণিয়া
> প্রদান সুপুচ্ছ মোরে— দাও চিত্রিবারে
> কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত দুর্জ্জয়
> পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
> পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল ?

এই ছন্দে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত ব্যঙ্গকাব্য 'ভারত উদ্ধার' রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটু নমুনা,

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত উদ্ধার

> প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
> নাসারন্ধ্রে, গলে, খক্ খক্ খকে
> কাসাইল শত্রুদলে ; ফঁ্যাচ্, ফঁ্যাচ্, ফঁ্যাচে
> হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।

—এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয়, Blank verse-এর অনুকরণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই—অন্ততঃ অনেকেই ইহার মর্ম্মগত সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অথচ এ ছন্দের মোহময় আকর্ষণ, এ ছন্দের ভাবমুক্তির উল্লাসকেও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

মাইকেলের অনুকরণে, পাশ্চাত্ত্য Blank verse-এর আদর্শে নয়, সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলেন আন্তরীক্ষ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর ছন্দে হেমচন্দ্র যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য তাহার কারণও আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় হেমচন্দ্রের আদর্শ ছিল সংস্কৃত শ্লোক। সংস্কৃত শ্লোক চারিপাদে সমাপ্ত হয়, পাদে পাদে মিল থাকে না। এই মিল-হীনতাকে হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর মনে করাতেই প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিত্রাক্ষর বস্তুতঃ মিলহীন পয়ারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য হেমচন্দ্র তাঁহাব অমিত্রাক্ষব ছন্দেব বৈশিষ্ট্যেব কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :

> এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষব উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য বচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদবিন্যাস কবিযা বঙ্গভাষাব গৌরব বৃদ্ধি কবেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন কবি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন প্রভৃতি ইংবেজ কবিগণেব প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংবেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষাব সমধিক নিকট সম্বন্ধ বলিযা যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎপবিমাণে তাহাবই অনুসবণ কবিতে সচেষ্ট হইয়াছি।…সচবাচব সংস্কৃত শ্লোকেব চাবি চবণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয, সেইরূপ চতুর্দ্দশ অক্ষব বিশিষ্ট পংক্তিব চাবি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ কবিতে যত্নশীল হইযাছি। পয়াবেব যতি-সংস্থাপনাব যেরূপ প্রথা আছে, তাহাব অন্যথা কবি নাই।[১]

চাবি চবণে অমিত্রাক্ষব ছন্দকে শৃঙ্খলিত কবায় এই ছন্দেব অবাধ প্রবহমাণতা ক্ষুণ্ণ হইযাছে। দ্বিতীয়তঃ পয়াবেব যতিপ্রথা অনুসবণ কবিতে গিয়া, ছেদকে হেমচন্দ্র যতি হইতে বিচ্ছিন্ন কবিতে পাবেন নাই। সাধাবণ পয়াব হইতে পার্থক্য এইটুকু হইযাছে যে, পযাবে চবণান্তর্গত মধ্যযতি স্থলে পূর্ণ ছেদ থাকে না, হেমচন্দ্র সেখানে মাঝে মাঝে পূর্ণছেদ টানিযাছেন এবং পযাবেব চবণান্তিক মিল উঠাইয়া দিয়াছেন। যেমন,

> কহিলা এতেক সূর্য্য। ঝটিকাব বেগে
> চাবিদিক হতে দেব ছুটিতে লাগিল
> উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
> মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য কবি ফেরে। (বৃত্রসংহার প্রথম সর্গ)

অবশ্য সর্ব্বত্রই যে চাবি চবণে ভাব সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা নয়, কোথায়ও কোথায়ও ভাব চতুর্থ চবণ উল্লঙ্ঘন কবিয়া অগ্রসব হইয়াছে, যেমন,—

> দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
> নাসিকা নিঃশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,

---

১ বৃত্রসংহার কাব্যের 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন'—হেমচন্দ্র

বাহিরিল বক্ষতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !

দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে। (বৃত্রসংহার, ত্রয়োদশ সর্গ)

হেমচন্দ্র কোথায়ও কোথায়ও এই ছন্দকে সমিল করিয়াছেন ; যথা,

নৈমিষ অরণ্য কোথা ? দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দন তুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ ;
চারু মনোহর লতা ; পল্লব মধুর ;
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর,
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস,
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ। (বৃত্রসংহার, পঞ্চম সর্গ)

এই যুগের আর একজন কীর্ত্তিমান লেখক, উনবিংশ শতাব্দীর 'অভিনব মহাভারত'প্রণেতা চট্টলার বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন। তিনিও তাঁহার কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের ছন্দে মাইকেলী গাম্ভীর্য্য নাই, রচনাও শ্লথবদ্ধ। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুগপৎ বজ্র গর্জ্জন ও বীণার নিক্কণ উঠিয়াছে, কিন্তু নবীনচন্দ্রের ছন্দে বীণার ঝঙ্কার সুন্দর ফুটিলেও বজ্ররব স্ফুটতর হয় নাই। যুদ্ধের বর্ণনাতেও নবীনচন্দ্র অমিত্রাক্ষরের ওজস্বিতা সঞ্চার করিতে পারেন নাই :

নবীনচন্দ্র সেন

মুহূর্ত্তে কুমার-বীর্য্য প্রভঞ্জন দর্পে
রহিল জলধি গর্ভে, জলধি নির্ঘোষে
ধ্বনিল বিজয় শঙ্খ, প্রতিধ্বনি তুলি
শত শত মহাশঙ্খে কৌরব-বেলায়। (কুরুক্ষেত্র)

নবীনচন্দ্রের মধ্যে ছিল অত্যাশ্চর্য্য লিরিক-উচ্ছ্বাস। মাইকেলের মধ্যেও এই লিরিক-ধর্ম্মিতা ছিল, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে ধর্ম্ম সুপ্রকট (দ্রষ্টব্য

মেঘনাদবধ কাব্য, চতুর্থ সর্গ)। নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দও মাইকেলের মতই স্থানে স্থানে লিরিক-ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে: যেমন,

সায়াহ্নে আবার বন হইত পূরিত
সুগম্ভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
'শ্যামলী', 'ধবলী', 'লালী' ?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ; আসিত ছুটিয়া
শ্যামলী, ধবলী, লালী, লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস; ঘ্রাণিত আদরে
আপন রাখাল দেহ; কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্ব্বাক উত্তর। (রৈবতক)

নবীনচন্দ্রও ছেদ ও যতির অমিত্রতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই: তাঁহার ছেদ অধিকাংশ স্থলেই যতির অনুসরণে চরণের শেষে, কদাচিৎ চরণ-মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে হেমচন্দ্রের মত তিনি চরণান্তে অন্ত্যানুপ্রাস যোজনা করিয়াছেন:

অজ, মেষ নানা জাতি, উড়াইয়া ধূলি
যাইত; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া।

নবীনচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় কোথায়ও মাইকেলকে, কোথায়ও বা হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি স্থলে নবীনচন্দ্র নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচলিত পয়ারের চতুর্দ্দশাক্ষর চরণই ব্যবহৃত হইত। নবীনচন্দ্র দীর্ঘ পয়ারের ষোড়শাক্ষর চরণে এই ছন্দ যোজনা করিয়াছেন:

নবধর্ম্ম-বেদিমূলে বসিয়া দেবতাগণ
আর্য্য-অনার্য্যের ধ্যানে; বেদি-বক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি; তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভান্বিতা।

রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় মাইকেল চরণান্তিক মিল বর্জ্জন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কোন কোন স্থলে পুনরায় এই মিল যোজনা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অমিত্র ছন্দে চরণান্তিক মিলকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার বেশির ভাগ কবিতা সমিল অমিত্রাক্ষরে রচিত। অবশ্য ইউরোপেও Blank verse দুই প্রকারের—

Unrhymed এবং Rhymed। কেহ কেহ অমিল ছন্দের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাঁহারা বলেন, 'Rhyme is no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse' (Milton); আবার কেহ কেহ মিল রক্ষার পক্ষপাতী; তাঁহারা বলেন, 'Rhyme is apt to come uncalled' (Cowper); রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ কবিতা সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াছেন। মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্টি-নৈপুণ্যে এ ছন্দের প্রবহমাণতা বা সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যেমন,—

অমিল ও সমিল অমিত্রাক্ষর

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশ দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তর পুরীর মাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ।

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ চতুর্দ্দশ অক্ষরযুক্ত চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কবি নবীনচন্দ্র ষোড়শাক্ষরা দীর্ঘ পয়ারে এই ছন্দ যোজনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আরও দীর্ঘ, অষ্টাদশাক্ষর পয়ারের চরণে এই ছন্দ যোজনা করিয়াছেন। অবশ্য এই দীর্ঘ পয়ারের অমিত্রাক্ষর ছন্দেও রবীন্দ্রনাথ চরণান্তিক মিল রক্ষা করিয়াছেন। অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা ঝোঁক ছিল: 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে তিনি বলিয়াছিলেন,

'ফেনা ঢোকে নাকে চোখে
প্রবল মিলের ঝোঁকে'

অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাতেও তিনি এই ঝোঁক বর্জ্জন করিতে পারেন নাই; চরণ চতুর্দ্দশাক্ষরা, কিংবা ষোড়শাক্ষরা কিংবা অষ্টাদশাক্ষরা যাহাই হউক না কেন, রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর প্রায় সর্ব্বত্রই সমিল, যথা—

হে আদি জননী, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা কোলে তব। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে।

রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্যতম বিশিষ্টতা, চরণান্তর্গত পর্ব্ব-দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যে। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সকলেই প্রচলিত পয়ারের রীতি অনুসারে চরণের অষ্টম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরের পরে যতি স্থাপন করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অনেকটা চতুষ্পদী পয়ারের মত। মাইকেল এক যতি হইতে অন্য যতির মধ্যে ইচ্ছামত ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন—তিন, চার, ছয় বা আট মাত্রা কিংবা তাহারও অধিক মাত্রার পর, কিন্তু ছেদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহার পর্ব্ব গঠনের নিয়ম পয়ারের মতই অর্থাৎ পর্ব্বগুলি সর্ব্বত্রই আট + ছয় মাত্রার। যেমন,

একবারে | শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা টংকারি রোষে | শত ভীম ধনুঃ
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিলা লঙ্কা | আতঙ্কে, কাঁপিল ··· তিন অক্ষরে ছেদ
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে | রথী ; তুরঙ্গমে ··· ছয় অক্ষরে ছেদ
সাদীবর ; সিংহাসনে | রাজা , অবরোধে · চার অক্ষরে ছেদ
কুলবধূ, বিহঙ্গম | কাঁপিল কুলায়ে ; · দশ অক্ষরে ছেদ
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ ; | বন-হস্তী বনে, ··· আট অক্ষরে ছেদ
ডুবিল অতল জলে | জলচর যত। ··· চৌদ্দ অক্ষরে ছেদ

অতএব মাইকেলের ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে প্রথমতঃ ছেদ ও যতির অমিত্রতায়, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন মাত্রার শব্দের পরে ছেদ ব্যবহারে। মাইকেল বিজোড় অক্ষরের পরেও ছেদ বসাইয়াছেন, (উপরের তৃতীয় চরণ দ্রষ্টব্য)। উপরন্তু তিনি চরণান্তিক মিল বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার চরণগুলির পর্ব্বদৈর্ঘ্যও সমান, যতি আটে আর ছয়ে। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য সমিল অমিত্রাক্ষর রচনায়, দীর্ঘ পয়ারের চরণে প্রবহমাণতা সঞ্চারে। মাইকেলের মত তিনি কখনও বিজোড় মাত্রার শব্দের পরে ছেদ যোজনা করেন নাই : সর্ব্বোপরি পয়ারের অনুগত যতি স্থাপনের নিয়মও তিনি ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহার ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান থাকিলেও—চরণান্তর্গত পর্ব্বগুলির দৈর্ঘ্য অসমান হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'পজ্‌ঝটিকা' ছন্দের

মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরের পার্থক্য

'প্রতিপদ যমকিতা' সূত্রটি অনুসরণ করিয়াছেন। 'প্রতিপদ যমকিতা' বাক্যাংশটির দুই অর্থ :

(১) যা পদে পদে প্রতিপদং প্রতিপাদমিত্যর্থঃ যমকিতাঃ সঞ্জাতযমকাঃ একজাতীয় স্বর-ব্যঞ্জনসমুদায়স্য আবৃত্তিরূপ যমকযুক্তা ইত্যর্থঃ।

(২) যদ্বা যমকিতা যুগ্মবিচ্ছিন্নাঃ।[১]

—যাহার প্রতিপদে (প্রতিপাদের অন্তে) এক জাতীয় স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির মিল অথবা যাহার প্রতি যুগ্মমাত্রা যতিযুক্ত। অর্থাৎ এই ছন্দ সমিল এবং ইহার চাল দুই মাত্রার।

বাঙলা পয়ারের চালও দুই মাত্রার, ইহা জোড় মাত্রায় বাঁধা। ইহাতে দুই মাত্রার গুণিতক যে-কোন মাত্রার পরে যতি স্থাপন করা চলে এবং ইহাতে চরণান্তিক মিল থাকে। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরে এই দুইটি নিয়মই অনুসরণ করা হইয়াছে। বিজোড় মাত্রার পরে তিনি কখনও ছেদ বা যতি যোজনা করেন নাই—ছেদ ও যতি উভয়ই যোজনা করিয়াছেন, চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার পরে পরে। ইহার ফলে, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ার বা মহাপয়ারের চরণকে আশ্রয় করিলেও সর্ব্বদা ৮+৬ বা ৮+১০ অক্ষরে যতি সংস্থাপিত হয় নাই। যতি জোড়মাত্রায় স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে পড়িয়াছে বলিয়া পয়ারেব পর্ব্বভাগ কখনও হইয়াছে ৮+৬, কখনও ৬+৮, কখনও ৪+১০, কখনও বা ১০+৪ ; আর মহাপয়ারের পর্ব্বভাগ হইয়াছে ৮+১০, ১০+৮, ৪+১৪(১৪ =৮ : ৬ বা ৬ : ৮), ৬+১২(১২=৮ : ৪ বা ৪ : ৮)। ইহার ফলে রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণান্তর্গত পর্ব্বগুলি অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন,

পয়ারের চরণে সমিল অমিত্রাক্ষর

(১)

আজ শত বর্ষ পরে	০+৮
এ সুন্দর অরণ্যের | পল্লবের স্বরে	৮+৬
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? | ঘরে ঘরে	১০+৪
কত শত নরনারী | চিরকাল ধরে	৮+৬
পাতিবে সংসার খেলা |	৮+...

[১] রামধন ভট্টাচার্য্য-কৃত 'ছন্দোমঞ্জরী'র টীকা (ষষ্ঠ স্তবক)

(২) আমার নন্দনভূমি …+৮
একান্ত আমার ! | দুর্লভ পরশখানি' ৬+৮
দুর্ম্মূল্য দুকূল, | সর্ব্বাঙ্গে দিয়াছে টানি ৬+৮
সগৌরবে ; | আলিঙ্গন কুঙ্কুম চন্দন ৪+১০
সুগন্ধ করেছে বক্ষ ; | অমৃত চুম্বন ৮+৬
অধরে রয়েছে লাগি |· ৮+…

মহাপয়ারের চরণে সমিল অমিত্রাক্ষর

(১) কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে …+১০
শূন্যতল। | কোন অন্ধকারা মাঝে : জর্জ্জর বন্ধনে ৪+(৮ : ৬)
অনাথিনী মাগিছে সহায়। | স্ফীতকায অপমান ১০+৮
অক্ষমের বক্ষ হতে, | শুষি রক্ত করিতেছে পান ৮+১০
লক্ষ মুখ দিযা, | বেদনারে ˙ করিতেছে পরিহাস ৬+(৪ : ৮)
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। ৮+…

(২) অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে | শুনেছিলে সূর্য্যের আহ্বান …৮+১০
প্রাণের প্রথম জাগরণে ; | তুমি বৃক্ষ আদি প্রাণ, …১০+৮
ঊর্দ্ধ শীর্ষে উচ্চারিলে | আলোকের প্রথম বন্দনা …৮+১০
ছন্দোহীন পাষাণের : বক্ষ-পরে | আনিলে বেদনা …(৮ : ৪)+৬
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে। | সেদিন অম্বর মাঝে …১০+৮
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্দ্রে | স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্ক সমাজে …৮+১০
মর্ত্ত্যের মাহাত্ম্য গান · করিলে ঘোষণা। | যে জীবন …(৮ : ৬)+৪
যাত্রা করে যুগে যুগে

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য প্রধানতঃ এইখানেই। চরণান্তিক মিল থাকা বা না থাকা বড় কথা নয়। মাইকেলে চরণান্তিক মিল নাই, তাহা Unrhymed Blank verse ; রবীন্দ্রনাথে মিল আছে, তাহা Rhymed Blank verse। মধুসূদন এই ছন্দ রচনায় চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের চরণ অবলম্বন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের চরণ এবং দীর্ঘ পয়ারের অষ্টাদশাক্ষরা চরণ উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। উভয়ের স্বাতন্ত্র্য আসিয়াছে ছন্দের ঐক্য ও বৈচিত্র্যসৃষ্টির তারতম্যের দিক হইতে। মাইকেল পয়ারের চরণ ও পর্ব্ব কোনটারই 'লয়' ভঙ্গ করেন নাই—তাঁহার ছন্দের ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে এই দিক হইতে : বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে, ছেদ ও যতির অমিত্রতা

হইতে। দুই যতির মধ্যে নানা মাত্রার ছেদ স্থাপন করিয়া মধুসূদন ছন্দকে ভঙ্গিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের বৈচিত্র্য প্রতি চরণের পর্ব্বদৈর্ঘ্যের অসমতায়। তাঁহার পর্ব্বদৈর্ঘ্য কোন চরণে আট+ছয়, কোন চরণে ছয়+আট, কোথায়ও দশ+চার, কোথায়ও চার+দশ। এক এক চরণে যতির অবস্থান এক এক স্থানে, আর ছেদ ও যতি প্রায়ই মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ, যেন দুই মিত্র-শক্তি হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বগুলি অসমান হইলেও ধ্বনি-প্রবাহের সামগ্রিক ঐক্য প্রতি চরণে অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ঐক্য সৃষ্টি হইযাছে গোটা চরণের অক্ষর ও মাত্রা-সংখ্যার সমতায়। রবীন্দ্রনাথ পর্ব্বের 'লয়' ভঙ্গ করিলেও চরণের 'লয়' ভঙ্গ করেন নাই, চরণের শেষে ছন্দের সব কিছু আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে।

অবশ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে এইরূপ বৈচিত্র্য ও ঐক্য ইউরোপীয় Blank verse-এ ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিযাছিল। কবিরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন প্রতি চরণে একই স্থলে যতি সংস্থাপিত হইলে, ছন্দের বৈচিত্র্য নষ্ট হইয়া যায়, ছন্দ একঘেযে হইয়া উঠে: যেমন,

On her white breast | a sparkling cross she wore,
Which Jews might kiss | and infidels adore ;
Her lively looks | a sprightly mind disclose
Quick as her eyes | and as unfixed as those,
Favours to none, | to all she smiles extends,
Oft she rejects | but never once offends. (Pope)

[The mechanical monotony of these lines is apparent]*

তাই কবিরা চরণের বিভিন্ন স্থলে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দকে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন: Browning, Keats প্রভৃতির কবিতায় এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যথা,

I only knew one poet | in my life ;
And this, | or something like it, | was his way.
You saw go | up and down Valladolid
A man of mark, | to know next time you saw.
(Browning)

* Quoted from 'English Composition and Rhetoric' (Bain)

চরণে চরণে যতির এই বৈষম্য (variation) যে ঐক্য-বিরোধী নয়, সে সম্পর্কে Johnson বলেন :

> This, though it injures the harmony of the line, *considered by itself,* yet compensates the loss by relieving us from the continual tyranny of the same sound and makes us more sensible of the harmony of the pure measures [Rambler, No. 86]*

রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ প্রক্রিয়ায়, চরণে চরণে এক এক দৈর্ঘ্যের পর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া ছন্দের বৈচিত্র্য ও ঐক্য বিধান করিয়াছেন।

অসম চরণ সমিল অমিত্রাক্ষর (বলাকা কাব্যের বিশিষ্ট ছন্দ)

প্রতি চরণে অসমমাত্রিক পর্ব্ব ব্যবহারের প্রবণতা, রবীন্দ্রনাথকে আরও এক নূতন ধরণের ছন্দ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত 'গতিবাদ'কে কাব্যরূপ প্রদান করিয়াছেন। জীবনে গতির বিরাম নাই, জড় বস্তুও নিষ্প্রাণ, স্থির নয়, ইহার পরমাণুপুঞ্জে গতির তরঙ্গ। সব যেন 'উদ্দাম উধাও' ছুটিয়া চলিয়াছে। এমন কি পটে-আঁকা ছবিটিও যেন 'রেখার বন্ধনে' আবদ্ধ নয়—তাহাও প্রাণস্পন্দনে অস্থির। এই উদ্দাম গতির লীলাচাঞ্চল্যে সব কিছুই যখন প্রমুক্ত জীবনের ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন কবিতার চরণান্তর্গত পর্ব্বগুলিই বা নির্দ্দিষ্ট রেখার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে কেন ?

'কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে!
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে!'

—নিস্তব্ধ, স্থির হইয়া থাকেও নাই, পর্ব্বগুলি গতির আনন্দে চরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে, কোথায়ও বা পরবর্ত্তী চরণের কোন পর্ব্বের সহিত যুক্ত হইয়া নব কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে, কোথায়ও বা মুক্তির আনন্দে নিজেই ফাটিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। ইহাই 'বলাকা'র ছন্দের অভিনবত্ব।

বস্তুতঃ 'বলাকার ছন্দ' রাবীন্দ্রিক ঢঙের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ; ইহার পূর্ণ চরণের দৈর্ঘ্য একটি মহাপয়ার (৮+১০) কিংবা পয়ার-এর (৮+৬) চরণ-দৈর্ঘ্যের সমান। কেবল পার্থক্য এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে যেখানে চরণ-সম্মিতি বর্ত্তমান, এই ছন্দে পর্ব্বগুলি মুক্ত-চরণ হওয়ায় ইহার অসম (বিষম) পদক্ষেপ : কোথায়ও পর্ব্বগুলি যুক্ত অবস্থায় পয়ার বা মহাপয়ার জাতীয় চরণ সৃষ্টি করে,

* Quoted from 'English Composition and Rhetoric' (Bain)

কোথায়ও বা খণ্ডিত ভাবে নিজেই একটি অপূর্ণপর্ব্বিক চরণরূপে অবস্থান করে, কোথাও বা তিনটি চরণ একত্র হইয়া একটি সুদীর্ঘ ত্রিপদী গঠন করে। চরণ যে প্রকারেরই হউক, দুই চরণের অন্ত্যাক্ষর মিলযুক্ত। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক, এই ছন্দের প্রতিটি ছত্র, এক একটি চরণ নয়। যেখানে পর্ব্বগুলির পর্ব্বাঙ্গে মিল রহিয়াছে, অথবা যেখানে কোন পর্ব্বের কোন যুগ্মমাত্রিক অংশের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী চরণের অন্ত্যাক্ষরের মিল রহিয়াছে, সেখানে পর্ব্বগুলিকে ভাঙ্গিয়া দুই ছত্রে লেখা হইয়াছে: সেখানে মিলযুক্ত পর্ব্বাঙ্গ দুইটিকে মিলাইয়া একটি খণ্ডপর্ব্ব-চরণ অথবা পূর্ব্ব বা পরের চরণের সহিত যুক্ত করিয়া একটি পূর্ণ চরণ ধরিতে হইবে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল :—

(১) হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা ·· ১০
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা ·· ৮+১০
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক, }
শুধু থাক্ } ১০+৪
একবিন্দু নয়নের জল ·· ১০
কালের কপোলতলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল ·· ৮+৬
এ তাজমহল। ৬

(২) অজানার সুরে }
চলিযাছি দূর হতে দূরে } · ১৬
মেতেছি পথের প্রেমে। · ৮
তুমি পথ হতে নেমে }
যেখানে দাঁড়ালে } ৮+৬
সেইখানে আছ থেমে ···৮

(৩) শুধু ধাও, শুধু ধাও | শুধু বেগে ধাও; ১৪
উদ্দাম উধাও, }
ফিরে নাহি চাও; } ৬+৬
যা কিছু তোমার সব | দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও। ···৮+১০

[এই ছন্দগুলির প্রতি তিনটি চরণ মিলাইয়া পড়িলে অসমপর্ব্বিক সমিল ত্রিপদীর ছাঁচ দেখা যায়।]

আচার্য্য প্রবোধকুমার সেন এই ছন্দকে 'যৌগিক মুক্তক' ছন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক অমূল্যধন ইহাকে মুক্তক বা free verse বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি ইহাকে Blank verse-ই বলেন। তিনি মনে করেন, এই ছন্দে,

> চরণের মধ্যে পর্ব্বসমাবেশে এবং চরণের সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ মাত্রেই দ্বিপর্ব্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে।[১]

আমরাও এই ছন্দকে সম্পুর্ণরূপে মুক্তকছন্দ বলিয়া স্বীকার করি না। তবে অমূল্যবাবু যে-ভাবে অতিরিক্ত পদযোজনা দেখাইয়া, ইহার চরণ ভাগ করিয়াছেন, তাহাকেও সমর্থন করা যায় না। পূর্ণপর্ব্বিক চরণের পরে অপূর্ণপর্ব্বিক চরণের সমাবেশে এখানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং মোটামুটিভাবে স্তবক রচনায় এবং চরণান্তিক মিল যোজনায় এই ছন্দে একটি ঐক্যও রহিয়াছে, চরণগুলি ভাবানুযায়ী সাজানোর ফলে অসম হইলেও, ঠিকমত মিলাইয়া পড়িলে সুদীর্ঘ অসমপদী, সমিল ত্রিপদীর মত শুনাইবে। এই ধরণের হ্রস্ব-দীর্ঘ চরণযুক্ত বিচিত্র স্তবকের ছন্দ ইংরাজিতেও দেখা যায়। যেমন,

The rainbow comes and goes,
And lively is the rose ;
The moon doth with delight
Look round her when the heavens are bare
Waters on a starry night
Are beautiful and fair ;

The sunshine is a glorious birth ;

But yet I know
Where'er I go

That there hath passed away a glory from the earth.

(Wordsworth)

১ বাংলা ছন্দের মূল সূত্র (বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ)

অসম চরণ অমিল মিত্রাক্ষর বা মুক্তক ছন্দ (Free Verse ?)

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে, মাত্রার বন্ধন, পর্ব্বের বন্ধন, চরণের বন্ধন, এমন কি স্তবকের বন্ধন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, একপ্রকার ছন্দ রচনা করিয়াছেন : এই ছন্দকে কেহ কেহ বলিয়াছেন মুক্তক ছন্দ। এইরূপ ছন্দে কেবল জোড় মাত্রার বন্ধন (দুই মাত্রার চাল) ছাড়া ছন্দ আর কোন বন্ধনই স্বীকার করে না। অমূল্যবাবু বলেন :

> যেখানে verse বা পদ্য, নিয়মের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাব-তরঙ্গের অনুসারী সেখানে free verse আছে বলা যাইতে পারে।[১]

অবশ্য এইরূপ ছন্দে প্রবহমাণতা আরও অধিক, চরণগুলি অসমান ও চরণান্তিক মিলও এখানে থাকে না, চরণের পর্ব্বগুলি এক একটি এক এক দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার; কতটি চরণে স্তবক গঠিত হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ ছন্দে পয়ারের 'দ্বিমাত্রিক চাল' এবং 'কবিতার ভাষা'র বন্ধন আছে। অতএব ইহাকে 'মুক্তক' না বলিয়া 'অসম চরণ অমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বলিলেও ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষের দিকের 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি কাব্যে এইরূপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—

(১) হে সবিতা ! | তোমার কল্যাণতম রূপ ·৪+১০
করো অপাবৃত, | ··৬
সেই দিব্য আবির্ভাবে ··১০
হেরি আমি | আপন সত্তারে ···৪+৬
মৃত্যুর অতীত। (রবীন্দ্রনাথ) ···৬

(২) যে চৈতন্য জ্যোতি | ··৬
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর | অন্তর গগনে ···৮+৬
নহে আকস্মিক বন্দী | প্রাণের সঙ্কীর্ণ সীমানায়, ··৮+১০
আদি যার শূন্যময়, | অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক, ·৮+১০
মাঝখানে কিছুক্ষণ | ··৮
যাহা কিছু আছে, | তার অর্থ যাহা : করে উদ্ভাসিত। ···৬+১২
(রবীন্দ্রনাথ)

১। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (বাংলা মুক্তক ছন্দ)

পরবর্ত্তী আরও অনেক কবি এই ছন্দের অনুকরণ করিয়াছেন। যেমন,—

(৩) খাঁ খাঁ রোদ, | নিস্তব্ধ দুপুর ·৪+৬
আকাশ উপুর করে | ঢেলে দেওয়া অসীম শূন্যতা ··৮+১০
পৃথিবীর মাঠ | আর মনে— ··৬+৪
তারই মাঝে শুনি ডাকে | শুষ্ক কণ্ঠ কাক! ··৮+৬
গান নয়, | সুর নয় | ···৪+৪
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা — | কিছু নয়, | ··৬+৪
—সীমাহীন শূন্যতার | স্তব্ধ মূর্ত্তি শুধু। (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(৪) প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে ···১২
চিরন্তন বন্দী কবি। রচেছো আমায় ··৮+৬
নির্ম্মম বিধাতা মম; | এ কেবল অকারণ | আনন্দ তোমার ৮+৮+৬
মনে করি মুক্ত হবো; | মনে ভাবি, রহিতে দিবো না···৮+১০
মোর তরে এ নিখিলে | বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর ···৮+১০
(বুদ্ধদেব বসু)

অন্যান্য দিক হইতে ছন্দের কোন নিয়ম নিগড়, এই ছন্দে না থাকিলেও, ইহার প্রত্যেকটি পর্ব্বই দ্বি-মাত্রিক বা তাহার গুণিতক কোন সংখ্যার অক্ষর দ্বারা গঠিত; চরণগুলিতে পর্ব্ব খণ্ডিত না হইলেও, কোন চরণই পয়ার বা মহাপয়ারের চরণকে খুব বেশি উল্লঙ্ঘন করে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ইহার ভাষা 'কবিতার ভাষা'*—'হেরি', 'মোর', 'মম', 'তরে',—এই ভাষাগুলি কবিতা রচনার ভাষা। অতএব এ ছন্দও পদ্যছন্দের অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়, এইরূপ ছন্দের আদর্শ সংস্কৃতের অক্ষরসঙ্খ্যাত 'বিষমবৃত্ত'। বিষমবৃত্তে প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা সমান থাকে না, 'ভিন্নচিহ্নং চতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্ত্তিতম্' (ছন্দোমঞ্জরী)-ইহার প্রত্যেকটি চরণ ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত; কোন চরণের সহিত কোন চরণের মাত্রা বা অক্ষরসংখ্যার দিক হইতে কোন সম্মিতি নাই। বাঙলার এই ছন্দটিও অসমচরণ; তবে সংস্কৃত 'বিষমবৃত্ত' হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে, বিষমবৃত্তের পাদগুলি সমাপ্তগতি, এই ছন্দের চরণগুলি প্রবহমাণ; ছন্দযতিকে অনুসরণ না করিয়া, ইহার চরণ অর্থযতি বা ছেদ অনুসারে বিভক্ত হয়। এই ছন্দকে সাধারণতঃ 'মুক্তক ছন্দ'

---

* 'কবিতার ভাষা' সম্পর্কে আলোচনা ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

না বলিয়া 'ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। বাঙলায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দ

মাইকেল যখন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দিয়াছিলেন, তখনই যতীন্দ্রমোহন এই ছন্দে নাটক রচনার প্রস্তাব করিয়া মাইকেলকে লিখিয়াছিলেন :

> I should like very much to see Blank verse gradually introduced in our dramatic literature.

তিনি শুধু প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নাটকে কোথায় এই ছন্দ ভাবানুযায়ী কিরূপ হইবে, তাহারও নির্দেশ দিয়াছিলেন :

> Where the sentiment is elevated or idea is poetical, there only should short and smooth flowing passages in blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self same prose to which they are accustomed—only sweetened by a certain inherent music, pleasing and agreeable to the ear.

কিন্তু মাইকেলের জীবদ্দশায় নাটকে সেরূপ ছন্দ ব্যবহার করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেই 'মুক্তক ছন্দে'র সম্ভাবনা নিহিত ছিল এবং 'যদি অন্যান্য লোক তাহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়, অবিলম্বে ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহে নানাবিধ ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে'—সোমপ্রকাশ পত্রিকায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এইরূপ মন্তব্যও করিয়াছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবহমাণ, অনেকটা গদ্যের মতই ইহার বাগ্‌ভঙ্গি, চরণকেও ভাব অনুযায়ী যতদূর ইচ্ছা সম্প্রসারিত করা সম্ভব। অতএব নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত হইবার যথেষ্ট উপযোগিতা ইহার আছে। মধুসূদন দত্ত ইহার আভাস দিয়াছিলেন,—'If well recited, it sounds as much like prose'—আবৃত্তি করিলে ইহা গদ্যের মতই শুনায়, উপরন্তু ইহাতে থাকে ছন্দ-ঝঙ্কার।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই সম্ভাবনাকে নাটকের সংলাপে সার্থক রূপ দিয়াছিলেন বাঙলা দেশের বিখ্যাত নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি

অমিত্রাক্ষর ছন্দের চতুর্দ্দশ-অক্ষরা চরণ ভাঙ্গিয়া ভাবানুযায়ী ছেদ অনুসারে এক একটি চরণ রচনা করিয়া, ইহাকে নাটকীয় সংলাপের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর গিরিশচন্দ্রের নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতন নাম প্রাপ্ত হইল। ইহার নাম হইল **গৈরিশ ছন্দ**।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ এইরূপ ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রচারিত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ রায়ও এইরূপ ছন্দে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নামও যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। এই ছন্দের প্রবর্ত্তক যিনিই হউন, গিরিশচন্দ্রই ইহার প্রচারক, তাঁহার হাতেই এই ছন্দ সার্থক পরিণতি লাভ করিযাছে। ছন্দটি 'গৈরিশ ছন্দ' নামেই জনসমাজে প্রচলিত। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দের রূপকল্প এইরূপ ঃ

(১) নীর হেরি নারী চক্ষে | দযা না করিব, · ৮+৬
প্রবীরে বধিব। ·· ৬
শুনি মম | নাম গান, · ৪+৪
সদয়-হৃদয়— ···৬
পার্থ নাহি | প্রবীরে নাশিবে (জনা) · ৪+৬

(২) দেব, তব পদে | শত নমস্কার, | · ৬+৬
হল মম | ভ্রান্তি নাশ,— ·· ৪+৪
প্রবুদ্ধ অন্তর | তব বীরবাক্য শুনে। ···৬+৮
অসম্ভব | সম্ভব যদ্যপি হয, ···৪+৮
মক্ষিকায় চালে মেরু, | ···৮
রণভঙ্গ | তব যদি হয় সংঘটন, · ৪+১০
যুদ্ধ ভয় | উদয হৃদয়ে তব, ·· ৪+৮
তথাপি প্রতিজ্ঞা শুন | হে বীর কেশরি, · ৮+৬
রক্ষিতে আশ্রিতে | নাহি ডরিব কেশবে।·· ৬+৮

(পাণ্ডব গৌরব)

এই ছন্দ অমূল্যবাবু-কথিত মুক্তক ছন্দেরই অনুরূপ, অথবা ইহা হইতেই ওই মুক্তক ছন্দের উৎপত্তি। কিন্তু 'মুক্তক ছন্দে' চরণ-দৈর্ঘ্য আরও বৃহৎ হয়; এখানে চরণ-দৈর্ঘ্য পয়ারের ১৪ অক্ষরকে অতিক্রম করে না। চরণগুলির পর্ব্ব চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রায় গঠিত, প্রতি চরণের পর্ব্বসংখ্যা অধিকাংশ

স্থলেই দুই, কিন্তু পর্ব্বগুলি অসমান। পূর্ণছেদ ভাবানুযায়ী এক, দুই, তিন এমন কি অনেক সময় ছয় চরণের পরেও পড়ে। ছন্দের চাল মুক্তকের মতই দ্বিমাত্রিক, যতিগুলিও দুই বা দুইয়ের গুণিতক যে-কোন জোড় মাত্রার পরে পড়ে। এখানে ভাবানুযায়ী ছন্দকে দ্রুত অথবা বিলম্বিত উচ্চারণ করা সম্ভব। গদ্যের স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গির সহিত সঙ্গতি থাকায় নাটকীয় সংলাপ রচনায় ইহার সমধিক উপযোগিতা।

কিন্তু 'মুক্তক'ই বলি আর 'গৈরিশ ছন্দ'ই বলি, মাইকেল-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দই এ সকলের ভিত্তি। ছেদ অনুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণগুলিকে ভাঙ্গিয়া সাজাইলেও প্রায় ওই প্রকার মুক্তক বা গৈরিশ ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন,

অভঙ্গ অমিত্রাক্ষর : দেশ বৈরী নাশি রণে | পুত্রবর তব ...৮+৬
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; | বীর মাতা তুমি, .. ৮+৬
বীর কর্ম্মে হত পুত্র- | হেতু কি উচিত ...৮+৬
ক্রন্দন ? এ বংশ মম | উজ্জ্বল হে আজি ...৮+৬
তব পুত্র পরাক্রমে। ...৮+

ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর : দেশ বৈরী নাশি রণে | পুত্রবর তব ...৮+৬
গেছে চলি | স্বর্গপুরে | ...৪+৪
বীরমাতা তুমি, | .. ৬
বীর কর্ম্মে হত | পুত্র-হেতু কি উচিত ক্রন্দন ? ৬+১১
এ বংশ মম, | ...৬
উজ্জ্বল হে আজি | তব পুত্র পরাক্রমে ..৬+৮

অতএব অমূল্যবাবু যাহাকে মুক্তকছন্দ বলিয়াছেন, তাহাকে 'ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর' অথবা 'অসমচরণ অমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। যে ছন্দ পদ্য-ছন্দের কোন নিয়মই মানে না, অথচ ছন্দের শিল্পিত রূপটি যাহাতে আছে, তাহাই সত্যকারের মুক্তক ছন্দ (Free verse)। বাঙলার গদ্য কবিতার ছন্দকে সেইরূপ ছন্দ বলা যায়। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই ছন্দের আলোচনা করিতেছি।

গদ্যের ছন্দ ও গদ্য কবিতা

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা ভেদ আছে। গদ্যের ব্যবহার হয় দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে। কথায় বার্ত্তায় মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে, প্রয়োজনের কথা জানায়। 'গদ্' ধাতু হইতে গদ্যের উৎপত্তি, ইহার মানে 'কথা'। অতএব গদ্য হইতেছে কথার ভাষা। জানানোটাই (To inform) গদ্যের প্রধান কাজ। কিন্তু 'পদ্য' দিয়া মানুষ কেবল নিজের মনের ভাবই প্রকাশ করে না; ইহাদ্বারা প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করা হয়। অতএব পদ্যের প্রধান কাজ হইল আনন্দ দেওয়া (To please)। গদ্য সাধারণ, পদ্য অসাধারণ; গদ্যের গতি স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ—পদ্যের গতি নিয়মে বাঁধা। গদ্যকে যথাসম্ভব নিরাভরণ হইতে হয়, আটপৌরে হইতে হয়, কিন্তু পদ্যের নিরাভরণ হইলে চলে না, তাহাকে সাজিতে-গুজিতে হয়, বিশেষ করিয়া ছন্দের একটা অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়।

গদ্য ও পদ্য

এইজন্য গদ্য আর পদ্যের ভাষার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। গদ্যের ভাষা সহজ; সরল, সাধারণ মানুষের মুখের স্বাভাবিক উচ্চারণ ভঙ্গিকে রক্ষা করিয়া নির্ব্বাধ গতিতে সে অগ্রসর হয়। সে বাছে না, বিচার করে না, ভাবানুযায়ী যতটুকু তাহার বক্তব্য, কোন নিয়ম না মানিয়া, গদ্য সেই বক্তব্য পেশ করে। তাহার আনুগত্য কেবল শ্বাসযন্ত্রের কাছে অর্থাৎ ছেদের বন্ধনটুকুই কেবল সে মানে। আভিধানিক, অপ্রচলিত শব্দের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই; সাজ-সজ্জার প্রতিও তাহার মনোযোগ নাই। এ ভাষা চির পরিবর্ত্তনশীল। আঞ্চলিক পরিবেশ অনুযায়ী, আবহাওয়া অনুযায়ী মানুষের মুখের ভাষার রূপভেদের অন্ত নাই। গদ্যের ভাষা চিরকাল প্রগতিশীল। কিন্তু পদ্যের ভাষা নানাপ্রকার নিয়মে বাঁধা; এই জন্যই সে অনেকটা সংরক্ষণশীল। আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন,

গদ্য ও কবিতার ভাষা

কবিতার ভাষায় অনেক প্রাচীন শব্দ ও রূপ সংরক্ষিত থাকে · সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় অথবা লিখিত গদ্য ভাষায় অপ্রচলিত হইয়া

গিয়াছে, এরূপ বহু প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ কবিতার ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[১]

তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কবিতার ভাষায় প্রাচীন শব্দগুলির মধ্যে (১) দিঠি (দৃষ্টি), নিঠুর (নিষ্ঠুর), অমিয়া (অমৃত), হিয়া (হৃদয়), বয়ান (বদন), হেরিনু (দেখিলাম), নারিব (পারিব না), পর (উপরে) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। (২) 'বিপ্রকর্ষের' নিয়ম অনুসারে কঠিন সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে ভাঙ্গিয়া, তাহাতে নূতন স্বরধ্বনি যোজনা করিয়া, ভকতি (ভক্তি), মুকুতি (মুক্তি), গরজন (গর্জ্জন), শকতি (শক্তি), মুগধ (মুগ্ধ), ধরম (ধর্ম্ম) প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। (৩) কবিতায় সাধু ভাষার সহিত চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষনীয় নয়, যথা, 'বলো, কোন্ পাড়ে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী', 'বুক ফুলায়ে হাল ধরিব, পাল তুলিব নায়ে'। (৪) সর্ব্বনামের মধ্যে মোরা, মোকে, মম, তব, হেন (=এইরূপ) প্রভৃতি শব্দ; প্রচুর নামধাতু, যেমন, 'স্বনিছে পবন দূরে রহিয়া রহিয়া', 'মর্ম্মরিল পা:কুল', 'শানের ঘাটে নাইতে গিয়ে ঝম্‌ঝমাব মল'; ক্রিয়ার অতীতকাল বুঝাইতে, 'নু' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া, 'হেরিনু, শুনিনু, দিনু', প্রভৃতি এবং অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে, 'অবতরি' (অবতরণ করিয়া), ফিরি' (ফিরিয়া), দেখি' (দেখিয়া)—প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়।

গদ্যের ভাষায় এই সকল প্রয়োগ অপ্রচলিত এবং হাস্যকর। আবার গদ্যের বাক্যগঠন প্রণালীও কাব্যে অনেক সময় অচল।

সর্ব্বোপরি কবিতার প্রধান সম্পদ ছন্দ: 'Metre is absolutely demanded of poetry' (Hegel)। অধ্যাপক Bain বলেন, Metre—which distinguishes the poetic form proper from prose'; রবীন্দ্রনাথও একথাটা স্বীকার করিয়াছেন, বলিযাছেন, নাচের বন্ধনে কাব্যের তনুদেহের গতিটি মধুর ও সংযত, কিন্তু গদ্য ?—

'সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্ব্বত্র। সেই গতি-ভঙ্গী অবাধা।'[২]

ছন্দ কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াই, গদ্যের বাক্যগঠন প্রণালী,

১ ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (পরিশিষ্ট [১], কবিতার ভাষা)
২ কাব্যে গদ্যরীতি—রবীন্দ্রনাথ

শব্দবিন্যাস ও শব্দ চয়নের দিক হইতে পদ্যের বাক্য গঠন ও শব্দবিন্যাস মিলে না। কবিতায় নৃত্যের দোলা সৃষ্টি করিবার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত শব্দকে সাজাইতে হয়। Coleridge কবিতাকে বলিয়াছেন, 'Best words in the best order'—উক্তিটি অতিশয় মূল্যবান। সাধারণ কথায় সাধারণতঃ কোন ছন্দ থাকে না। কিন্তু সেই কথাগুলিই যখন কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো হয়, তখনই তাহাতে ছন্দ স্পন্দন জাগে। আমরা যখন বলি, 'এতো আর চাট্টি-খানি কথা নয়'—তখন তাহা ছন্দহীন, কিন্তু এই কথাগুলিই যখন ঈষৎ ঘুরাইয়া বলা হয়, 'এতো আর নয় চাট্টিখানি কথা', অমনি তাহাতে ছন্দের দোলা জাগে। পদ-সজ্জার নিয়মটার মধ্যেই বস্তুতঃ গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য।

তাই বলিয়া গদ্যও যে ছন্ন-ছাড়া (>ছন্দ ছাড়া ?) তাহা বলা চলে না। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ভাষায় এমন কতকগুলি গদ্যরচনা আছে, যাহা আশ্চর্য্য ছন্দস্পন্দময়। ইংরাজি Bible-এর সলোমনের গান, ডেভিডের গাথা গদ্যে রচিত হইলেও ছন্দযুক্ত: কতকগুলি গদ্যরচনাকে বলা হয়, 'Impassioned prose' বা 'Rhythmic prose'; এইরূপ কত যে দৃষ্টান্ত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, যেমন

ছন্দোময় গদ্য

(i) Create a clean heart in me, O God : and
renew a right spirit within my bowels.
Cast me not away from Thy face : and
take not Thy Holy Spirit from me. (Psalm. No. 50).

(ii) The voice of my beloved ! behold, he
cometh leaping upon the mountains,
skipping upon the hills. (Song of Solomon)

(iii) Methinks I see in my mind, a noble and a puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks ; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth, and kindling her undazzled eyes at the mid-day beam etc. (Milton)

সংস্কৃতে ছন্দযুক্ত চতুষ্পদীকে বলা হইয়াছে পদ্য, আর 'অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যং' (ছন্দোমঞ্জরী)—যাহাতে পাদ বা চরণের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই, এইরূপ পদসমূহের নাম গদ্য। গদ্যের মধ্যে আবার এমন গদ্য আছে, যাহাতে

ছন্দ স্পন্দন অনুভূত হয়,—সেরূপ গদ্যকে বলা হইয়াছে, 'বৃত্ত গন্ধি গদ্য': 'বৃত্তৈক-দেশ সম্বন্ধাদ্ বৃত্তগন্ধি পুনঃ স্মৃতম্'—যে গদ্যে পদ্যের একদেশ অম্বিত হয়, তাহাকে বৃত্তগন্ধি গদ্য বলে। যথা,

জয় জয় জনার্দ্দন! সুকৃতি মনস্তড়াগ বিকস্বর চরণপদ্ম! পদ্মপত্র নয়ন!
পদ্মাপদ্মিনীবিনোদ রাজহংস! ভাস্বর যশঃপটলপূরিত ভুবনকুহর!···
অনাথ নাথ! জগন্নাথ! মামনবধি ভবদুঃখব্যাকুলং, রক্ষ রক্ষ![১]

বাঙলা ভাষাতেও অনুরূপ 'Rhythmic prose' বা 'বৃত্ত গন্ধি' গদ্যের অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের রচনা স্বভাবতই ছন্দমুখর। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁহার গদ্যও কবিত্বময়, তাঁহার গদ্য কবিতাগুলি বাদ দিলেও, তাঁহার গদ্য রচনা হইতে অসংখ্য 'বৃত্তগন্ধি' গদ্যের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমরা কয়েকটি বৃত্তগন্ধি গদ্যের দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(১) এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা!···কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিযাছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন। (আনন্দমঠ)

(২) ইতিহাস এই নিমিত্ত সকলকেই সমান আদরে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে যে,—পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মানস কুসুমের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনোমোহনে যত্নশীল হও, 'আমি ভুলিব না'। পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যের উচ্চতর আদর্শ এবং মানুষী শক্তির শ্রেষ্ঠতর বিকাশ দেখাইয়া মনুষ্যকে উন্নতি হইতে উচ্চতর উন্নতিতে লইয়া যাও, 'আমি ভুলিব না'। (নিভৃতচিন্তা)

(৩) কেন বধ করিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত, তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বরণ

১ ছন্দোমঞ্জরী, ষষ্ঠ-স্তবক

কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপন দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর। এ যে করে, সেই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। (রাজর্ষি)

এই সকল গদ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বাক্যবিন্যাসের বা শব্দবিন্যাসের বিশিষ্ট পদ্ধতি হইতেই ছন্দ-স্পন্দনের উদ্ভব হইয়াছে। গদ্যের ছন্দ শব্দের ঝঙ্কারের উপর নির্ভর করে না, শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার দিয়া সাজাইলেও গদ্য ছন্দযুক্ত হয় না। ছন্দের ভিত্তি, ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের স্থূল সম্মিতি: একই মাপের ধ্বনিগুচ্ছ যখন পরিমিত কালানন্তরে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, তখনই ছন্দ-হিল্লোল সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণ গদ্যের কথাবার্ত্তায় এই সম্মিতি বর্ত্তমান থাকে না, তাই তাহাতে ছন্দ থাকে না, কিন্তু যখনই কোন না কোন দিক হইতে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছের সমতা আসে তখনই, 'এতো আর নয় | চাট্টি খানি | কথা'র মতই গদ্যের সাধারণ কথাও ছন্দের তালে নাচিয়া উঠে। যে গদ্যে ছন্দ আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ইহার পূর্ণবাক্য কতকগুলি শ্বাসপর্ব্ব লইয়া গঠিত, এক একটি শ্বাসপর্ব্বে একটি, দুইটি, তিনটি, চারিটি বা ততোধিক শব্দ থাকে, প্রতি পর্ব্বের শব্দ-গুচ্ছের মাত্রাসংখ্যা পদ্যের পর্ব্বের মত সমান না হইলেও, মোটামুটি সমান হয় এবং এই শ্বাসপর্ব্বগুলি অর্দ্ধচ্ছেদানুযায়ী অর্থ-সংগতিও রক্ষা করে। গদ্য আর পদ্যের পর্ব্ব-দৈর্ঘ্যের সমতা-অসমতা স্থির করার একটু বিশেষ আছে। গদ্যের ছেদ নিযন্ত্রিত হয় শ্বাসযন্ত্র দ্বারা আর পদ্যের যতি নিয়ন্ত্রিত হয় জিহ্বাযন্ত্র দ্বারা, শ্বাসের মাপটা স্থূল, জিহ্বার মাপটা সূক্ষ্ম—একটি দাঁড়ি-পাল্লার ওজন, অপরটি একেবারে নিক্তির ওজন, তাহাতে এতটুকু হেরফের হইবার উপায় নাই। এই জন্যই গদ্যের শ্বাসপর্ব্বগুলি মোটামুটি সমান হয়, একেবারে নিক্তির ওজনের মত সমান হয় না। এই শ্বাসপর্ব্ব পুনরাবর্ত্তিত হইয়া ছন্দ-দোলা সৃষ্টি করে, কখনও বা পর্ব্বান্তর্গত ছোট ছোট পদ বা পদ-সমষ্টির মধ্যেও সমতা থাকে, তাহাতেও ছন্দস্পন্দন সৃষ্টি হয়। যেমন,

গদ্য ছন্দের মূল, শ্বাসপর্ব্বের সঙ্গতি

কে : কাহাকে : ধরিয়াছে ?

জ্ঞান আসিয়া : ভক্তিকে ধরিয়াছে, | ধর্ম্ম আসিয়া : কর্ম্মকে ধরিয়াছে,

বিসর্জ্জন আসিয়া : প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে |

কল্যাণী আসিয়া : শান্তিকে ধরিয়াছে।

এই সত্যানন্দ : শান্তি | এই মহাপুরুষ : কল্যাণী,
সত্যানন্দ : প্রতিষ্ঠা | মহাপুরুষ : বিসর্জ্জন।

তেমনই,

কেন বধ করিবে ভাই, | রাজ্যের লোভে ?
তুমি কি মনে কর | রাজ্য কেবল | সোনার সিংহাসন |
হীরার মুকুট | ও রাজছত্র ?
এই মুকুট | এই রাজছত্র | এই রাজ দণ্ডের | ভার কত, | তাহা জান ?

শ্বাসপর্ব্বে সঙ্গতি থাকিলে, একই বাক্যে এইরূপ পর্ব্ব একাধিকবার আবর্ত্তিত হইলে বা একই মাপের ছোট ছোট বাক্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইলে গদ্যেও ছন্দস্পন্দন জাগে ; ইহা লক্ষ্য করিয়াই আধুনিক কালের কবিগণ 'গদ্য কবিতা' রচনা করিতেছেন। বাঙলা দেশে রবীন্দ্রনাথ 'গদ্য কবিতা'র প্রচারক।

বাঙলা গদ্য কবিতা

ছন্দযুক্ত গদ্য (Rhythmic prose) এবং গদ্য কবিতা (Prose verse) ঠিক এক পদার্থ নয়। যে গদ্যে কোন আদর্শ অনুসরণ করিয়া ছন্দ যোজনা করা হয় না, শ্বাসপর্ব্বের স্থূল সঙ্গতি হইতে ছন্দস্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই ছন্দ-গন্ধি গদ্য। সুতীব্র আবেগকে প্রকাশ করিতে গেলে, লেখকের অজ্ঞাত-সারেই রচনায় এইরূপ ছন্দ আসিয়া পড়িতে পারে। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের রচনায় কিংবা Dickens ও De-Quency-র গদ্য রচনায় এই ধরণের শিথিল, অনিয়মিত ছন্দস্পন্দনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে গদ্যছন্দের সুন্দর সুশৃঙ্খল পারিপাট্য লক্ষিত হইলেও, এ সকল রচনা গদ্য কবিতা (Prose verse) হইতে স্বতন্ত্র।

গদ্য কবিতা, কবিতা বলিয়াই দাবি করে। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে এক শ্রেণীর লেখক যেমন আর্টের নির্ব্বাধ মুক্তি (Freedom of Art) ঘোষণা করিয়াছিলেন, তেমনই গদ্য কবিতার লেখকবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন 'Liberation of poetry'। তাহারই ফলে ছন্দের নিয়ম-বন্ধন হইতে কবিতা মুক্তি লাভ করিল, জন্ম হইল গদ্য কবিতার। আমেরিকার সুবিখ্যাত দার্শনিক কবি Walt Whitman প্রমুখ লেখক গদ্য কবিতার মাধ্যমে নিজ হৃদয়ভাব প্রকাশ করিলেন। Whitman-এর 'Leaves of grass'—এইরূপ গদ্য কবিতা। আধুনিক কালে আধুনিক কবিরা অধিকাংশই ইহার অনুকরণে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন।

বাঙলায় গদ্য কবিতার প্রচার করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পূর্ব্বে কবি রাজকৃষ্ণ রায় গদ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহাকে প্রচার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথই সার্থক গদ্য কবিতার স্রষ্টা ও প্রচারক। 'লিপিকা'য় তিনি এক প্রকার গদ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা ঠিক গদ্য কবিতার পর্য্যায়ে পড়ে না। সচেতন হইয়া তিনি এইরূপ কবিতা লেখেন আরও পরে- 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আধুনিক কবিদেব হাতে গদ্য কবিতার বহুল চর্চ্চা হইতেছে। এখন গদ্য কবিতা স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত।

গদ্য কবিতার প্রথম কবি—রাজকৃষ্ণ রায় ও প্রথম প্রচারক—রবীন্দ্রনাথ

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন এইরূপ কবিতা বচনা করিয়াছিলেন, তখনই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। কবি মোহিতলাল মজুমদার এইরূপ কবিতা রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। আধুনিক কালেও অনেকে এই ধরণের গদ্য কবিতাকে পূর্ণ সমর্থন জানাইতে পাবেন নাই। কেহ বলেন, এরূপ ঢঙে কবিতা রচনার সার্থকতাই বা কি? এই সকল প্রতিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। 'পবিচয', 'কবিতা', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি গদ্যে কবিতা বচনাব সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিলে মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এইরূপ দাঁড়ায়:

প্রথমতঃ কবিতায গদ্যরীতি প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি?—ইহাব উত্তরে ববীন্দ্রনাথ বলেন, পদ্যবন্ধেব রীতি ভাবের স্বচ্ছন্দ গতিতে একটা বাধা সৃষ্টি করে। গদ্যের আছে চলার আবেগ, তাহার মুক্তবন্ধ পদক্ষেপ:

সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার
গতি সর্ব্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা।[১]

তাই গদ্যের ভাষায় যদি কবিতাকে প্রকাশ করা যায়, তবে 'সে অনেকটা খোলা জাযগা পায…কাব্য জোবে পা ফেলে চলতে পারে'। গদ্যের স্বাধীন চলার ক্ষেত্রে কাব্যের বৈচিত্র্য ও চরিত্র নিজেকে আবও অধিক পরিস্ফুট করিতে পারে। মাইকেলও ভাবমুক্তির জন্য পয়ারেব শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কেবল মিলের বন্ধন লঙ্ঘন করা, ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, চরণের বন্ধন

১ কাব্যে গদ্যরীতি (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪০)

উল্লঙ্ঘন করিয়া চলার মধ্যেই ইহার বৈচিত্র্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য গদ্যের চালকে রক্ষা করার মধ্যে :

> তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাবে সাজানো
> বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে।
> অর্থাৎ, এর ভঙ্গী পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।[১]

ইহা ছাড়া, আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি আধিভৌতিক ব্যাপার আছে, যেখানে পদ্যছন্দের চাল একান্তই বে-মানান মনে হয়। বিবাহের আসরে, সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসবে—লাল চেলি, ফুলের মালা, ঝাড় লণ্ঠনের রোশনাই, রুনুঝুনু মলের আওয়াজ শোভন, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ধূলি-মলিনতার মধ্যে, সহজ স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মধ্যে—'সপ্তপদী বা চতুর্দ্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না।' তাই প্রতিদিনকার বাস্তব জীবনের কাব্য রচনা করিতে হইলে, কবিতায় পদ্যছন্দ অপেক্ষা গদ্যের রীতিই অধিক শোভন ও কার্যকরী; যে জগৎ প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় রূঢ় অথচ মনোহর, যেখানে আছে ঘাস-কাঁকর, সেখানে গদ্যের জোরে চলাটাই মানানসই। অর্থাৎ জীবন-নির্ভর কাব্য রচনা করিতে হইলে গদ্য রীতিতেই কবিতা রচনা করা সঙ্গত।

গদ্য কবিতা সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি যে, ইহাতে ছন্দ নাই। এ আপত্তিটা অবশ্য প্রথম আপত্তিরই একটা অনুসিদ্ধান্ত (corollary)। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাব্যে ছন্দের প্রয়োজন একান্ত আবশ্যক নয়। যেমন 'সন্ন্যাস ধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধন-ধর্ম্মের সত্যতায়', তেমনই,—

> ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য, তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।... কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা - পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। (কাব্য ও ছন্দ)

---

১ কাব্য ও ছন্দ (কবিতা, পৌষ, ১৩৪৬)

রবীন্দ্রনাথের মতে কাব্য রচনায় 'ছন্দ' একটা বহির্ব্বাস মাত্র। ইহা না থাকিলেও কাব্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় না। কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার উপরে একান্ত নির্ভরশীল নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সলোমনের গান, ডেভিডের গাথা কোন ক্রমেই কাব্যত্বের দাবি করিতে পারিত না। পৃথিবীতে এমন অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে, যাহাতে ছন্দ যোগ করা হয় নাই, অথচ তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। অতএব গদ্যরীতিতে রচিত কাব্যও শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে পারে।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতাকেও ছন্দোবিহীন মনে করেন নাই। তিনি বলেন, 'নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্য্য নেই··· একথা অশ্রদ্ধেয়'। গদ্যের মধ্যেও ছন্দ আছে :

> এমন মেয়ে দেখা যায়, যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে (কাব্যে গদ্য রীতি)।···ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ চলার ভঙ্গীতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তাব দেহে। গদ্য কাব্যের চলন হল সেই রকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ। (গদ্যকাব্য)।···গদ্যেই হোক, পদ্যেই হোক, রসরচনা মাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত (কাব্য ও ছন্দ ।

অতএব গদ্য কবিতাকে যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, ছন্দোহীন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। গদ্য কবিতা—কবিতা। এ কবিতা মুক্তি-পথের পথিক, তাই ইহা 'মুক্তক ছন্দে'র মত। মুক্তক ছন্দে কবিতা পর্ব্ব, চরণ, স্তবক কোন কিছুরই বন্ধন স্বীকার করে না, তবে তাহা পয়ার ছন্দের দ্বৈমাত্রিক চাল এবং কবিতার ভাষাকে স্বীকার করে; গদ্য কবিতা আরও স্বাধীন, ইহার কথা-বলার ভঙ্গি দ্বৈমাত্রিক চালেও নয়, কবিতার ভাষাকে স্বীকার করিয়াও নয়, গদ্যের স্বাভাবিক বলন ও চলন-ভঙ্গিই ইহার ভিত্তি। গদ্যের অন্তর্নিহিত যে ছন্দ অজ্ঞাতসারে কোন কোন লেখকের লেখায় আত্মপ্রকাশ করে, প্রতিভাবান কবি, আপন প্রতিভা দ্বারা সেই ছন্দ আত্মসচেতনভাবে গদ্য কবিতায় সঞ্চারিত করেন, তাহার ফলেই মুক্ত-চরণ, মুক্তবন্ধ, মুক্তগতি গদ্য কবিতার সৃষ্টি হয়। তখন যে গদ্য তর্ক করে, বিচার করে, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তাগিদ মিটায়,

গদ্য কবিতা মুক্ত গদ্যের শিল্পিত রূপ

যাহাকে নীরস, শুষ্ক বলিয়া মনে হয়, তাহাই রূপে-রসে অপরূপ হইয়া উঠে, তখন তাহা হয় গদ্য কবিতা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> গদ্যকে কাব্যের প্রবর্ত্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায়, যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য্য বা অতিমাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়।[১]

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করিলেই সযত্ন-বিন্যস্ত, সংযত পদক্ষেপযুক্ত, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবিলসিত, ছন্দান্বিত মুক্তছন্দ গদ্য কবিতার মাধুর্য্য উপলব্ধ হইবে :—

(১) **বর্ষার গোলাপ***

সাধের ফুল ! | ভিজে গেছিস্ ?
তোর নধর অধরে | ও টল্ টল্ কোচ্চে ?
সুধা ? | মধু ?
না, | ওযে মেঘের। জলবিন্দু।
মেঘ কি নিষ্ঠুর, | ছি ছি ?
সে | কারই আদর জানে না,
আদরের বদলে | কষ্ট দেয়, | পীড়ন করে ;
তুই তার | সাক্ষী। (রাজকৃষ্ণ রায়)

(২) **বাঁশি**

কিনু গোয়ালার | গলি।
দোতলা | বাড়ীর
লোহার গরাদে দেওয়া | একতলা ঘর
পথের | ধারেই। (রবীন্দ্রনাথ)

১ গদ্যকাব্য—রবীন্দ্রনাথ (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৬)

* 'বর্ষার গোলাপ' রাজকুমার রায়ের দ্বিতীয় 'পদ্য পঙ্‌ক্তি পদ্য', প্রকাশকাল ১২৯২ ; ইহার পূর্ব্বে তিনি 'বর্ষার মেঘ' নামে আরও একটি অনুরূপ গদ্য কবিতা রচনা করেন, তাহার প্রকাশ কাল, ৩রা শ্রাবণ, ১২৯১ (দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডাঃ সুকুমার সেন)। তাহা হইলে গদ্য কবিতা রচনার ধারা একেবারে আধুনিক নয়।

(৩) **শিশুতীর্থ**

মেঘ | সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল | পূর্ব্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল | আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্ম্মর | বনপথে পথে | হিল্লোলিত ;
পাখী ডাক দিল | শাখায় শাখায়। (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) **কুঁকড়ো**

পূব আকাশের তীরে | সকালটি ফুটি ফুটি করছে,
ঠিক সেই সময় | আমার মাথার মধ্যে | উথলে উঠতে থাকে সুর,
আর গান,
বুক আমার | কাঁপতে থাকে | তারি ধাক্কায়,
আর | আমি বুঝি,
আমি না হ'লে | সরস মাটির | এই সুন্দর পৃথিবীর
বুকের কথা | খুলে বলাই হবে না। (অবনীন্দ্রনাথ)

(৫) **চিল্কায় সকাল**

কী ভালো আমার লাগলো | আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে | বলি।
কী নির্ম্মল | নীল এই আকাশ, | কী অসহ্য সুন্দর ;
যেন গুণীর কণ্ঠের | অবাধ | উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে | দিগন্তে ঃ
কী ভালো আমার লাগলো | এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিকে | সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, | কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে | চিল্কা উঠেছে ঝিল্‌কিয়ে। (বুদ্ধদেব বসু)

গদ্য কবিতায় গদ্যের শিল্পিত রূপ প্রতিফলিত হয়। মুক্তগতি, মুক্তচরণ গদ্যের এখানে সুসংযত, সুশৃঙ্খল পদবিক্ষেপ। কথায় বলা গদ্যই ইহার প্রধান অবলম্বন, ইহার চরণগুলি অর্থানুযায়ী সাজানো। প্রতি চরণ কয়েকটি শ্বাসপর্ব্বে বিভক্ত ; প্রতি চরণে কমপক্ষে দুইটি পর্ব্ব থাকেই। পর্ব্বগুলি শ্বাসপর্ব্ব বলিয়াই ইহাদের ওজন নিক্তির ওজনের মত সূক্ষ্ম ও সমান নয়। প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব্বই পরস্পর অসমান। এক একটি পর্ব্বে এক, দুই,

তিন বা ততোধিক গোটা শব্দ থাকে, কোথায়ও বিচ্ছিন্ন শব্দ লইয়া পর্ব্ব গঠিত হয় না। পর্ব্বান্তর্গত শব্দগুলির মাত্রারও কোন সম্মিতি নাই। চরণগুলি পূর্ণচ্ছেদ না আসা পর্য্যন্ত অসমাপ্তগতি, কাজেই ভাব ইচ্ছানুযায়ী প্রবহমাণ। এইরূপ কয়েকটি চরণ লইয়া পূর্ণভাবজ্ঞাপক এক একটি স্তবক গঠিত হয়। অতএব গদ্য কবিতাও পদ্যের মতই একটি আদর্শ বা পরিপাটিকে অনুসরণ করে: কেবল পার্থক্য এই যে পদ্যছন্দের পর্ব্ব, চরণ, স্তবক যেমন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা, দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা মানিয়া চলে, গদ্য কবিতায় সবই স্বাধীন—পর্ব্ব অক্ষর বা মাত্রাদৈর্ঘ্যের কোন সম্মিতি রক্ষা করে না, প্রতি চরণ সমান সংখ্যক পর্ব্ব লইয়া গঠিত হয় না, ভাবানুসারে (অর্থানুসারে) ইহা দীর্ঘ বা হ্রস্ব হয় এবং স্তবকগুলিও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চরণদ্বারা গঠিত হয় না। গদ্য কবিতাই প্রকৃত 'মুক্তবন্ধ' কবিতা। ইহা স্বাধীন কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নয়, ইহার ছন্দ প্রত্যক্ষ নয়, অন্তর্নিহিত; ইহার পারিপাট্য, সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা অনুভববেদ্য।

গদ্য কবিতা সম্পর্কে আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকেই বলিযা থাকেন, প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ়তা, তুচ্ছতাকে পরিস্ফুট করার মধ্যেই গদ্যকবিতার সার্থকতা। গভীর, গম্ভীর, সুমহান ভাবকে বিকশিত করিবার যোগ্যতা ইহার নাই। ইহা কোনক্রমেই সত্য নয়। সত্য বটে গদ্য কবিতা 'নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডী' রচনা করে, 'কুঁকড়ো'র গান গায়, 'কিনু গোয়ালার গলি'র জীবন ও ছবি অঙ্কন করে, কিন্তু ইহা দ্বারা গভীর গম্ভীর দার্শনিক কল্পনাকেও রূপ দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ' বা 'শিশুতীর্থ' কবিতাগুলি তাহার সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়াই উপসংহার করি,

> প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিযে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যের বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য। (কাব্যে গদ্যরীতি)

ছন্দো-বিশ্লেষণ (Scansion)

ছন্দের গঠন

ছন্দোবিশ্লেষণ করিতে হইলে ছন্দের গঠনপ্রকৃতিটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়।

(১) যে কোন শ্রেণীর ছন্দই হউক, প্রত্যেক ছন্দেই কয়েকটি চরণ লইয়া একটি **স্তবক** গঠিত হয়। স্তবকের প্রচলিত অর্থ হইল 'থোকা' অর্থাৎ কয়েকটি চরণের সমষ্টি।

(২) **চরণ** হইল একটি পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ। চরণের অন্তে শ্বাসযন্ত্র ও বাগ্‌যন্ত্র বিরতি গ্রহণ করে অর্থাৎ ছেদ ও যতি একসঙ্গে অবস্থান করে। অর্থেব দিক হইতে বিচার করিলে কবিতার চরণকে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বলা চলে, অবশ্য চরণ সব সময়ে পূর্ণ বাক্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু অর্থের দিক দিয়া একটি সঙ্গতি থাকে, যেমন 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান', 'সিনান দোপর সময় জানি', 'হাত ঘুরুলে নাড়ু দেব'। ধ্বনি ও অর্থের মোটামুটি পূর্ণতা লইয়াই চরণ গঠিত হয়।

(৩) প্রত্যেকটি চরণ আবার গঠিত হয় কতকগুলি সমান মাপের **পর্ব্ব** লইযা। পর্ব্বই বাঙলা ছন্দ গঠনের প্রধান উপকরণ। ইহা মধ্যযতি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া চরণ মধ্যে অবস্থান কবে এবং 'লয়'এর প্রকার ভেদ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কালানন্তরে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয। সাধারণতঃ একটি চরণে দুইটি হইতে চারিটি পর্য্যন্ত পর্ব্ব থাকে। ইহার অতিরিক্ত অতিপর্ব্বিক ধ্বনিও চরণমধ্যে অবস্থান করিতে পারে, যেমন, '(ওগো মা) রাজার দুলাল | যাবে আজি মোর | ঘরের সমুখ | পথে'।

(৪) পর্ব্বগুলি গঠিত হয কতকগুলি শব্দ বা **অক্ষর** সমষ্টি লইয়া। একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরে দুইটি করিযা অক্ষর থাকিতে পারে, উচ্চারণকালে তাহা ধরা পড়ে। অক্ষরধ্বনির সংখ্যা অনুসারে পর্ব্বের মাত্রা স্থিরীকৃত হয়। একটি পর্ব্বে চার হইতে দশটি পর্য্যন্ত অক্ষর বা মাত্রা থাকিতে পারে।

এইভাবে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মাত্রা লইয়া একটি পর্ব্ব, কয়েকটি সমান দৈর্ঘ্যের পর্ব্ব লইয়া একটি চরণ এবং কয়েকটি চরণ লইয়া একটি স্তবক গঠিত। ইহাই বাঙলা ছন্দ গঠনের মূল সূত্র।

ছন্দের বিশ্লেষণ

ছন্দ বিশ্লেষণ করিতে হইলে, ছন্দের এই উপকরণ-গুলিকে পৃথক করিয়া দেখাইতে হয়।

(১) পর্ব্বই বাঙলা ছন্দের প্রধান উপকরণ। প্রথমতঃ চরণান্তর্গত পর্ব্বগুলিকে চিনিয়া লইতে হয়। যতিখণ্ডিত হইয়া এই পর্ব্ব চরণমধ্যে অবস্থান করে। একটি চরণ বার বার পাঠ করিলে, কোথায় মধ্যযতি পড়ে, কানই তাহা স্থির করিয়া দেয়। যতির স্থান অনুসারে পর্ব্বগুলি ভাগ করিয়া ফেলিতে হয়। একটি চরণে দুইটি, তিনটি অথবা চারিটি করিয়া পর্ব্ব থাকে।

(২) পর্ব্ব বিভাগ করিলে দেখা যাইবে, পর্ব্বগুলি ধ্বনি-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে সমান। অর্থাৎ প্রত্যেক পর্ব্বে সমানসংখ্যক অক্ষর বা মাত্রা থাকে। অনেক সময় শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিদ্বারা পর্ব্বের অক্ষরসংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এইজন্য, কেবল মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরে যে পর্ব্বটি গঠিত তাহাকে বাহির করিতে হয়। ব্যতিক্রম থাকিলেও মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের স্বর সর্ব্বদাই হ্রস্ব, এবং একমাত্রার। অতএব মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত পর্ব্বের অক্ষর (মাত্রা) সংখ্যা দ্বারা, পর্ব্বটি কয় মাত্রার অর্থাৎ পর্ব্বটির দৈর্ঘ্য কি, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। অন্যান্য পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যাও এই পর্ব্বটির মাত্রাসংখ্যার সমান, কেবল শেষের পর্ব্বটি দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হয়। যেমন, উঠিতে বসিতে | করে বাপান্ত | শুনেও শুনে না | কানে,—এই চরণটি চারটি পর্ব্ব লইয়া গঠিত। এই পর্ব্বগুলির মধ্যে 'উঠিতে বসিতে'—এই পর্ব্বটি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বারা গঠিত, ইহাতে ছয়টি অক্ষর আছে। অতএব বলা যায় এই ছন্দ **ষণ্মাত্রিক পর্ব্ব** লইয়া রচিত।

(৩) পর্ব্ব বিভাগ ও মাত্রা স্থির হইয়া গেলে, কয়টি পর্ব্ব লইয়া চরণ রচিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। শেষের পর্ব্বটি পূর্ণ পর্ব্বের সমান কিনা, অর্থাৎ তাহা পূর্ণ পর্ব্ব হইতে হ্রস্ব না দীর্ঘ অর্থাৎ অপূর্ণপদী (Catalectic), না অতিপূর্ণপদী (Hypermetrical) তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হয় এবং চরণে যদি অতিপর্ব্বিক কোন ধ্বনি থাকে, তাহারও উল্লেখ করিতে হয়। যেমন,

'(আমি) ছেড়েই দিতে | রাজি আছি | সুসভ্যতার | আলোক'

—ইহা চতুষ্পর্ব্বিক চরণ, শেষের পর্ব্বটি ('আলোক') অপূর্ণপদী, ইহাতে একটি অতি-পর্ব্বিক ধ্বনিও আছে ('আমি')।

(৪) তাহার পরে কয়টি চরণ লইয়া একটি স্তবক গঠিত, তাহার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হয়। প্রত্যেকটি চরণ সমপর্ব্বিক না অসমপর্ব্বিক, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি চরণান্তিক মিল থাকে, তবে চরণ 'অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত' এবং মিল না থাকিলে 'অন্ত্যানুপ্রাসহীন'—এই কথা বলিয়া দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে চরণ যদি অসমাপ্তগতি চরণ হয়, চরণের পর চরণে যদি প্রবহমাণতা থাকে, অথবা ছন্দটি পাঠ করিবার রীতি যদি ছেদানুযায়ী হয়, তবে ইহা সমিল বা অমিল প্রবহমাণ (অমিত্রাক্ষর) ছন্দ-- এইরূপ উল্লেখ করিতে হয়।

(৫) পরিশেষে পর্ব্বোচ্চারণের 'লয' বিচার করিতে হয়। লয় দ্রুত, না মধ্যম, না বিলম্বিত—তাহা নির্ণীত হইলেই ছন্দের শ্রেণী চেনা যায়; তখন ইহা অক্ষরবৃত্ত (পয়ার), না মাত্রাবৃত্ত, না শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ, তাহার নাম উল্লেখ করিতে হয়।

—ইহাই মোটামুটি ছন্দোবিশ্লেষণের নিয়ম। অবশ্য ছন্দের শ্রেণী অনুসারে এক একটি পর্ব্বের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয় উচ্চারণ-ভঙ্গিও পৃথক হয় এবং আরও নানারূপ জটিলতা থাকে। আমরা নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি ছন্দের ছন্দোলিপি দিয়া যথাসম্ভব ছন্দোলিপি নির্ম্মাণের পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতেছি।

[ক] ছড়ার ছন্দ (স্বরবৃত্ত, শ্বাসাঘাত প্রধান বা দ্রুতলয়ের ছন্দ)

(i) এই ছন্দে পূর্ণ পর্ব্ব স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরের মিশ্রণে গঠিত হয়; (ii) প্রতি পর্ব্বে চারিটি করিয়া অক্ষর থাকে; (iii) পূর্ণ পর্ব্বের অক্ষরের স্বর কোনটিই দীর্ঘ নয়, সব হ্রস্ব, যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর বিশ্লিষ্ট করিয়া লিখিলেও এক অক্ষর এক মাত্রা। যেমন, 'কেউ', 'যাও',—এক অক্ষর, এক মাত্রা; (iv) প্রতি পর্ব্বেব প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে; (v) সাধারণতঃ চরণগুলি চতুষ্পর্ব্বিক হয এবং শেষের পর্ব্বটি অপূর্ণপদী; (iv) ইহাব উচ্চারণের 'লয়' অতি দ্রুত।

ইহার ছন্দোলিপি করিতে, পর্ব্ব-বিভাগ করিয়া, পর্ব্বান্তর্গত স্বরগুলির মাত্রাসংখ্যা চিহ্নিত করিতে হয় এবং যে স্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তাহাও চিহ্ন দিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। এক মাত্রা বা দুই মাত্রা বুঝাইতে অক্ষরের উপরে যথাক্রমে এক দাঁড়ি (।) এবং দুই দাঁড়ি (॥) এবং শ্বাসাঘাত বুঝাইতে অক্ষরের পূর্ব্বে '/' চিহ্ন ব্যবহৃত হইল।

(১) ´রৌদ্র তখন | ´মাথার পরে | ´পায়ের তলায় | ´মাটি
´জলের তরে | ´কেঁদে মরে | ´তৃষায় ´ফাটি | ´ফাটি

(২) ´ঘুমটি ভাঙ্গে | ´পাখীর ডাকে | ´রাতটি যে পো | ´হালো
´ভোরের | বেলা ´চাঁপায় পড়ে | ´চাঁপার মতো | ´আলো

উভয় ছন্দেই পর্ব্ব চতুর্ম্মাত্রিক। চরণ চতুষ্পর্ব্বিক ; শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী (দুই মাত্রা)। স্তবক সমপর্ব্বিক দুই চরণের, চরণগুলি অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত। প্রতি পর্ব্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত এবং উচ্চারণের লয় দ্রুত ; অতএব ইহা দ্রুত লয়ের শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ।

এইগুলিই শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের সাধারণ প্রচলিত রূপ। কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ইহাদের অন্যরূপ চরণ সজ্জাও দেখা যায়, যেমন,

(৩) ´আকাশ তলে | ´দলে দলে | ´মেঘ যে ডেকে | ´যায়
´আয় আয় আয় |
´আমের বনে | ´জামের বনে | ´রব উঠেছে | ´তাই
´যাই যাই যাই |

প্রথম ও তৃতীয় চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, পর্ব্ব চতুর্ম্মাত্রিক ; শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী (এক মাত্রা)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে একটি করিয়া চতুর্ম্মাত্রিক পর্ব্ব, শেষ অক্ষরের স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ। প্রতি পর্ব্বের আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাত, লয় দ্রুত। অতএব ইহা দ্রুত লয়ের শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ।*

(৪) ´তোরাই শুধু | ´শুনলি নে বে | ´কোথায় বসে | রৈলি ঘেরে
´দ্বারের কাছে | ´গেল গেয়ে | ´গেয়ে,
´কেউ তাহারে | ´দেখ্‌লি নেতো | ´চেয়ে।

* এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের প্রত্যেক স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ হয়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে পর্ব্বসম্মিতি রক্ষার জন্য কোন স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যে পর্ব্বে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর তিনটি থাকে, সেখানে একটি অক্ষর টানিয়া পূর্ণ উচ্চারিত হয়, যেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর মাত্র দুইটি থাকে, সেখানে দুইটিই দীর্ঘ হয়। যেমন, আই আই | এই বুড়া কি | ওই গৌরীর | বর লো—এখানে 'আই আই'-এর প্রত্যেকটি দীর্ঘ ও দুই মাত্রা।

প্রথম চরণে চারিটি পর্ব্ব, প্রত্যেকটি চতুর্ম্মাত্রিক ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে তিনটি করিয়া পর্ব্ব, প্রথম দুইটি চতুর্ম্মাত্রিক, শেষেরটি দুই মাত্রার। প্রতি পর্ব্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত, লয়ও দ্রুত। অতএব ইহা দ্রুত লয়ের শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। এই ছন্দে প্রথম চরণের শেষে একটি পূর্ণ পর্ব্ব রাখিয়া প্রবহমাণতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। স্তবক-সজ্জারও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তিন চরণের স্তবক।

প্রবহমাণ শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের আরও একটি দৃষ্টান্ত :—

(৫) / । । । । / । ।
ছোট্ট আমার | মেয়ে

/ । । । । / । । ॥ / । ।
সঙ্গিনীদের | ডাক শুন্‌তে | পেয়ে

/ । । । । / । । । । / । । । । / । ।
সিঁড়ি দিয়ে | নীচের তলায় | যাচ্ছিল সে | নেমে

/ । । । । / । । । । / । । । ।
অন্ধকারে | ভয়ে ভয়ে | থেমে থেমে।

প্রথম চরণে দুইটি পর্ব্ব, একটি চতুর্ম্মাত্রিক, অপরটি অপূর্ণপদী (দ্বিমাত্রিক) ; দ্বিতীয় চরণে তিনটি পর্ব্ব, শেষেরটি অপূর্ণপদী ; চতুর্থ চরণে চারিটি পর্ব্ব, শেষেরটি অপূর্ণপদী। এইরূপ ছন্দে চরণগত ঐক্য না থাকিলেও এগুলি বৈচিত্র্যের জন্য উপভোগ্য।

(৬) / / /
কৃষ্ণকলি | আমি তারেই | বলি

/ / /
কালো তারে | বলে গাঁয়ের | লোক।

/ / /
মেঘলা দিনে | দেখেছিলাম | মাঠে,

/ / /
কালো মেয়ের | কালো হরিণ | চোখ।

—প্রতিটি চরণ ত্রি-পর্ব্বিক, শেষের পর্ব্ব অপূর্ণপদী।

বাঙলার শাক্ত সঙ্গীত, বাউল গানেও শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,—

(৭) / / / /
আন তারা | ত্বরায় গিরি | নয়নে লু | কায়ে রাখি।

/ / / /
হেরিয়ে গ | গন তারা | মনে হলো | প্রাণের তারা

/ / / /
তারাহ্রদে | তারার ধারা | (আমি) তারায় দেখে | মুদি আঁখি।

ইহা চতুর্মাত্রিক, পূর্ণপদী চতুষ্পর্ব্বিক চরণযুক্ত শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে নিম্নরেখ শব্দগুলি খণ্ডিত হইয়া দুইটি পর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে। তৃতীয় চরণের তৃতীয় পর্ব্বের 'আমি' অতিপর্ব্বিক ধ্বনি।

নিম্নলিখিত ছন্দটি চতুর্মাত্রিক, চতুষ্পর্ব্বিক, শেষের পর্ব্বটি অপূর্ণপদী সাধারণ ছড়ার ছন্দ। কেবল ইহার প্রতি চরণের পূর্ব্বে একটি করিয়া অতিপর্ব্বিক ধ্বনি আছে। অতিপর্ব্বিক ধ্বনিগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে :

(৮) (মা) ´নিম্ খাওয়ালে | ´চিনি বলে | ´কথায় করে | ´ছলো।
(ওমা) ´মিঠের লোভে | ´তিত মুখে | ´সারাদিনটা | ´গেলো॥
(রাম)-´প্রসাদ বলে | ´ভবের খেলায় | ´যা হবার তাই | ´হলো।
(এখন) ´সন্ধ্যা বেলায় | ´কোলের ছেলে | ´ঘরে নিয়ে | ´চলো॥

কতকগুলি শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ দেখিয়া মনে হয়, সেগুলি মাত্রাবৃত্ত অথবা অক্ষরবৃত্ত জাতীয় ছন্দ, কারণ মাত্রাবৃত্ত ছন্দও চারিমাত্রার চতুষ্পর্ব্বিক হইতে পারে এবং অক্ষরবৃত্তের চাল দ্বৈমাত্রিক বলিয়া, ইহাও চারিমাত্রার পর্ব্বাঙ্গ লইয়া গঠিত হইতে পারে। যেমন,—

(৯) **মাত্রাবৃত্তের ঢঙে বলবৃত্ত**

(ক) ´আমি যদি | ´জন্ম নিতেম | ´কালিদাসের | ´কালে
´বন্দী হতেম | ´না জানি কোন্ | ´মালবিকার | ´জালে (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) ´গঙ্গা আমার | ´পূজ্যতমা | ´সবিৎরূপা | ´দেবী
´মৃত্তিকাতে | ´অমৃত তার | ´পুণ্যসলিল | ´সেবি' (কুমুদরঞ্জন)

(গ) ´সিন্ধু তুমি | ´বন্দনীয় | ´বিশ্ব তুমি | ´মাহেশ্বরী
´দীপ্ত তুমি | ´মুক্ত তুমি | ´তোমায় মোরা | ´প্রণাম করি।
(সত্যেন্দ্রনাথ)

উপরের প্রত্যেকটি ছন্দকেই পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত করা যায়। কিন্তু দেখা যাইবে মাত্রাবৃত্তের ঢঙে পড়িলে কোন পর্ব্ব ছয় মাত্রা, কোনটা চার মাত্রা, কোনটা পাঁচ মাত্রা হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, 'জন্ম নিতেম্' (ছয় মাত্রা),

'কালিদাসের' (পাঁচ মাত্রা), 'অমি যদি' (চার মাত্রা)। কিন্তু শ্বাসাঘাত দিয়া পড়িলে পর্ব্বসম্মিতি ঠিক থাকে। অবশ্য (গ) নং উদাহরণটি মাত্রাবৃত্তের ঢঙে সর্ব্বত্রই নির্ভুল পাঁচ মাত্রা হয়; কিন্তু মাত্রাবৃত্তের বিশেষ পর্ব্বগুলিই এইরূপ স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের মিশ্রণে গঠিত হয়, সাধারণ-পর্ব্ব গঠিত হয় কেবল স্বরান্ত অক্ষর লইয়া; আর শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের সাধারণ-পর্ব্ব গঠিত হয় ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে, অর্থাৎ ইহার সাধারণ-পর্ব্ব স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের মিশ্রণে গঠিত হয়, কেবল বিশেষ-পর্ব্ব গঠিত হয় সরল স্বরান্ত অক্ষর লইয়া। অতএব মূলতঃ ইহা চতুষ্পর্ব্বিক, চতুর্মাত্রিক বল-প্রধান ছন্দ।

(১০) অক্ষর বৃত্তের ঢঙে বলবৃত্ত

(ক) /শমন দমন | /রাবণ রাজা | /রাবণ দমন | /রাম।
/শমন ভবন | /না হয় গমন | /যে লয় রামের | /নাম॥

(খ) /শিব শিবা | /বন্দি গাঞ্জি | /ফুলেশ্বরী | /নদী।
/যার জলে | /তৃষ্ণা দূর | /করে নির | /বধি॥

(গ) /কি করিব | /রাজসুখ গো | /রাজ সিংহা | /সনে।
/শত রাজ্য | /পাট আমার গো | /প্রভুর চ | /রণে॥

[খ] পদের ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত, ধ্বনি-প্রধান বা মধ্যলয়ের ছন্দ)

(i) এই ছন্দের সাধারণ পর্ব্ব কেবল স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত হয়, বিশেষ পর্ব্বে স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরই থাকে, (ii) ইহার মাত্রা গণিবার পদ্ধতি অনেকটা প্রাচীনপন্থী, আধুনিক মাত্রাছন্দে সব যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর দুই মাত্রার ধরা হয়; (iii) ইহার পর্ব্বগুলি চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আট মাত্রার অক্ষর লইয়া গঠিত হয়; (iv) উচ্চারণের 'লয়' মধ্যম; (v) সর্ব্বোপরি এই ছন্দে প্রায় প্রতি পর্ব্বেই স্বরের দীর্ঘ অস্বাভাবিক উচ্চারণের ফলে একটি ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

মাত্রাছন্দের ছন্দোলিপি করিতে হইলে প্রথমে ইহার পর্ব্বগুলি ভাগ করিয়া ফেলিতে হয়; পর্ব্বান্তর্গত স্বরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ উপরে চিহ্নিত

করিয়া দিতে হয়; পর্ব্বগুলি কয় মাত্রার পর্ব্ব তাহা উল্লেখ করিতে হয়। কেবল স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত একটি সাধারণ পর্ব্ব লইয়া পর্ব্বটি কয় মাত্রার, তাহা স্থির করা যায়। সেই মাত্রাসংখ্যা অনুসারে অন্যান্য পর্ব্বের কোন্ অক্ষরের উচ্চারণ অস্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ কোন্‌টি টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব। নিম্নে কয়েকটি আদর্শ ছন্দোলিপি প্রদত্ত হইল।

|| || || || || ||
(১) সাত ভাই | চম্পা | জা-গো-

|| || | | || || ||
জা-গো- | জাগো মোর | সাত ভাই !

| | || | | ||
নিদাঘের | ভোরে শোন্

| | | | || ||
ডাকিছে পা | রুল্ বোন্,

| || | | | || || ||
অরণ্য | মাঝে আর | রাত নাই।

|| | | || | | | | ||
চম্পা গো | চম্পা গো, | জাগো ভাই।

পর্ব্ব — চতুর্ম্মাত্রিক। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ চরণে পূর্ণপদী তিনটি পর্ব্ব; তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ দ্বিপার্ব্বিক (পূর্ণপদী)। তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে চরণান্তিক মিল। ছয় চরণের স্তবক। ইহার লয় মধ্যম। ইহা ধ্বনি-প্রধান মাত্রাছন্দ।

| || | | | || | | | | | || | |
(২) জগৎ জুড়ে | উদাস সুরে | আনন্দ গান | বাজে

| || | | | || | | | | | | | | |
সে গান কবে | গভীর রবে | বাজিবে হিয়া | মাঝে।

| || || | | | | | | | | | | | | |
বাতাস জল | আকাশ আলো | সবারে কবে | বাসিব ভালো

| || | | | | | | | | | | | | | | |
হৃদয় সভা | জুড়িয়া তারা | বসিবে নানা | সাজে।

পর্ব্ব পঞ্চমাত্রিক। চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী, কেবল তৃতীয় চরণ পূর্ণপদী। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ মিত্রাক্ষর। লয় বিলম্বিত। ইহা পাঁচ মাত্রার চালের মাত্রাছন্দ। প্রথম চরণের তৃতীয় পর্ব্ব 'আনন্দ গান' ছয় মাত্রার হইলেও পড়িবার সময় পাঁচ মাত্রার করিয়াই পড়িতে হইবে।

| ‖ | | | | | ‖ | |
(৩) ব্যাকুল বুকে | চাপিনু দুই | বাহু

| | | | | | | | ‖ ‖
না মানে বাধা | হৃদয় কম্ | পন্

| | | | | | | | | | ‖
ভূতলে বসি | আনত করি | শির

| | | | | | | | ‖ ‖
মুদিত আঁখি | করিনু চুম্ বন্

এই ছন্দটিও পঞ্চমাত্রিক প্রতি চরণ ত্রিপর্ব্বিক, শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী।

| | ‖ ‖ ‖ | | ‖ ‖
(৪) হু-হু হুংকার, | ঝর্ঝর ব | র্ষণ

| | | ‖ | ‖ ‖ | | ‖ | | ‖ | ‖
সঘন শূন্যে | বিদ্যুৎঘাতে | তীব্র কী হ | র্ষণ

‖ ‖ ‖ | |
দুর্দ্দাম্ প্রেম | কি এ

‖ ‖ | | | | ‖ ‖ ‖ | | | | | | |
প্রস্তর ভেঙ্গে | খোঁজে উত্তর | গর্জ্জিত ভাষা | দিযে

পর্ব্ব ষণ্মাত্রিক। চরণগুলি অসমপদী, প্রথম চরণে তিন, তৃতীয় চরণে দুই, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে চারটি করিয়া পর্ব্ব, প্রতি চরণের শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী; দুই চরণে মিত্রাক্ষর। বিলম্বিত লযেব ধ্বনি-প্রধান মাত্রাছন্দ। চরণান্তিক 'বর্ষণ', 'হর্ষণ' প্রভৃতিকে 'বর্‌ষণ্', 'হর্‌ষণ্' করিয়া পড়িলে মাত্রা গণনার সুবিধা হয়।

| | | | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | | | | |
(৫) তুমি জীবনের | পাতায় পাতায় | অদৃশ্য লিপি | দিয়া

| | | | ‖ | | | | | | ‖ ‖ | | | |
পিতা মহদের | কাহিনী লিখেছ | মজ্জায় মিশা | ইয়া

| | ‖ | | | | | | | ‖
যাহাদের কথা | ভুলেছে সবাই

| | | | ‖ | | | | ‖
তুমি তাহাদের | কথা ভোল নাই

| | ‖ | | | | | | | ‖ | | ‖ | | ‖
ভাষা দাও তারে | হে মুনি অতীত, | কথা কও, কথা কও

পর্ব্ব ষণ্মাত্রিক। প্রথম দুই চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ দ্বিপর্ব্বিক, পূর্ণপদী। পঞ্চম চরণ ত্রিপর্ব্বিক, পূর্ণপদী। প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে মিত্রাক্ষর।

(৬) তুমি জান নাথ | তুমি জান

যবে মানবের | বিচার শালায় | অবিচার পাব | দান

যখন লুকানো | নিন্দা আমারে | আঁধারে হানিবে | বাণ ;

সহিব নীরবে | কহিব তখন, | 'তুমি জান নাথ | তুমি জান ।'

পর্ব্ব ষণ্মাত্রিক। প্রথম চরণ দ্বিপর্ব্বিক শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী। শেষ চরণের শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী, চতুর্ম্মাত্রিক। চরণের মিল মধ্যসম।

(৭) গগনে অব ঘন | মেহ দারুণ | সঘনে দামিনী | ঝলকই।

কুলিশ পাতন | শবদ ঝন ঝন | পবন খরতর | বল গই ॥

(সজনি,) আজু তুরদিন | ভেল

হামারি কান্ত। নিতান্ত আগুসরি | সঙ্কেত কুঞ্জহি | গেল

পর্ব্ব সপ্তমাত্রিক। চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী (চতুর্ম্মাত্রিক) ; তৃতীয় চরণে তুইটি পর্ব্ব, শেষেরটি অপূর্ণপদী, ইহার প্রথমে অতিপর্ব্বিক 'সজনি' শব্দটি রহিয়াছে। চরণ মিত্রাক্ষরযুক্ত। চতুর্থ চরণের তৃতীয় পর্ব্ব 'সঙ্কেত কুঞ্জহি' আট মাত্রার হইলেও, এক মাত্রা সঙ্কুচিত করিয়া পড়িতে হইবে।

(৮) আজু রজনী হাম | ভাগে পোহায়নু | পেখনু পিয়া মুখ | চন্দা।

জীবন যৌবন স | ফল করি মাননু | দশদিশ ভেল নির | দন্দা ॥

অষ্টমাত্রিক পর্ব্ব। চরণ চতুষ্পর্ব্বিক, শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণপদী বলিয়া ইহাকে তৃতীয় পর্ব্বের সহিত একসঙ্গে উচ্চারণ করিয়া এইরূপ ছন্দকে মাত্রাবৃত্তের ত্রিপদীর রূপ দেওয়া হয়। এই ছন্দের লয় মধ্যম। অতএব ইহা মধ্যলয়ের ধ্বনি-প্রধান, মাত্রাছন্দ।

এই ছন্দ প্রাচীন পাদাকুলকের তৎসমরূপ। বিদ্যাপতির 'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা', 'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়', গোবিন্দদাসের 'কণ্টক গাড়ি', রবীন্দ্রনাথের, 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান', 'অয়ি, ভুবনমনোমোহিনি' বা 'জন-গণ-মন' প্রভৃতি আট মাত্রার চালে লেখা

মাত্রাছন্দ। চর্য্যাগীতিকায় এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে 'পাদাকুলক' ছন্দ তো আছেই—'অতিশক্করী' জাতীয় আট+সাত মাত্রার ছন্দেও অনেক কবিতা রহিয়াছে, যেমন,—

(৯) যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে | তনু তনু জ্যোতি। =৮+৭
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চ | মক ময় হোতি॥

(১০) অন্তরে জানিয়া | নিজ অপরাধ। =৮+৭
করজোড়ে মাধব | মাগে পর সাদ॥

মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত-বেশী যেমন বলবৃত্ত আছে, তেমনই আবার বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত-বেশী মাত্রাছন্দ দেখা যায়। সাবধানে ইহাদের ছন্দ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বলবৃত্ত-বেশী মাত্রাছন্দ

(১১) (ওই) সিন্ধুর টিপ্ | সিংহল্ দ্বীপ | কাঞ্চন্‌ময়্ | দেশ্
(ওই) চন্দন্ যার্ | অঙ্গের্ বাস্ | তাম্বুল বন্ | কেশ্

এই ছন্দের প্রতি পর্ব্বের প্রথমে প্রবল শ্বাসাঘাত রহিয়াছে, মনে হইতে পারে ইহা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ। কিন্তু শ্বাসাঘাত-প্রধান-ছন্দের চতুরক্ষর, চতুর্ম্মাত্রিক পর্ব্ব এখানে নাই। 'আয় আয় সই' এই পর্ব্বোচ্চারণের নিয়মানুযায়ী ইহাকে কোন প্রকারে শ্বাসাঘাত প্রধান করা যায় বটে, কিন্তু ইহাকে ষণ্মাত্রিক পর্ব্বের মাত্রাছন্দও বলা যায়।

(১২) নন্দপুর্ | চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার্
চলে না চল্ | মলয়া নিল | বহিয়া ফুল | গন্ধভার

এই ছন্দটিকেও শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ওই ছন্দের রীতি অনুযায়ী পাঠ করিলে প্রথম চরণের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রাসংখ্যা কম পড়ে এবং 'ফুল'-এর 'ল'কে স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় পর্ব্বে মাত্রাসংখ্যা বেশী হয়। মাত্রাছন্দের নিয়মানুযায়ী প্রতি যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রার ধরিলে, ইহা পঞ্চমাত্রিক পর্ব্বের চতুষ্পর্ব্বিক ছন্দ হয়, তাহাতে ছন্দেরও পতন হয় না। অতএব ইহাকে বলবৃত্ত-বেশী মাত্রাবৃত্ত বলা যায়।

অক্ষরবৃত্ত-বেশী মাত্রাছন্দ

(১৩) আনিব তুলিয়া | গগন ফুল
একেক ফুলের | লক্ষেক মূল
সে ফুল গাথিয়া | পরাব হার
সোনার বাছারে | না কান্দ আর

ইহাকে বলা হয় এগার অক্ষরের এগার মাত্রার একাবলী পয়ার। কিন্তু এই ছন্দে তাল অপেক্ষা ধ্বনির প্রাধান্য। লয়ও বিলম্বিত নয়, মধ্য। মাত্রাবৃত্তের নিয়মে ইহাকে ষণ্মাত্রিক পর্ব্বের, দ্বিপর্ব্বিক চরণের ছন্দ বলা চলে। তাহা ছাড়া, ইহা যদি একাদশাক্ষরা সংস্কৃত ছন্দই হয়, তাহা হইলেও ইহাকে তৎসম মাত্রাছন্দের পর্য্যায়েই ফেলা উচিত।

(১৪) ষণ্মাত্রিক বা অষ্টমাত্রিক অনেক ত্রিপদী পয়ারেও মাত্রাছন্দের রেশ বর্ত্তমান। এই সমস্ত ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত দুই-ই বলা চলে, যেমন,

(১) লতা তরু যত | দেখে শত শত | অকালে খসিছে | পাতা
রবির কিরণ | না হয় স্ফুটন | মেঘগণ দেখে | রাতা

(২) সম্মুখে চারু ঘট | আদি চারু পট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি
সঙ্কল্প সমাচরি | সন্ধ্যাধিবাস করি
বিধান-বিজ্ঞ ভাল বিধি

[গ] **পয়ার ছন্দ (অক্ষরবৃত্ত, বিলম্বিত লয়ের তাল-প্রধান ছন্দ)**

(i) পয়ার ছন্দের দীর্ঘ মূল পর্ব্ব কেবল স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত ; এই পর্ব্ব দেখিয়া পর্ব্বের অক্ষর ও মাত্রা স্থির করিতে হয় ; (ii) এই ছন্দের পর্ব্বগুলি ছয়, আট বা দশ মাত্রার অক্ষর লইযা গঠিত ; (iii) ইহাতে সব অক্ষরের উচ্চারণ হ্রস্ব, কেবল একাক্ষরী হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর বা শব্দান্তের হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের উচ্চারণ দীর্ঘ ও দুই মাত্রা ; (iv) ইহার চরণ সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার, ত্রিপদী বা চৌপদীতে রচিত ; (v) ইহার পর্ব্বোচ্চারণের লয় ধীর বা বিলম্বিত ; (vi) সর্ব্বোপরি ইহার সমগ্র চরণে একটি সুরের টান বা তান বর্ত্তমান।

এইরূপ ছন্দের ছন্দোলিপি করিতে হইলে প্রথমতঃ যতি অনুসারে পর্ব্ব-বিভাগ করিতে হয় : কোন্ পর্ব্ব কত মাত্রার অক্ষর লইয়া গঠিত তাহা নির্দ্দেশ করিতে হয় : কোন্ হলন্ত অক্ষর হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারিত হয় তাহা চিহ্ন দিয়া উপরে নির্দ্দেশ করিতে হয়। চরণে কয়টি পর্ব্ব আছে, তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। এই ছন্দের লয় বিলম্বিত এবং ইহা তান প্রধান—ছন্দের অন্যান্য লক্ষণ নির্ণয় করিয়া এই লক্ষণের কথাও উল্লেখ করিতে হয়।

পয়ার ছন্দের নানা প্রকারভেদ আছে : ইহা কখনও পয়ার, কখনও মহাপয়ার, কখনও ত্রিপদী (লঘু বা দীর্ঘ), কখনও চৌপদী (লঘু বা দীর্ঘ) : ইহাই সমিল বা অমিল অমিত্রাক্ষর। গৈরিশ ছন্দ, মুক্তক ছন্দও ইহারই প্রকারভেদ। ছন্দোলিপি করিয়া সর্ব্ব-শেষে ইহা কোন্ প্রকার পয়ার তাহা উল্লেখ করিতে হয়। নিম্নে পয়ার ছন্দের বিভিন্ন ছন্দোলিপি প্রদত্ত হইল।—

(১) সেই ঘাটে খেয়া দেয় | ঈশ্বরী পাটনী। ·· ৮+৬
ত্বরায় আনিল নৌকা | বামা স্বর শুনি॥ ·· ৮+৬

ইহাতে প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথম পর্ব্ব আট, দ্বিতীয় ছয় মাত্রার। চরণ দুইটি সমপদী ও মিত্রাক্ষর। এই ছন্দের লয বিলম্বিত এবং চরণ জুড়িয়া একটি সুরের টান আছে, অতএব ইহা বিলম্বিত লয়ের তানপ্রধান সাধারণ পয়ার ছন্দ।

(২) সুখের লাগিযা | এঘর বাঁধিনু | অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সাগরে | সিনান করিতে | সকলি গরল ভেল

পর্ব্ব—ষণ্মাত্রিক। চরণ—ত্রিপর্ব্বিক, মিত্রাক্ষরযুক্ত। শেষের পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা আট—ইহা ৬+৬+৮ মাত্রার ত্রিপদী পযার। লয়—বিলম্বিত।

(৩) অন্ধ যে, কি রূপ কভু | তার চক্ষে ধরে ·৮+৬
নলিনী ? রোধিলা বিধি | কর্ণ পথ যার, ··৮+৬
লভে কি সে সুখ কভু | বীণার সুস্বরে ? ৮+৬
কি কাক কি পিকধ্বনি | সমভাব তার। ·৮+৬

পর্ব্ব বিভাগ—আট+ছয় মাত্রা। চরণ দ্বিপর্ব্বিক, মিল পর্য্যায় সম। এই ছন্দে ছেদ ও যতির অমিত্রতা আছে, অতএব ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ; ভাব প্রবহমাণ, পাঠের রীতি যতিঅনুসারে নয়, ছেদ অনুসারে। ইহা পর্য্যায়সম মিল যুক্ত (ক-খ-ক-খ) অমিত্রাক্ষর।

(৪) যোজন সহস্র কোটি | পরিধি বিস্তার · ৮+৬
বিস্তৃত সে রসাতল | বিধুনিত সদা ; ·· ৮+৬
চারিদিকে ভয়ঙ্কর | শব্দ নিরন্তর · ৮+৬
সিন্ধু আঘাতে স্বতঃ | নিয়ত উত্থিত। · ৮+৬

পর্ব্ব—আট ও ছয় মাত্রার। চবণসজ্জা সাধারণ পয়ারের অনুরূপ, কিন্তু চরণান্তিক মিল নাই। ইহা ঠিক অমিত্রাক্ষর ছন্দও নয়, কারণ ছেদ ও যতির অমিত্রতা ইহাতে নাই, চারিটি পংক্তির মধ্যে একটি ভাব সীমাবদ্ধ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ ছন্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন; ইহাতে অমিত্রাক্ষবের আদর্শ পরিস্ফুট হয় নাই। চতুর্থ চরণের প্রথম পর্ব্বটি ; পয়ারের রীতি অনুসারে ছন্দোদুষ্ট।

(৫) গিরিধারী, | নাহি বাহুবল তব ৪+৮
চাহ বুঝাইতে | আমি বলাধিক। ·· ৬+৬
ক্ষত্রিয় সমাজে | কথা বটে সম্মানসূচক, · ৬+৮
ছল নহি আমি— | অতি ছল তুমি, ·· ৬+৬
মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকাব। ···৪+৬

পর্ব্ব—চার, ছয়, আট মাত্রার। প্রতি চরণ দ্বিপর্ব্বিক, কিন্তু কোন চরণেই পর্ব্ব সম্মিতি নাই : চরণান্তিক মিলও নাই। চরণগুলিতে পর্ব্বগুলির মাত্রা সংখ্যা—যথাক্রমে ৪+৮, ৬+৬, ৬+৮, ৬+৬, ৪+৬। এই ছন্দে ভাব অনুযায়ী অর্থাৎ শ্বাসযতি বা ছেদ অনুযায়ী পংক্তিগুলি সাজানো হইয়াছে। ইহা এক প্রকার ভঙ্গ-চরণ অমিত্রাক্ষর ছন্দ - পর্ব্বের মাত্রা সম্মিতি, প্রতি চরণের মাত্রা সম্মিতি, চরণান্তিক মিল কিছুই ইহাতে নাই; ইহাকে কেহ কেহ মুক্তছন্দও বলেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এইরূপ ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহাকে গৈরিশ ছন্দও বলা হয়।

(৬) স্নিগ্ধ মাতৃপাণি ·· —+৬
চিন্তাতপ্ত ভালে তার | তালে তালে বারম্বার হানি, · ৮+১০
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার | দিয়া তারে স্নেহময় চুমা, ৮+১০
বলো তারে 'শান্তি, শান্তি' - বলো তারে, ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা। ৮+১০

পর্ব্ব—আট ও দশ মাত্রার। প্রতি চরণ (প্রথম চরণটি ব্যতীত) দ্বিপর্ব্বিক—৮+১০—এই মাত্রা সঙ্কেতে সজ্জিত; চরণান্তিক মিলও আছে। কিন্তু পয়ারের মত চরণ শেষে ভাব পরিসমাপ্ত নয়, প্রবহমাণ: চতুর্থ চরণের

শেষে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে। ইহার লয় বিলম্বিত, চরণে পয়ারের মত টানও আছে। অতএব এই ছন্দ বিলম্বিত লযের প্রবহমাণ মহাপয়ার ছন্দ।

(৭) রবি অস্ত যায় | ...৬

অরণ্যেতে অন্ধকার | আকাশেতে আলো। ...৮+৬

সন্ধ্যা নত আঁখি | ...৬

ধীরে আসে | দিবার পশ্চাতে। ...৪+৬

এই ছন্দের পর্ব্বগুলি, চার, ছয, আট মাত্রার। চরণগুলি অসমপর্ব্বিক, প্রথম চরণে একটি ষণ্মাত্রিক পর্ব্ব, দ্বিতীয় চরণে দুইটি যথাক্রমে ৮+৬ মাত্রার পর্ব্ব, তৃতীয় চরণে ষণ্মাত্রিক একটি পর্ব্ব, চতুর্থ চরণে ৪+৬ মাত্রার দুইটি পর্ব্ব। এই ছন্দের পর্ব্বগুলি বিলম্বিত লযে উচ্চারিত, চাল দ্বৈমাত্রিক পয়ার জাতীয়। কিন্তু পয়ারের চরণগত পর্ব্বসম্মিতি, চরণান্তিক মিল, স্তবক গঠনের আদর্শ কিছুই নাই। অতএব ইহাকে 'মুক্তক ছন্দে'র পর্য্যাযভুক্ত করা যায়।

বলবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত-বেশী অক্ষরবৃত্ত:

/ । । ॥ / । । ॥ / । । ॥ / । ।
(৮) ঠুকে তাল আঁখি লাল | কি করাল মূর্ত্তি।

মহাকায হরি প্রায় | যেন পায স্ফূর্ত্তি॥ (রঙ্গলাল)

আদি অক্ষরে বাঙালীর সাধারণ উচ্চারণ অনুযায়ী ঝোঁক (শ্বাসাঘাত) থাকিলেও, এই ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিয়ম রক্ষা করে না; প্রায় প্রতি পর্ব্বেই তিন অক্ষর, তিন মাত্রা হইযা যায। ইহা একরূপ পয়ার ছন্দ, নাম মালঝাঁপ পয়ার। ইহাতে প্রতি চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকে।

/ । । । । / । । ॥ / । । ॥ ॥
(৯) ফেলে অস্ত্র লোফে বীর | মারে মাল সাট্।

/ । । । । । । ॥ / । । ॥ ॥
বিপক্ষ মারিতে বীর | জুড়ি লেক নাট॥

এই ছন্দটির প্রথম চরণ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ, কিন্তু দ্বিতীয় চরণ পাঠ করিলেই পয়ারের টান বেশ বুঝা যায়। শ্বাসাঘাতের নিয়মে প্রথম চরণও ছন্দোদুষ্ট হয়। অতএব ইহা আট+ছয় মাত্রার প্রচলিত পয়ার ছন্দ।

অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মালঝাঁপ পয়ার ও তরল পয়ারকে মাত্রাবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য মাত্রাবৃত্তের নিয়ম অনুযায়ী উভয় ছন্দকেই চতুর্মাত্রিক, চতুষ্পর্ব্বিক (শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী) ছন্দরূপে পাঠ করা যায়, কিন্তু একটু কান পাতিয়া শুনিলেই বুঝা যায়, এখানে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরটি অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ হয় না। ইহা স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গিতেই পাঠ্য এবং সমগ্র চরণে টানও আছে। অতএব ইহাদিগকে মাত্রাবৃত্ত-ঘেঁশা পয়ার ছন্দ বলা চলে।

(১০) **তরল পয়ার**

। । । । । । । । । । । । । । ।
দেখ দ্বিজ মনসিজ। জিনিয়া মূরতি ৮+৬

। । । । / । । । । । । । । । । ।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র। পরশয়ে শ্রুতি ৮+৬

(তরল পয়ারে প্রতি চরণের চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে মিল থাকে।)

(১১) **মালঝাঁপ পয়ার**

/ । । ॥ / । । ॥ / । । ॥ / । ।
কোতোয়াল যেন কাল। খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।

/ । । ॥ / । । । / ॥ ॥ / । ।
ধরি বাণ খরশান। হান হান হাঁকে॥

বাঙলা ছন্দের ইতিহাস ও বাঙলায় ছান্দসিক কাব

প্রাচীন বাঙলায় তিন প্রকার ছন্দের প্রচলন ছিল—গেয় কবিতার 'পদ-ছন্দ', গাথা কাব্যের 'পয়ার ছন্দ' এবং লৌকিক 'ছড়ার ছন্দ'। ইহাদের মধ্যে 'পদ-ছন্দ'কে তৎসম, 'পয়ার ছন্দ'কে তদ্ভব এবং 'ছড়ার ছন্দ'কে আমরা দেশজ ছন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি, পদ-ছন্দ সংস্কৃতের 'জাতি' বা প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রাছন্দেরই হুবহু প্রতিরূপ। প্রাচীন চর্য্যাগীতিকায় এবং মধ্যযুগীয় ব্রজবুলিতে এই মাত্রাছন্দেই অজস্র গান রচিত হইয়াছে। এই সকল গানের মাত্রা গণনার পদ্ধতিও সংস্কৃত-প্রাকৃতের অনুসারী।

কিন্তু উচ্চারণগত অন্যরূপ বিশিষ্টতার জন্য এইরূপে মাত্রাগণনা এদেশে ক্রমে শিথিলাদর হয় এবং হ্রস্ব-দীর্ঘভেদে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনি এক মাত্রার, একাক্ষরী শব্দের অন্তর্গত স্বরটি দুই মাত্রার এবং পদান্তের হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের স্বরের উচ্চারণ দুই মাত্রার হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে বাঙলা ছন্দেও রূপান্তর ঘটিতে থাকে। শ্রূয়মাণ অক্ষর গণনার রীতি অনুসারে প্রাচীন 'মাত্রাছন্দ' নূতন অক্ষরবৃত্ত 'পয়ার ছন্দে'র রূপ ধারণ করে: প্রাচীন 'পজ্ঝটিকা' বা 'পাদাকুলক' বা 'অতিশক্করী' ছন্দ দুই একটি মাত্রাভ্রষ্ট হইয়া পয়ার ছন্দে পরিণত হয়। পয়ার ছন্দ বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি। এই ছন্দেই মধ্যযুগের অধিকাংশ বাঙলা কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গল কাব্য, চরিত-কাব্য ইত্যাদি রচিত হইয়াছে।

ছড়ার ছন্দের উৎপত্তি সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। ডাঃ সুকুমার সেন মনে করেন, বাঙালীর উচ্চারণ প্রণালী অনুযায়ী আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাতের দরুণ এবং পদান্তের অ-কারের লোপের দরুণ শব্দ দ্বিমাত্রিকতা-প্রবণ হওয়ায় বল-প্রধান নাচনি ছড়ার ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে:

> ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাঢ়ীতে পদে আদি স্বরাঘাত ও অন্ত্য অ-কার লোপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ঝোঁক-দেওয়া নাচনি ছড়ার ছন্দ ত্রিপদীর দলে স্থান পাইল। তবে ছন্দটির মেয়েলি সুর ও খেয়ালি চাল বৈষ্ণব কবিসমাজের বাহিরে সমাদর পায় নাই।[১]

ভাষার ইতিবৃত্ত -ডাঃ সুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের সিদ্ধান্ত আবার অন্যরূপ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করিয়া যে ছড়ার ছন্দ, তাহা অতি প্রাচীন (দ্রষ্টব্য 'বাংলা ভাষা পরিচয়')। ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন .

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বাংলা কাব্যের একটি সুপ্রাচীন ধারা।···ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংশ্রবহীন, অনার্য্যদের নাচ ও গানের তালের সহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়।[১]

আমরাও এই মতটিকে সমর্থন করি। এই ছন্দ দেশজ ছন্দ : অনার্য্যদের 'টাক্-ডুমা-ডুম্' ঢাক ও মাদলের বাদ্য এবং 'লাক্-চড়া-চড়' নাচুনি ছন্দেব চালের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। যদিও এই ছন্দ শিষ্ট ভাষার কাব্যে তেমন ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি ইহার শক্তি অসাধারণ। মাত্রা বা পয়ার ছন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই, বরং যখনই মাত্রা বা পয়ার চতুর্ম্মাত্রিক পর্ব্বে পা দিয়াছে, তখনই তাহাতে ছড়ার ছন্দের দোল লাগিয়াছে।

যাহা হউক, এই তিন প্রকারের ছন্দ লইয়াই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্য রচিত হইয়াছে। বর্ণনামলক গাথাকাব্যে পয়ারছন্দই সার্ব্বভৌম সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীরাম দাসের কাব্যে পয়ারের নানারূপ রূপকল্প দেখা যায়। কৃত্তিবাস বেশির ভাগ স্থলেই প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন. কেবল অঙ্গদ-রায়বার অংশে ছড়ার ছন্দের দোল লাগিয়াছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামে ঝাঁপতাল, ভঙ্গ পয়ার, ভঙ্গ ত্রিপদী ও একাবলী (একপদী ছন্দ) প্রভৃতি নূতন ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দুই একটি ধুযায় মাত্রাছন্দেরও ব্যবহার দেখা যায়, যেমন,

ভেদ জন্তু | ভেদ জন্তু।
যো হরি | সো হর | এক তনু॥

কোন কোন স্থলে মাত্রাছন্দের মধ্যে শ্বাসাঘাত দিয়া কবিকঙ্কণ নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিযাছেন ; যথা,

আয় | আয়রে বাছা | আয়।
কি লাগিয়া | কান্দে বাছা | কি ধন চায়॥

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা যায় রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন'। ভারতচন্দ্র নানা ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, বাঙলা ভাষার

[১] বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

উপবেও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। শব্দ যেন ছিল তাঁহার হাতের খেলার পুতুল, ইচ্ছামত তাহাকে নাচাইতে পারিতেন। তাঁহার কাব্যে পয়ারছন্দের নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভঙ্গ ত্রিপদী, লঘুভঙ্গ ত্রিপদী, লঘু ও দীর্ঘ চৌপদী, একাবলী, ভঙ্গপয়ার, মালঝাঁপ, দিগক্ষরা [দশাক্ষবা ছন্দ]—পয়াবের নানা রূপকল্প ভারতচন্দ্র রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত হইতেও তিনি ভুজঙ্গপ্রযাত, তোটক, তূণক, পঞ্চচামর (দ্রষ্টব্য 'নাগাষ্টক') প্রভৃতি ছন্দ বাঙলা ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দকেও তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপ প্রদান করিতে চেষ্টা করেন:

বায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

´আমার উমা | ´মেযেব চূড়া | ´ভাঙ্গড় পাগল | ´ওই না বুড়া
´ভারত কহে | ´পাগল নহে | ´ওই ভুবনে | ´শ্বব লো

মাত্রাছন্দেরও বিশিষ্ট রূপ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দুর্ল´ভ নয। বাঙালীর সাধারণ উচ্চারণ-ভঙ্গির বিকৃতি সাধন করিয়া, সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে দীর্ঘ-স্বরকে দীর্ঘ ধরিযা মাত্রাছন্দ সৃষ্টি করাতে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইলেও, এ ধরণের মাত্রাছন্দ তেমন সমাদৃত হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশ ইংবাজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। তখন হইতে এদেশের জীবনে নানাদিক হইতেই একটা বিদ্রোহের সুর বাজিতে থাকে। কাব্যেব ছন্দেও এই বিপ্লব উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সূচনা কবে। মিত্রাক্ষর পয়ারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন: অমিত্রাক্ষর ছন্দ এদেশে ছন্দোমুক্তির উল্লাস জাগাইযা তোলে। ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেন:

ছন্দের শৃঙ্খল মোচন: মাইকেলের অমিত্রাক্ষর

It is the first and most successful attempt to break through the jingling monotony of the 'পযার'.

তৎকালে অনেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দেব নিন্দা করিলেও কালক্রমে ইহা এদেশের কবিদের মধ্যে নব নব প্রেরণা সঞ্চাব করিতে সমর্থ হয। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন যেমন এদেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, চতুর্দ্দশপদী সনেটের রূপকল্পটিও এদেশীয় ভাষায় তাঁহারই সৃষ্টি। ছন্দের দিক হইতে এ দুইযের প্রবর্ত্তনাতে তাঁহার কীর্ত্তি অবিস্মরণীয়।

মধুসূদনের পরে বাঙলা ছন্দের অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের

প্রত্যেকটি বিভাগেই রবীন্দ্রনাথ নূতন নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মধুসূদন প্রবর্ত্তিত প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তিনি নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। মহাপয়ারের চরণে তিনি এই ছন্দ যোজনা করিয়াছেন। অসমচরণ সমিল প্রবহমাণ ছন্দ এক নবতম রূপ লাভ করিয়াছে 'বলাকা' কাব্যের ছন্দে। এখানে একদিকে যেমন তিনি চরণকে পর্ব্ব-সম্মিতি হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তেমনই আবার পর্ব্বগুলিকেও চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার করিয়া গঠন করিযাছেন, অর্থাৎ পর্ব্বকেও মাত্রা-সম্মিতি রক্ষার আবশ্যকতা হইতে মুক্ত করিয়া দিযাছেন। তানপ্রধান ছন্দে আরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে অসমচরণ, অমিল, স্তবক-বন্ধনমুক্ত প্রবহমাণ ছন্দ রচনায়। সংস্কৃতের 'বিষম বৃত্ত' এই সকল ছন্দে নূতন রূপে ভূষিত হইয়াছে।

বাঙলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

ইতিপূর্ব্বে মাত্রাছন্দ রচনায় কবিগণ সংস্কৃত বা প্রাকৃত-অপভ্রংশের নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ রীতি অনুসরণ করিতেন। বাঙালীর উচ্চারণ-ভঙ্গির সহিত তাহাদের সঙ্গতি না থাকায়, এই ছন্দে কেবল ব্রজবুলিতে একঘেয়ে বৈষ্ণব পদাবলীই রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নূতনভাবে মাত্রাছন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ছন্দে কবিতা রচনায় তিনি হ্রস্ব স্বরকে একমাত্রিক এবং যুগ্মস্বরকে (হলন্ত অক্ষরও ইহার অন্তর্গত) দ্বিমাত্রিক রূপে উচ্চারণ করিবার রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাচীন মাত্রাছন্দকে এই প্রকার একটি নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ-রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করায়, এই চন্দ নব নব রূপে আধুনিক কবিতায় ছন্দায়িত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের ধ্বনি-প্রধান ছন্দের জনক রবীন্দ্রনাথ। তিনি একদিকে যেমন এই ছন্দ নূতন করিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তেমনই আবার ইহার অশেষ বৈচিত্র্যও সম্পাদন করিয়াছেন। অযুগ্ম মাত্রার নূতন নূতন চালের মাত্রাছন্দ রবীন্দ্রনাথেরই নতন সৃষ্টি। দুই ও তিনের বিজোড় সংখ্যা মিলাইয়া যে ছন্দ রচনার পদ্ধতি প্রাচীন বাঙলায় কোন কোন মাত্রাছন্দে দেখা যাইত, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বিজোড় মাত্রার নূতন ছন্দ রচনায় যোজনা করিয়াছেন। যেমন,

তিন মাত্রার ছন্দ (ছয় মাত্রায় পরিপূর্ণতা, শেষ পর্ব্ব অপূর্ণপদী, তিন মাত্রা)

আঁধার রজনী | পোহাল.
জগৎ পূরিল | পুলকে।
বিমল প্রভাত | কিরণে
মিলিল দ্যুলোক | ভূলোকে।

পাঁচ মাত্রার ছন্দ

এই রজনী | একা কাটাতে | ভালো লাগে না।
তার কথাটি | ভেবে ভেবে যে | মন মানে না।

সাত মাত্রার ছন্দ

এমনি দুই পাখী | দোঁহারে ভালবাসে | তবুও কাছে নাহি | পায়
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে | পরশে মুখে মুখে | নীরবে চোখে চোখে | চায়

রবীন্দ্রনাথ মাত্রাছন্দের গতিশীলতাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, বিজোড় মাত্রার পর্ব্ব কেবলই চলে। মাত্রাছন্দেও তিনি প্রবহমাণতা আনয়ন করিয়াছিলেন, বিজোড় মাত্রার পর্ব্ব গঠন করিয়া। 'সাগরিকা'য় মাত্রাছন্দের এই প্রবহমাণতা লক্ষণীয়।

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবের কাব্য রচনায় প্রয়োগ করিয়াছেন। নাচুনি ছন্দও যে অনেক সময় তাহার লঘু চপল ভঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিতে পারে, 'ক্ষণিকা' ও 'খেয়া' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই ছন্দকে অবলম্বন করিয়া কবি 'খেয়া' কাব্যে মহাজীবনের পথের পথিক হইয়াছেন: 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া' তাঁহার মন ভুলাইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম ভগবানের গলার মালা, মালা নয়,

এতো মালা | নয় গো এযে | তোমার তর | বারি।
জ্বলে ওঠে | আগুন যেন | বজ্র সম | ভারি,
(এ যে) তোমার তর | বারি।

ছড়ার ছন্দ লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ পরীক্ষাও চালাইয়াছেন। কবি-কৌশলে এ ছন্দকেও যে প্রবহমাণ করিয়া তোলা যায়, তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে 'পলাতকা' কাব্যে। আচার্য্য প্রবোধকুমার সেন 'পলাতকা'র ছন্দকে বলিয়াছেন 'স্বরবৃত্ত মুক্তক'।

বাঙলা সাহিত্যে গদ্য কবিতার প্রতিষ্ঠাতাও রবীন্দ্রনাথ। 'লিপিকা'য় তিনি যে বৃত্তগন্ধি গদ্য (Rhythmic prose) ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহারই শিল্পিত রূপ দিয়া তিনি গদ্য কবিতা রচনা করিয়াছেন 'পুনশ্চ,' 'শেষ সপ্তক,' 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। এই সকল কবিতার ছন্দই প্রকৃত মুক্তক ছন্দ (free verse); এখানে মৌখিক গদ্যই ভাব প্রকাশের বাহন, কিন্তু সে গদ্য

সাধারণ গদ্য নয়, যে গদ্যের দেহে ও রক্তে ছন্দের দোলা মিশানো—সেই গদ্য। এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ,—

'আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরাণীর কোন ভেদ নেই' –

—এই মহাসত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের নানামুখী দানে বাঙলা কাব্যের ছন্দ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বাঙলা ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আর এক ছান্দসিক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি 'ছন্দের যাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙলা ভাষার খাঁটি বাগ্‌ধারাকে উদ্ধার করিয়া, তিনি তাহাকে ছন্দের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ লইয়া তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবিস্মরণীয়। তিনি সংস্কৃত হইতে রুচিরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন আবার ইংরাজির Iambic, Trochaic ছন্দকেও বাঙলা স্বরবৃত্ত ছন্দের ছাঁচে ঢালিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ রচনায়। তিনি মনে করিতেন, বলবৃত্ত ছন্দ বাংলার প্রাণপার্থী'। সাধারণ বলবৃত্ত ছন্দ রচনাতে তো বটেই, স্বরবৃত্তবেশী মাত্রাছন্দ রচনাতেও সত্যেন্দ্রনাথ অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'ওই সিন্ধুর টিপ্ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ', 'হরমুকুট হরমুকুট ভূস্বর্গের সুমেরুকূট,' 'পান্ বিনে ঠোঁট রাঙা চোখ কালো ভোমরা'—প্রভৃতি শ্বাসাঘাতযুক্ত মাত্রাবৃত্ত বাঙলা ছন্দে নানারূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথের পরে ছন্দ সৃষ্টিতে তেমন নূতন বৈচিত্র্য কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আধুনিক কবিগণ রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ছন্দোধারারই অনুসরণ করিতেছেন। মুক্তক গদ্য কবিতা রচনাতেই অনেক কবি অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন এবং গদ্য কবিতায় চরণান্তিক মিল দিয়া নানা প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াসও চলিয়াছে। তথাপি বাঙলা ছন্দ উল্লেখযোগ্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করে নাই। বাঙালী আজ নূতন ছন্দোমূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতেছে—সে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকিবে না।

সাহিত্যের অলঙ্কার

১

সাহিত্যের অলঙ্কার

অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ

(অলঙ্কার কাব্যকলার রূপকার।) শব্দটি নানার্থবোধক। (প্রচলিত অর্থে অলঙ্কার অঙ্গ-প্রসাধক ভূষণ। কেয়ূর, কুণ্ডল, কণ্ঠহার—কেশ-বিন্যাস, বেশ-বিন্যাস—অলকা-তিলকা সব কিছুই অলঙ্কার। অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত হইলে দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সুন্দরতর শোভা ধারণ করে। কাব্যালঙ্কারও কাব্যকে অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করে। অলঙ্কার শব্দার্থময় কাব্যদেহের শোভাবর্দ্ধক—তাহার প্রসাধন-সামগ্রী। তাই বলা হয়, 'অলঙ্কারা অস্য কটক-কুণ্ডলাদিবৎ'।)

কিন্তু অলঙ্কার-প্রস্থানের (কোন কোন আচার্য্য 'অলঙ্কার' কথাটিকে এই সঙ্কীর্ণার্থে গ্রহণ করেন নাই। (তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, অলঙ্কার কটক-কুণ্ডলাদির মত বহিরঙ্গ সাজ-সজ্জাই মাত্র নয়, ইহা কাব্যের অঙ্গভূত লাবণ্য। এই 'লাবণ্যই' কাব্যের সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য বাইরের অলঙ্কার হইতে পৃথক, ইহার অভাব ঘটিলে তথাকথিত কোন কাব্যালঙ্কারই কাব্যদেহের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে না। আচার্য্য বামন তাই অলঙ্কারের এক নূতন সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ'— সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার।)

কিন্তু অলঙ্কারের এই প্রসারিতার্থ সংজ্ঞিত করিলেও, আচার্য্য বামন বিশিষ্টা পদরচনারূপ 'রীতি'কেই কাব্যের আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অনুপ্রাস-উপমাদি অলঙ্কারকে তিনি কাব্যের অন্তর্সমুদ্ভূত সৌন্দর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অলঙ্কারকে যাঁহারা কাব্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারাও অলঙ্কারের গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই; প্রায় সকলেই অলঙ্কারকে কাব্যদেহের 'শোভাকর ধর্ম্ম' রূপেই দেখিয়াছেন। বরং অলঙ্কারকে অভিনব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ধ্বনিবাদের সমর্থক আচার্য্যবৃন্দ। ধ্বন্যালোকের কারিকা, বৃত্তি ও টীকাতে অলঙ্কারের এক নূতন তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

ধ্বনিবাদীরা ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়া, এইরূপে 'ধ্বনি'র সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জ্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥[১]

—যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের অর্থকে অপ্রধান করিয়া প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেখানে সেই ব্যঙ্গার্থরূপ কাব্যবিশেষই পণ্ডিতজনকর্তৃক 'ধ্বনি' বলিয়া কথিত হয়।

রসধ্বনিই ধ্বনিবাদীদের মতে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি। কিন্তু তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন 'বস্তু' বা 'অলঙ্কার'-ও কখনও কখনও ধ্বনির পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। কাব্যের অলঙ্কার সাধারণতঃ দৈহিক প্রসাধন সামগ্রীর মত কাব্যের বহিরঙ্গ হইয়া বিরাজ করে, সেখানে বাচ্যের শোভা সম্পাদন করিতেই তাহার শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। এইরূপ অলঙ্কারকে ধ্বনিবাদীরা 'বাচ্যালঙ্কার' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এ অলঙ্কার কখনও 'অলঙ্কার্য্য' হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ঘট হইলেও এমনও কখনও কখনও হয়, যখন সুকবির পদসংঘটনায় অলঙ্কার নিজেরাই অলঙ্কার্য্য হইয়া উঠে। তখন বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ হয়, শুধু তাহাই নয়, অঙ্গ যেন নিজেই অঙ্গী হইয়া উঠে। তখন আর অলঙ্কারকে 'বাচ্যালঙ্কার' নামে অভিহিত করা যায় না, তখন তাহাকে বলা হয় 'ধ্বনি', তাহার পারিভাষিক নাম 'অলঙ্কার-ধ্বনি'। ব্যঙ্গত্বের দ্বারা অলঙ্কারের এই উন্নয়ন সংঘটিত হয়, অথবা বলা যায়, অলঙ্কার তখন আত্মস্বরূপ দুর্লভ শোভা প্রাপ্ত হয় :

তেঽলঙ্কারা ধ্বনের্ব্যাপারস্থ কাব্যস্থ বাহঙ্গতাং ব্যঙ্গ্যরূপতয়া
গতাঃ সন্তঃ পরাং দুর্লভাং ছায়াং কান্তিমাত্মরূপতাং যান্তি।[২]

অলঙ্কারের এই কাব্যাত্মত্ব ধ্বনিবাদীদের পূর্ব্বে অন্য কেহই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

ধ্বনিবাদীদের মতবাদকে ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ অলঙ্কারের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ ও মিশ্র অলঙ্কার। যে অলঙ্কারকে অতি সহজেই কাব্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, তাহা [illegible]

১ ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত, ১৩
২ ধ্বন্যালোক লোচন টীকা ২।৩০

অলঙ্কার, যেমন কটক-কুণ্ডল-মাল্যাদি; মিশ্র অলঙ্কার তাহা অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম—যেমন কেশ-বিন্যাসাদি প্রসাধন-কলা; অন্তরঙ্গ অলঙ্কার একরূপ দেহের সহিত অবিচ্ছেদ্য হইয়াই শোভা পায়, যেমন—অলকা-তিলকা-পত্রলেখা প্রভৃতি। শেষোক্ত অলঙ্কারই সার্থক কাব্যালঙ্কার।

সাধারণভাবে অলঙ্কার কাব্যের আত্মা নয়, ইহা কাব্যের সৌন্দর্য্য-সম্পাদক ও শক্তিবর্দ্ধক। বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই অলঙ্কারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বেশির ভাগ আলঙ্কারিকের ইহাই অভিমত। তাঁহারা বলেন,

বৈচিত্র্যমলঙ্কার ইত্যলঙ্কার সামান্য লক্ষণম্। বৈচিত্র্যঞ্চ
ভঙ্গীবিশেষঃ প্রতীতি সাক্ষিকঃ।[১]

আচার্য্য কুন্তকও অলঙ্কার সম্পর্কে এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'—বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। কাব্যের যাবতীয় অলঙ্কার এই বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত। কুন্তকের মতে, বক্রোক্তি হইতেছে 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'—ইহা একপ্রকার বাগ্ভঙ্গী। অতএব অলঙ্কারও বাগ্ভঙ্গী বা উক্তি-বৈচিত্র্য বিশেষ।

অলঙ্কারের এই সংজ্ঞার্থটিই অলঙ্কারের স্বরূপ-ব্যঞ্জক। সত্য বটে, অলঙ্কার দেহভূষণ, অলঙ্কার 'সৌন্দর্য্য', কখনও কখনও অলঙ্কার কাব্যাত্মা (=অলঙ্কার-ধ্বনি), কিন্তু তাহার প্রকাশ ঘটে কবির পদসংঘটনার নৈপুণ্যের মধ্য দিয়াই। উক্তি-বৈচিত্র্যের মধ্যেই অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রকাশ। উক্তি-চাতুর্য্যেই 'কাণা ছেলে'—'পদ্মলোচন' হইয়া উঠে,—অন্ধ নায়িকা রজনীর নয়নদ্বয় হয় 'ইন্দীবর সদৃশ' (বঙ্কিমচন্দ্র)। শুধু তাই নয়, রসাকর্ষণের উদ্দেশ্যে মহাকবির 'অপৃথগ্‌যত্ন' উক্তি-কৌশলেই অলঙ্কারের ধ্বনন-ব্যাপার সম্পাদিত হয়। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায়, **বৈচিত্র্যই অলঙ্কার**।

ইউরোপীয় আলঙ্কারিকগণও এই অর্থেই 'অলঙ্কার'কে বলেন, 'Figure' বা 'Figure of Speech': Figure শব্দটি আসিয়াছে Latin 'Figura' (=Form) হইতে। ইহা সাধারণ 'Form' নয়,—'Specially applied to those *more striking forms* that consist in a deviation from the ordinary way of speech." প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক *Quintilian*-ও এই অর্থেই 'Figure' শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। *Alexander Bain* বলেন,

১ মহেশ্বর-কৃত 'কাব্যপ্রকাশ'-এর টীকা (দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুম)

Figure হইতেছে সাধারণ কথা বলার ভঙ্গী হইতে পৃথক বিশেষ একপ্রকার বাগ্‌ভঙ্গী :

A figure of speech is a deviation from the plain and ordinary mode of speaking, with a view to greater effect.*

Aristotle-এর সময় অবশ্য 'Figure' শব্দটির প্রচলন ছিল না। অলঙ্কারকে তিনি বলিয়াছেন,—'Strange Expression'; 'By an **ordinary word** I mean that in everyday use; by **strange**, one which others than ourselves use. †

অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে বুঝা যায়, কথাকে অধিকতর শক্তিশালী এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত করার প্রয়োজন-বোধেই সাহিত্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অলঙ্কার-সংযোগে অতি তুচ্ছ কথাও অতিশয় শক্তি-সম্পন্ন হয়। হৃদয়ভাবকে সহজে অন্যের হৃদযে সঞ্চার করিতে হইলেও অলঙ্কারের প্রযোজন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজ-সরঞ্জাম অনেক লাগে। সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে।...উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। (সাহিত্যের তাৎপর্য্য)

অবশ্য অনেকে আছেন, যাঁহারা সাহিত্য-সৃষ্টিতে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এমন অনেক কাব্য আছে, যাহা নিরলঙ্কার। 'ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোভে তনু'—ইহা বহু প্রচলিত প্রসিদ্ধ বাক্য। অশোক কাননে একাকিনী শোকাকুলা সীতা বসিয়া আছেন, তিনি আভরণ হীন, কিন্তু 'তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে।' রাজশেখরকৃত 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকের রাজাও বলিয়াছিলেন, 'কিং কজ্জং কিত্তিমেণ বিব্বঅণ বিহিণা'—অঙ্গের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য, তাহাতে কৃত্রিম অলঙ্কার যোগের প্রয়োজন কি? সেক্ষপীয়রও বলেন,

To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,

---

* English Composition and Rhetoric (Bain)

† Poetics—Chap XXI

To smoothe the ice or add another hue
Unto the rainbow, or with taper light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish,
Is wasteful and ridiculous excess.

কিন্তু অলঙ্কার-প্রস্থানের আচার্য্যগণ এই মতবাদকে স্বীকার করেন না। আচার্য্য বামন বলেন, 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম'—সুন্দর হইলেও ভূষণহীন বনিতামুখ শোভা পায় না। শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠ কাব্যের দুই একটি শ্লোক বাদ দিলে দেখা যায়, অধিকাংশই অলঙ্কৃত বাক্য। কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগের বিরাম কোথায়? অশোক কাননের সীতা 'পদ্মিনী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ' (রামায়ণ); কালিদাসের যক্ষিণী 'সন্নস্ত্যাভরণ'—প্রিয়-বিরহে তিনি অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কাব্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তিনি হইয়াছেন, 'চকিত হরিণী-প্রেক্ষণা' (মেঘদূত)। কবি Wordsworth-এর মানস-সৃষ্টি গ্রাম্য বালিকা Lucy—সে-ও আভরণহীনা, কবি তাহাকে কাব্যের অলঙ্কার-সজ্জায় অপূর্ব্ব রূপবতী করিয়া তুলিয়াছেন: সৌন্দর্য্যের তুলনায় Lucy হইতেছে,—

A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!
—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.

কবিদের নায়ক-নায়িকা সকলেই কাব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা: একটি উপমায় 'কনক লতার প্রায় জনক-দুহিতা' (কৃত্তিবাস), একটি রূপকে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা[illegible] 'হাথক দরপণ, মাথক ফুল' (বিদ্যাপতি), একটি ব্যতিরেকে ভারত[illegible] বিদ্যার 'লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী', একটি নিদর্শনায় 'শকুন্তলার [illegible] শোভার আবির্ভাব' (বিদ্যাসাগর), একটি উৎপ্রেক্ষায় নিবাজ[illegible] 'অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কে[illegible] —যেন চিত্রপটের উপর চিত্র' (বঙ্কিমচন্দ্র)। এই [illegible] অলঙ্কারমণ্ডিত অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে সংগ্রহ করা যা[illegible]।

কাব্যসাহিত্যে অলঙ্কারের প্রয়োজনী[illegible] কোন আলঙ্কারিকই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ধ্বনি[illegible] রসবাদীই হউন অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যকে স[illegible]ছেন। অবশ্য

রসসৃষ্টিই কাব্যের মূল লক্ষ্য। অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে, অতি সহজে বাক্যের রসাকর্ষণের ক্ষমতা জন্মে। রবীন্দ্রনাথ তো বলেন, 'অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য'। ধ্বনিবাদী বা রসবাদী আচার্য্যগণ এতটা চরমপন্থী নন: তাঁহারা বলেন,

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ন নিবর্ত্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥[1]

—রসের প্রতি মনোযোগী হওয়ায়, কবির অপৃথগ্‌যত্নে যাহার রচনা সম্ভব হয়, ধ্বনিশাস্ত্রে তাহাই অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়।

কবির লক্ষ্য রসসৃষ্টি করা, তাহার প্রতিই তিনি অভিনিবিষ্টমনা। এই সৃষ্টিক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে বিনা প্রযত্নে অলঙ্কার বিন্যস্ত হয়। যখনই কবি কাব্য সৃষ্টিতে অলঙ্কারকে প্রধান করিতে চেষ্টা করেন, তখনই অলঙ্কার সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা কাব্যাত্মার সহিত ঐক্য লাভ না করিয়া বহিরঙ্গ বাচ্যালঙ্কারমাত্র হইয়া উঠে। আর অলঙ্কার যখন রসের পরিপোষ্টা হিসাবে স্বাভাবিক ভাবে আবির্ভূত হয়, তখন তাহা অনেক সময় নিজেই কাব্যাত্মা হইবার যোগ্যতা লাভ করে। এ-সকল ক্ষেত্রে রসের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে অলঙ্কারগুলি 'আমি আগে, আমি আগে' এইরূপ বলিতে বলিতে স্বেচ্ছায় আসিযা কবির নিকট ভিড় করে (দ্রষ্টব্য ধ্বন্যালোক, বৃত্তি ও টীকা ২।১৬)। এ যেন অনেকটা মেনকা-গর্ভে উমার জন্মের পর শৈলপত্নীদের অবস্থা। উমা হিমরাজ গৃহে মেনকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে [illegible], কল্যাণ-মাঙ্গল্য। অপরূপ উমার রূপ, সেই রূপ দেখিবার জন্য [illegible]গণ ছুটিয়া আসিলেন, সকলেই একে অন্যকে ঠেলাঠেলি করিয়া [illegible] লাগিলেন, 'আমি আগে, আমি আগে,'—

[illegible] দেব-নাগেন্দ্র-গন্ধর্ব্ব-শৈল লীলাবতীগণৈঃ।
[illegible] হিমশৈলসুতা দেবীহ্যহং পূর্ব্বিকয়া ততঃ॥[2]

[illegible]ত্তর ব্যাপারে অলঙ্কারগুলিও ঠিক এমনই 'অহং পূর্ব্বিকয়া' ('অহমা-[illegible]হমাদৌ প্রবর্ত্ত ইত্যর্থঃ'—লোচনটীকা) আসিয়া উপস্থিত হয়। রসাত্মক কাব্য-রচনায় এইখানেই অলঙ্কারের উপযোগিতা।

[illegible]

---

১ ধ্বন্যালোক, [illegible]

২ পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড

অলঙ্কার প্রয়োগে ঔচিত্যবোধ

কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার স্বাভাবিকভাবেই সন্নিবেশিত হয়। রসাকর্ষণের অভিপ্রায়ী হইয়া আসিলেই ইহা সার্থক হয় এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেও সক্ষম হয়। অলঙ্কার সৃষ্টিতে ঔচিত্যবোধ বা মাত্রাজ্ঞান অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। কথায় বলা হয়, 'সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্'— সব কিছুরই মাত্রাতিরিক্ততা নিন্দনীয়। অলঙ্করণক্রিয়াতেও কবি যদি মাত্রাজ্ঞানকে অতিক্রম করেন, তবে তাহাও নিন্দনীয় হইয়া উঠে। আপাদমস্তক গহনায় আবৃত করিলে যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় না, তেমনই কাব্যকে নিষ্প্রাণ অলঙ্কার-বাহুল্যে মণ্ডিত করিলে কাব্য-সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়ে। অলঙ্করণের বাহুল্য 'দাঁড়া-কবি'দের স্বভাব-কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে: দাশু রায়ের মত বিখ্যাত পাঁচালিকারও অলঙ্কারের বহিরাড়ম্বর ও বহ্বাবড়ম্বর ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাই অনেক ক্ষেত্রে অনুপ্রাস-যমক-উপমা-রূপকের মালা তাঁহার কবিতার শৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে: কবি যখন বলিতে থাকেন,

পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি॥
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর, উভয়ে উভয়ে প্রেমবন্ধ॥
—তখন ভূষণের তালিকাও নিভূষণ বলিয়া মনে হয়।

ধ্বনিবাদের আচার্য্যগণ তাই 'ঔচিত্যবোধ'-এর কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কর্ণের কুণ্ডল হস্তে, হস্তের বলয় কর্ণে পরিধান করিলে যেমন হাস্যকর হয়, তেমনই ঋষির অলঙ্কার নারীদেহে কিংবা নারীদেহের অলঙ্কার ঋষিদেহে যোজনা করিলেও, তাহা হাস্যোদ্রেক করে। নিষ্প্রাণ-দেহে অলঙ্কার যোজনা করিলে, সে অলঙ্কার কখনই শোভাকর হয় না, আবার 'যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি' (অভিনব গুপ্ত)—ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। রসানুকূল করিয়াই অলঙ্কার সৃষ্টি করিতে হইবে - আত্মার সজ্জা হিসাবেই অলঙ্কারকে দেখিতে হইবে; যে অলঙ্কার যে রসের উপযোগী সেই রস-সৃষ্টিতে সেই অলঙ্কারই যোজনা করিতে হইবে: ইহাই 'ঔচিত্যবোধ'। এই ঔচিত্যবোধ দ্বারা পরিচালিত না হইলেই, অনৌচিত্য হেতু শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় যমক-অনুপ্রাসের মাত্রাধিক্য রসসৃষ্টির পরিপন্থী হইয়া উঠে:

যেমন রামবসুর এই গানটি,—

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে।
করে পঞ্চ দুঃখে দাহ পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ
হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ নিশি পঞ্চ প্রহরেতে॥

—এখানে 'পঞ্চে'র যমকাতিশয্যে করুণ বিপ্রলম্ভ রসেরই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব, রসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, রসধারা ক্ষরণ করিবার উদ্দেশ্যে রসানুকূল অলঙ্কার প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত।

অলঙ্কারের শ্রেণী-বিভাগ

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কাব্যের মূল কতকগুলি শব্দার্থময় বাক্য। শব্দ (ধ্বনি) ও অর্থ—এই দুয়ের সাযুজ্যেই বাক্য—তথা রসাত্মক কাব্য গড়িয়া উঠে। অতএব কাব্যের চারুত্ব-সম্পাদক অলঙ্কার—শব্দ (ধ্বনি) এবং অর্থ উভয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইতে পারে। ইহা একদিকে যেমন ধ্বনি-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, অন্যদিকে তেমনই অর্থ-সৌন্দর্য্যের উদ্ঘাটক। তাই আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারের দুইটি প্রধান বিভাগ স্বীকার করিলেন—(১) শব্দালঙ্কার ও (২) অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার : শব্দালঙ্কারের ভিত্তি ধ্বনি (sound) : ইহাকে একদিক হইতে ধ্বনির সৌন্দর্য্যও বলা যাইতে পারে। অবশ্য ধ্বনিদ্বারা যে অর্থও আভাসিত না হয়, তা নয়, কারণ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক অর্দ্ধনারীশ্বরের ন্যায়। তথাপি শব্দালঙ্কারের আবেদন প্রধানতঃ শ্রুতির কাছে। শব্দালঙ্কার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে। অতএব বলা যাইতে পারে, যে অলঙ্কার প্রধানতঃ ধ্বনির সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, কর্ণকুহরে সঙ্গীতের সুষমা বহন করিয়া আনে তাহাই **শব্দালঙ্কার**। ধ্বনির সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করাই শব্দালঙ্কারের কাজ।

এই যে ধ্বনির বৈচিত্র্য—ইহা বর্ণ, পদ এমন কি একটি সমগ্র বাক্যের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে পারে। যখন শুনি, 'জজ গগ জজ গগ গদ্‌গদ বচন' —তখন স্বভাবতই বর্ণধ্বনির সৌন্দর্য্য দ্যোতিত হয়, —'জ' আর 'গ'-এর ধ্বনি-সাম্য কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। আবার যখন কবি বলেন, 'ভারত ভারতখ্যাত' —তখন 'ভারত' এই পদধ্বনির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ; আবার ফুল্লরা যখন দুঃখ করিয়া বলে, 'দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান'—তখন একই বাক্য-

ধ্বনির দ্বিরুক্তিদ্বারা আমরা আকৃষ্ট হই। বর্ণ, পদ বা বাক্যধ্বনির দিক হইতে শব্দালঙ্কার তিন ভাগে বিভক্ত: (১) বর্ণাশ্রিত ধ্বনি-সৌন্দর্য্য—ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস (২) পদাশ্রিত ধ্বনি-সৌন্দর্য্য—শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস (৩) বাক্যাশ্রিত ধ্বনি-সৌন্দর্য্য—সর্ব্বযমক, বাক্যশ্লেষ।

অর্থালঙ্কার: অর্থালঙ্কার অর্থের সৌন্দর্য্য-বিধায়ক। শব্দ-ধ্বনি ও অর্থের বন্ধন অর্দ্ধনারীশ্বরের মত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত হইলেও, অর্থকে ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র ধরিয়া অর্থালঙ্কারের ভেদ স্বীকার করা হয়। অর্থালঙ্কার দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য সূচিত হয়। যে-অলঙ্কার দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়, তাহাই **অর্থালঙ্কার**। যেহেতু অর্থালঙ্কারের ভিত্তি অর্থ (sense), সেইজন্য ইহার আবেদন মানুষের বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধিদ্বারা অর্থ বুঝিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হয়।

অর্থালঙ্কারেরও নানা উপবিভাগ আছে: বোধের প্রকৃতিভেদেই এই বিভাগ। এক একটি বস্তুর সান্নিধ্যে এক একরূপ বোধ জাগ্রত হয়, কোনটার সান্নিধ্যে জাগে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বোধ, কোনটা বা সঞ্চার করে গূঢ়ার্থ-প্রতীতি, আবার কোন বস্তু হইতে উদ্বোধিত হয় শৃঙ্খলা অথবা ন্যায়বোধ। 'ছেলের মুখটি চাঁদের মত'—বলিলেই সাদৃশ্যবোধ জাগ্রত হয় আবার 'সীমার মাঝে অসীম' বলিলেই জাগে বৈসাদৃশ্য বোধ। এইভাবে বোধের এক এক মহলে অর্থালঙ্কারের এক একরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। বোধের এই তারতম্য অনুসারে অর্থালঙ্কার প্রধানতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

(১) **সাদৃশ্যবোধজনিত অলঙ্কার:** উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, প্রতীপ, অতিশয়োক্তি, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, দীপক প্রভৃতি।

(২) **বিরোধমূলক অলঙ্কার:** বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা প্রভৃতি।

(৩) **গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলঙ্কার:** অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, পর্য্যায়োক্ত, স্বভাবোক্তি, ভাবিক প্রভৃতি।

(৪) **শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার:** কারণমালা, সার ইত্যাদি।

(৫) **সম্বন্ধমূলক অলঙ্কার:** লক্ষণা, উপচার লক্ষণা ইত্যাদি।

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার—অলঙ্কারের এই দুই প্রধান বিভাগ। স্বরূপতঃ শব্দ ও অর্থ অভিন্ন, যেমন পার্ব্বতী-পরমেশ্বর: একেকে অন্য হইতে পৃথক

করা যায় না। শব্দজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থজ্ঞানও জন্মে, আবার অর্থের সহিত শব্দেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। এমনও অনেক সময় দেখা যায়, একই উদাহরণ দ্বারা কখনও শব্দালঙ্কার, কখনও অর্থালঙ্কার বিজ্ঞাপিত হয়, যেমন অন্নদার আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে 'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ'—বাক্যটি: শব্দালঙ্কারের দিক হইতে ইহা 'শ্লেষ'-এর উদাহরণ, আবার অর্থালঙ্কারের দিক হইতে ইহাই 'ব্যাজ-স্তুতি'। তাহা হইলে এ দুয়ের পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের দিক হইতে। শব্দালঙ্কারে শব্দ অর্থাৎ ধ্বনির সৌন্দর্য্য, অর্থ হইতেও প্রধান হইয়া উঠে; অর্থালঙ্কারে অর্থের সৌন্দর্য্য ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া প্রকট হয়। একটির আবেদন মানুষের শ্রুতির নিকট, অপরটির আবেদন বুদ্ধির নিকট। অথবা বলা যায়, শব্দালঙ্কার সঙ্গীত-প্রধান, অর্থালঙ্কার চিত্র-প্রধান। 'রিমিঝিমি শবদে বরিষে'—জ্ঞানদাসের এই বাক্যটির সৌন্দর্য্য ইহার 'রিমিঝিমি' ধ্বনির মধ্যে, কিন্তু বলরামদাসের 'দেখিবারে আঁখিপাখী ধায়'—বাক্যটির সৌন্দর্য্য 'আঁখিপাখী'র রূপকার্থে। একটির বিচারক কান, অপরটির বিচারক মন।

আর একটি বড় কথা এই যে, শব্দালঙ্কার শব্দের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। একটি বিশেষ শব্দ, ধ্বনির দিক হইতে যে সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করিলেই তাহার সে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু অর্থালঙ্কারে অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলেও, তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণে বাধা জন্মে না। 'গগনে গরজে মেঘ'—কথাগুলির মধ্যে 'গ, গ ও ঘ'-এর যে অনুপ্রাস রহিয়াছে, 'আকাশে ডাকিছে মেঘ' বলিলেই সে অনুপ্রাস আর থাকে না; কিন্তু অর্থালঙ্কারের দিক হইতে এরূপ পরিবর্ত্তন অলঙ্কার পরিস্ফুটনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের পার্থক্যও এইখানে। শ্লেষে অর্থকে ছাপাইয়া ধ্বনির সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, ব্যাজস্তুতিতে ধ্বনি হইতেও অর্থের প্রাধান্য। ব্যাজস্তুতি যদিও বা শব্দের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে, শ্লেষে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই শ্লেষের শ্লেষাত্মকতা লুপ্ত হইয়া যায়। উপরের 'কুকথায় পঞ্চমুখ'কে 'শতমুখ' করিলে,—'শতমুখে'ও শব্দ-শ্লেষের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না।

২

শব্দালঙ্কার পরিচিতি

ধ্বন্যুক্তি

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট উপাদান। এই শব্দগুলি আপাতত অর্থহীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাদের ধ্বনি এক একটি অনির্ব্বাচ্য অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> ফস্ ক'রে, চট্ ক'রে, ধুপ্ ক'রে, ধাঁ ক'রে, সোঁ ক'রে, ফ্যাঁচ ক'রে দেওয়া, গ্যাঁট্ হ'য়ে বসা, টিপ্ ক'রে প্রণাম করা,—এদের কোন শব্দই সার্থক নয়, অথচ অর্থবান শব্দের চেয়ে এরা স্পষ্ট মনে রেখাপাত করে। ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে রোদ্দুর, ধু ধু করছে মাঠ, থই থই করছে জল,—এরা এক আঁচড়ের ছবি।…দরদর, ঝনঝন, টনটন, কনকন, কুটকুট, করকর, তিড়িক তিড়িক, ঘিনঘিন, ঝিমঝিম, সুড়সুড়, সিরসির,—এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অনুভূতির কোনই শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয়, এমন আর কিছুতেই হ'তে পারে না।[১]

এইরূপ অর্থহীন বা সার্থক ধ্বনিরূপের প্রয়োগে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়, তাহাকে **ধ্বন্যুক্তি** অলঙ্কার বলে। ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কারে অর্থের ব্যঞ্জনা প্রধান কথা নয়। যদিও ধ্বনিদ্বারা একটি অর্থ আভাসিত হয়, কিন্তু শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সৌন্দর্য্যই এস্থলে প্রধানভাবে বিচার্য্য। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ধ্বনিই এখানে সৌন্দর্য্যের উপাদান। যেমন,

[ক] সভা **হৈ হৈ**। ডঙ্কা **রৈ রৈ**॥ (রূপকথা)

[খ] ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে **ঝমঝম,**
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা **টুকটুক** করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥ (ছেলে ভুলানো ছড়া)

[গ] হাকে **হুমহাম,** করে **দুমদাম,** জয় মহাদেব বলে।
ঝুপঝুপ ঝাপ, **দুপদুপ** দাপ, লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে॥ (ভারতচন্দ্র)

---

১ বাংলাভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ

[ঘ] **গর্জ্জিল** বিকট ঠাট জয়রাম নাদে !
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে,
ইরম্মদে **ধাঁধি** বিশ্ব, **গর্জ্জিল** অশনি। (মাইকেল)

[ঙ] রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া, কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন **বক্-বক্ গল্-গল্** করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল।...পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন **চলৎ ছলৎ ঠনাক্ ! ঝিনিক ঠিনিকি ঠিন্ !** বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে যোগ দিল –

রোহিণীর মন বলিল, উইল চুরি করা কাজটা।
জল বলিল—**ছলাৎ** ।
রোহিণীর মন – কাজটা ভাল হয় নাই।
বালা বলিল—**ঠিন্ ঠিনা**—না। তা ত না -
রোহিণীর মন—এখন উপায় ?
কলসী—**ঠনক্ ঢনক্ ঢন্**- উপায় আমি,—দড়ি সহযোগে। (বঙ্কিমচন্দ্র)

[উপরের উদ্ধৃতিতে কলসী, জল ও বালার কথোপকথন ধ্বন্যুক্তির সহযোগে আরও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিযাছে। ধ্বন্যুক্তির সৌন্দর্য্য এই ভাবেই শ্রুতিপথে মনের দ্বারে পৌঁছায়]

ইংরাজিতে Onomatopoetic ('sound echoing the sense') word-এর প্রয়োগে ধ্বনি-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হয়। কোন বিশেষ ধ্বনির অনুকরণাত্মক ধ্বনিকে বলা হয Onomatopœia ; যেমন whizz, buzz, hiss ইত্যাদি। ইংরাজিতে ইহা একটি অলঙ্কারও বটে।

সংস্কৃতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে, যেমন গুঞ্জন (ভ্রমরের শব্দ), শিঞ্জন (নূপুরের ধ্বনি), নিক্কণ (বীণাধ্বনি) ; কিন্তু সংস্কৃতে ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার বলিয়া কোন অলঙ্কার নাই। বাঙলাতেও অনেকে Onomatopœa-কে সাধারণ অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করেন না, কারণ ইহা সাধারণ ধ্বনি হইতে অন্যরূপ ধ্বনির দ্যোতনা করে। কিন্তু, ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ধ্বন্যুক্তিকে শব্দালঙ্কারের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতীয়মান অর্থ বিচার না করিয়া, কেবল ধ্বনি-সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্যই

ধ্বন্যুক্তিকে অলঙ্কার বলিয়া গণ্য করিতে হয়; অর্থোপলব্ধির পূর্ব্বেই ইহা কর্ণের পরিতৃপ্তি সাধন করে। তাহা ছাড়া, বাঙলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের এত প্রাচুর্য্য এবং তাহাদের ধ্বনির এমন সৌন্দর্য্য যে, ধ্বন্যুক্তিকে পৃথক অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার না করার কারণ নাই। ইহাকে পুরাপুরি অনুপ্রাসের পর্য্যায়েও ফেলা যায় না, কারণ অনুপ্রাসের মূল কথাটি রহিয়াছে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে; ধ্বন্যুক্তিতে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নাও হইতে পারে। যেমন,

(১) 'জল বলিল,—**ছলাৎ**' (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২) '**হুঙ্কারিছে** পদাতিক' রথী (মাইকেল)

(৩) 'এ নহে মুখর বন**মর্ম্মর গুঞ্জিত**' (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) 'আয় আয় চাঁদ মামা **টী** দিয়ে যা' (ছড়া)

(৫) 'ও বাবা **মড়াৎ** করে, পড়েছি **সড়াৎ** জোরে'! (নজরুল)

(৬) 'ইন্দ্র **ছোঁ মারিয়া** তুলিয়া লইয়া বলিল, আবার টাকা!...
শাহ্জীর চোখ দুটা **ধক্ করিয়া** জ্বলিয়া উঠিল। (শরৎচন্দ্র)

ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কারের ধ্বনি, কখনও কোন অনুকরণাত্মক শব্দ (যেমন, কলকল, শোঁ শোঁ), কখনও কোন রঙ (যেমন, টুকটুক, ফ্যাকফেকে), অথবা কখনও কোন বিশেষ অনুভূতিকে (যেমন টনটন, কলকল, ঝিমঝিম) আভাসিত করে।

অনুপ্রাস

সাধারণতঃ একই বিষয়ের পুনরাবর্ত্তন বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়ঃ পৌনঃপুনিকতা একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। যদি অবিমিশ্র আলো কিংবা অন্ধকারই বিরাজ করিত, তাহা হইলে মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। কিন্তু পৌনঃপুনিকতা সর্ব্বত্রই বিরক্তিকর বা অসুন্দর নয়। একটি নিয়ম অনুসরণ করিয়া, মাত্রা না ছাড়াইয়া যদি একটি বিষয়ের পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে তাহা সৌন্দর্য্য-বোধক হয়। ছন্দের সৌন্দর্য্য যে এইরূপ নিয়মবদ্ধ পুনরাবৃত্তির উপরেই নির্ভর করে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

কাব্যালঙ্কারের মধ্যেও দেখা যায়, কোন কোন অলঙ্কার একই ধ্বনি বা শব্দের পুনরাবর্ত্তন দ্বারা গঠিত হয়। একই ধ্বনির মাত্রাতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি রোধ করিয়া, তাহার মধ্যে একটি সুনিয়মিত শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য আনয়ন করাই এবংবিধ অলঙ্কারের প্রধান লক্ষ্য। **অনুপ্রাস** এইরূপ একটি অলঙ্কার।

এক জাতীয় ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ স্বল্পকালানন্তরে একাধিকবার উচ্চারিত হইলে, ধ্বনিসাম্যজনিত যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, তাহাকে **অনুপ্রাস** অলঙ্কার বলে। যেমন,

[ক] **বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড়** বৈষয়িক লোক ছিলেন। (টেকচাঁদ)

[এখানে 'ব' ব্যঞ্জন ধ্বনিটি আটবার আবৃত্ত হওয়ায়, অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে]

[খ] **ভয়ে ভগ্নোদ্যম** আমি **ভাবিয়া ভবেশে** (মাইকেল)

[এখানে 'ভ' ধ্বনিটি চারবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে: 'ভাবিয়া ভবেশে' অংশে 'ভব' ধ্বনিগুচ্ছ বিযুক্ত অবস্থায় দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে]

[গ] মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুল নারী। (জগদানন্দ)

[এখানে 'ঞ্জ' ধ্বনিটি সংযুক্ত অবস্থায় সাতবার পুনরুচ্চারিত হইয়াছে ; 'ম', 'ক', 'গ', ধ্বনির অনুপ্রাসও লক্ষণীয়]

[ঘ] ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও পরশে করগো শ্রীমন্ত। (সত্যেন্দ্রনাথ)

[এই চরণদ্বয়ে চরণান্তিক মিল রহিয়াছে 'ন্ত' সংযুক্ত ধ্বনির সামঞ্জস্যে ; 'স, ষ, শ'-এর ধ্বনিসাম্যও আছে উপরন্তু 'ধূসরের ঊষরের' অংশটিতে 'সরের' ও 'ষরের' মধ্যে ধ্বনিগত মিল থাকায় এখানে নানা প্রকারের অনুপ্রাস সৃষ্টি হইয়াছে]

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন-ধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি-গুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দ্বারাই অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতে অনুপ্রাস বলিতে ব্যঞ্জন-ধ্বনির সাম্যই বুঝায়। ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় (১।১), অনুপ্রাসকে 'স্বরূপব্যঞ্জনন্যাসং' বলা হইয়াছে: সাহিত্যদর্পণেও অনুপ্রাসের সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—'অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।' (দশম পরিঃ)

শব্দসাম্য বলিতে ব্যঞ্জনধ্বনির সাম্যকেই বুঝায়,—'স্বরমাত্র সাদৃশ্যন্তু বৈচিত্র্যাভাবান্ন গণিতম্'। অতএব সংস্কৃত মতানুসারে ব্যঞ্জন-ধ্বনির সাম্যকেই অনুপ্রাস বলা হয়, স্বরসাদৃশ্য অনুপ্রাস নয়। ইংরাজির Alliteration-কে অনুপ্রাস বলা যায়। তাহার সংজ্ঞাটি এইরূপ:

The commencing of successive words by the same letter or syllable, is called alliteration. (Bain)

এখানেও 'recurrence of the consonantal sound'-কেই প্রধানতঃ alliteration বলা হইয়াছে। তবে সূক্ষ্ম ভেদ অনুসারে Vowel-এর সাম্যেরও স্বীকৃতি রহিয়াছে। ইংরাজিতে তিন প্রকার ধ্বনিসাম্যের স্বীকৃতি দেখা যায়, (1) Consonance (2) Assonance ও (3) Rhyme : পর পর ব্যঞ্জন-ধ্বনির (Consonantal sound) পুনরাবৃত্তিকে বলে Consonance, স্বরধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে বলে Assonance এবং Rhyme হইতেছে স্বরমিশ্রিত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। যেমন,

(1) Like a *g*low worm *g*olden
In a *d*ell of *d*ew.

[এখানে 'g' ও 'd' ধ্বনির Alliteration বা Consonance.]

(2) *A*wake *A*eolian Lyre *a*wake.

[এখানে 'A'র পুনরাবৃত্তি হওযায Assonance হইযাছে।]

(3) I bring fresh *showers* for the thirsting *flowers*

[এখানে showers ও flowers-এ ধ্বনিগত সামঞ্জস্য হেতু Rhyme সৃষ্টি হইযাছে : Rhyme চরণান্তে বা চরণমধ্যেও থাকিতে পারে।]

বাঙলায় কেহ কেহ শুদ্ধ স্বরধ্বনির সাম্যকে অনুপ্রাস বলিযা স্বীকার করেন না। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন :

শুদ্ধ স্বরধ্বনির সাদৃশ্যকে আমরা অনুপ্রাস বলি না, কারণ এক স্বর বার বার উচ্চারিত হলেও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে না— —'স্বরমাত্র সাদৃশ্যং তু বৈচিত্র্যাভাবাৎ ন গণিতম্' (বিশ্বনাথ)। এ যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত।[১]

কিন্তু ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেন : [২]

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, স্বরসাম্যে প্রকৃত কোন বৈচিত্র্য নাই, তাই উহা অলঙ্কার নহে। ইংরাজিতে উহা শব্দের আদিতে স্থিত হইলে অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় উহা অনেক স্থলেই অলঙ্কার সন্দেহ নাই ; যথা,

[ক] 'আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া'

[খ] 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'

১ অলঙ্কার চন্দ্রিকা—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ২ কাব্যশ্রী—ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, ব্যঞ্জনধ্বনির সাদৃশ্যেই অনুপ্রাসের সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়: কিন্তু যদি দেখা যায়, স্বরধ্বনির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও অনুরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইতেছে, তবে তাহাকে অনুপ্রাসের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টিতে স্বরধ্বনির গণনা অপরিহার্য্য, শ্রদ্ধেয় শ্যামাপদবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, 'অন্ত্যানুপ্রাসে স্বরধ্বনিকে পূর্ণ-মর্য্যাদা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।' উপরন্তু তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা মাত্রাচ্ছন্দের কবিতায় 'ঐ' আর 'ঔ' স্বরধ্বনি দুটির অনুপ্রাস স্বীকার করব।' কিন্তু কেবল মাত্রাছন্দে কেন, স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দেও স্বরধ্বনির অনুপ্রাস চমৎকার ধ্বনি-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, যেমন,

আই আই আই এই বুড়া কি **ওই** গৌরীর বর লো' (ভারতচন্দ্র)

আর কেবল 'ঐ' বা 'ঔ' ধ্বনিই কেন, সকল স্বরধ্বনিই অনুপ্রাস সৃষ্টি করিতে পারে, যেমন,

আয় আয় রে জাদু **আয়**।
কিসের লাগি কান্দে বাছা কি ধন সে চায়॥ (কবিকঙ্কণ)

ধ্বনির সামঞ্জস্য দ্বারা চারুত্ব সৃষ্টি করাই অনুপ্রাসের কাজ: ব্যঞ্জন ধ্বনিতেই এই সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য অধিকতর প্রকট হয়, কিন্তু স্বরধ্বনিদ্বারাও যদি অনুরূপ চারুত্ব সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকেও অনুপ্রাসের অন্তর্গত বলিয়া ধরিতে হইবে।

ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাসের পার্থক্য:

ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস উভয় অলঙ্কারেরই উপজীব্য বর্ণধ্বনি: তবে ধ্বন্যুক্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে, অনুপ্রাসের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় একক বা সংযুক্ত বর্ণ-ধ্বনির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে। ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা অনুপ্রাসের অন্যতম লক্ষণ, ধ্বন্যুক্তিতে এই পৌনঃপুনিকতা নাও থাকিতে পারে, যেমন 'ঝুপ্ করিয়া শব্দ হইল' (ধ্বন্যুক্তি), কিন্তু 'ঝাউবনে ঝড় এলো ঝোপ কাঁপে ডরে' (অনুপ্রাস)।

অনুপ্রাসের প্রকারভেদ:

অনুপ্রাস পাঁচ প্রকার—[এক] বৃত্ত্যনুপ্রাস, [দুই] ছেকানুপ্রাস, [তিন] শ্রুত্যনুপ্রাস, [চার] অন্ত্যানুপ্রাস ও [পাঁচ] লাটানুপ্রাস।

[এক] বৃত্ত্যনুপ্রাস

অনুপ্রাসের আর এক নাম বৃত্তি। 'বৃত্তি' তিন ভাগে বিভক্ত—উপনাগরিকা, পরুষা ও গ্রাম্যা বা কোমলা।

'উপনাগরিকা'য়—মধুর, সংযুক্ত ও সানুনাসিক ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হয়: যেমন,

[ক] নমো নমো নমো জননি বঙ্গ।
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে
ফলভরনত শাখিবৃন্দে
নিত্যশোভিত অমল অঙ্গ। (রজনীকান্ত)

[খ] বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত বোল।
দে দোল্ দোল্॥ (রবীন্দ্রনাথ)

'পরুষা' বৃত্তিতে পরুষ ধ্বনির প্রাধান্য। সাধারণতঃ ট, ঠ, ড, ঢ, এবং উষ্মধ্বনি দ্বারা এই অনুপ্রাস সৃষ্টি করিতে হয়, যেমন,

[ক] করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল্। (রবীন্দ্রনাথ)

[খ] আস্‌ল উদাস শ্বস্‌ল হুতাশ
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। (নজরুল)

'কোমলা' বৃত্তিতে কোমল ধ্বনির প্রাধান্য। ইহাতে সংযুক্ত ধ্বনির ব্যবহার অল্প হয় এবং পরুষ ধ্বনিগুলি বর্জ্জিত হয়, যেমন,

[ক] হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি। (রবীন্দ্রনাথ)

[খ] লজ্জাবতীর লুলিত লতায় শিহর লাগে পুলক ব্যথায়। (নজরুল)

মধুর, পরুষ ও কোমল ধ্বনি পরবর্ত্তীকালে যথাক্রমে মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত 'বৃত্তি' বলিতে বুঝাইত 'রসব্যঞ্জক বর্ণরচনা'। বর্ত্তমানে এই অর্থেই বৃত্ত্যনুপ্রাসের ব্যবহার হয়। **রসানুকূল অনুপ্রাসের নামই বৃত্ত্যনুপ্রাস**। সাহিত্যদর্পণে আচার্য্য বিশ্বনাথ এইরূপে বৃত্ত্যনুপ্রাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'রসবিষয় ব্যাপারবতী বর্ণরচনা বৃত্তিঃ তদনুগতত্বেন প্রকর্ষেণ ন্যসনাৎ বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ'—রসব্যঞ্জক বর্ণরচনাকে বৃত্তি

বলে, রসের আনুগত্য রক্ষা করিয়া যে বর্ণবিন্যাস করা হয় তাহাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে। বস্তুতঃ যে-কোন অলঙ্কারই হউক না কেন, রসানুকূল না হইলে কাহারও উপযোগিতা থাকে না; অনুপ্রাসও রসানুকূল হইলেই অনুপ্রাস হয়, নচেৎ তাহা হয় উপহাস। অতএব অনুপ্রাসের অন্তর্গত 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' নাম দিয়া আর একটি ভেদ স্বীকারের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। যে-কোন অনুপ্রাসকেই বৃত্ত্যনুপ্রাস বলা যাইতে পারে। আর বৃত্ত্যনুপ্রাসে প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রাসের অতিরিক্ত কোন ব্যাপারও নাই। যাহা হউক, বৃত্ত্যনুপ্রাসে ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের কিরূপ প্রয়োগ হয়, আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এই প্রসঙ্গে ধ্বনিগুচ্ছের **স্বরূপসাদৃশ্য** ও **ক্রমসাদৃশ্য** বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানা আবশ্যক। '**বনে নব সুকুমার কুসুম** প্রস্ফুটিত হইয়াছে'—এই বাক্যে 'বন' ও 'নব' এবং 'কুসু' ও সুকু' অংশগুলিতে একরূপ বর্ণই আছে, কিন্তু বর্ণগুলি ওলট-পালট করিয়া সাজানো। এখানে বর্ণগুচ্ছের যে সাদৃশ্য বর্তমান, তাহাকে বলে স্বরূপসাদৃশ্য। আবার 'এ যে **অজাগর গরজে সাগর** ফুলিছে'—এখানে 'গর'—ধ্বনিগুচ্ছ তিন বার আবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিতেই 'গ'-এর পরে 'র' ক্রম রক্ষা করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। ধ্বনিগুচ্ছের এইরূপ সাদৃশ্যকে বলা হয় ক্রমসাদৃশ্য। '**তোপ**-দাগা **পোত**' ('প' ও 'ত'-এর স্বরূপসাদৃশ্য); '**কাবেরী বারি**' ('ব' ও 'র'-এর ক্রমসাদৃশ্য)।

বৃত্ত্যনুপ্রাসে (১) একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনি দুইবার বা ততোধিক বার, (২) একাধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি স্বরূপসাদৃশ্যানুসারে দুইবার, (৩) একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি ক্রমসাদৃশ্যানুসারে যুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় দুয়ের অধিকবার ধ্বনিত হয়, যেমন,

(১) [ক] কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার। (কমলাকান্ত)

['ক' ধ্বনির দ্বিরাবৃত্তি]

[খ] চাণক্য শ্লোকের দু-আখর পাঠ এবং কীর্তন-অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা করতে বেরোন এবং বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন।

[বর্তমান 'কথক' সম্পর্কে হুতোম প্যাঁচার নক্সা,
এখানে 'ব' ধ্বনিটি পাঁচবার ধ্বনিত হইয়াছে]

(২) [ক] **লোকে কালো** বলে নিন্দা করে, আমি বলি—কালো **ভালো** এবং **লোভনীয়**।

[এখানে 'ল' ও 'ক' এবং 'ভ' ও 'ল' এর স্বরূপসাদৃশ্য]

[খ] **কবির বুকের** দুঃখের কাব্য ভক্তে চমৎকার (যতীন্দ্রনাথ)

[এখানে 'ক' ও 'ব'-এর স্বরূপসাদৃশ্য লক্ষণীয়]

[গ] রসাত্মক **বাক্যই কাব্য**।

[এখানে 'ব' ও 'ক' স্বরূপসাদৃশ্য অনুযায়ী দুইবার ধ্বনিত হইয়াছে]

(৩) [ক] যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব স**ঙ্গী**ত ই**ঙ্গি**তে গেছে থামিয়া
যদিও স**ঙ্গী** নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অ**ঙ্গে** নামিয়া (রবীন্দ্রনাথ)

[এখানে 'ঙ, গ' সংযুক্ত অবস্থায় চারবার উচ্চারিত হইয়াছে]

[খ] শবা**সনা** বিব**সনা** লোলর**সনা** ভয়ঙ্করী

[এখানে 'স' ও 'ন' ক্রমসাদৃশ্য অনুসারে তিনবার উচ্চারিত হইয়াছে]

[গ] **বেণু বীণা** জিনি মিঠা **বাণী** যার খনি সুষমার (সত্যেন্দ্রনাথ)

[এই উদাহরণে 'ব' ও 'ণ' ক্রমসাদৃশ্য অনুযায়ী তিনবার ধ্বনিত হইয়াছে]

[দুই] ছেকানুপ্রাস

দুইটি বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় ক্রমানুসারে দুইবার মাত্র ধ্বনিত হইলে **ছেকানুপ্রাস** হয়। 'ছেক' শব্দের অর্থ পণ্ডিত; এইরূপ অনুপ্রাস পণ্ডিতজনেরা বেশি ব্যবহার করেন বলিযা ইহার ছেকানুপ্রাস নাম হইয়াছে। ছেকানুপ্রাস কখনও এক ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিতে হয় না; বৃত্ত্যনুপ্রাস হইতেও ইহার স্বাতন্ত্র্য আছে। বৃত্ত্যনুপ্রাসে স্বরূপসাদৃশ্যানুসারে বিযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ দুইবার ধ্বনিত হয়, কিন্তু ছেকানুপ্রাসে ক্রমসাদৃশ্যানুসারে ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় দুইবার ধ্বনিত হয। ধ্বনিগুচ্ছের ক্রমসাদৃশ্য এবং দ্বিরাবৃত্তি ছেকানুপ্রাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথা,—

সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ছেকানুপ্রাস

[ক] চলইতে **শঙ্কিল পঙ্কিল** বাট। (গোবিন্দ দাস)

[খ] সে যে মু**ক্ত**কেশীর শ**ক্ত** বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না (রামপ্রসাদ)

[গ] কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী।
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে। (মাইকেল)

[ঘ] বাজিবে মঙ্গল শঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষণ
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দার মঞ্জরী। (রবীন্দ্রনাথ)

বিযুক্ত ব্যঞ্জনের ছেকানুপ্রাস

[ক] এ **ঘোর** যামিনী মেঘের **ঘটা** (চণ্ডীদাস)

[খ] এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা **দলনী** ও শৈব**লিনী**র অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র)

[গ] জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে (রবীন্দ্রনাথ)

[ঘ] **গিরি, গৌরী** আমার এল কৈ? (গোবিন্দ চৌধুরী)

[ঙ] ওমা **কালী** চির**কাল**ই **সং সা**জালি **সংসা**রে (প্রেমিক)

[**তিন**] **শ্রুত্যনুপ্রাস**

কতকগুলি বর্ণ বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থানকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হয়; উচ্চারণস্থানের তারতম্য অনুযায়ী বর্ণমালা কণ্ঠ্য, তালব্য প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত। ক, খ, গ, ঘ, কণ্ঠ্যবর্ণগুলি এক জাতীয়, চ, ছ, জ, ঝ, শ,—তালব্য বর্ণগুলি এক জাতীয়; এইরূপ মূর্দ্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য বর্ণও আছে। এইরূপ এক জাতীয় একাধিক ধ্বনির শ্রুতিসুখকর সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়। যেমন,

(১) **ল**ঙ্ঘিতে হবে **রা**ত্রি নিশীথে **যা**ত্রীরা হুঁশিয়ার।

—এখানে য, র, ল প্রভৃতি একজাতীয় ধ্বনি, ইহাদের সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের সৌন্দর্য্য বাঙালীর নিকট তেমন উপভোগ্য নয়। কারণ বাঙলায় উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বর্ণের উচ্চারণ অনেক সময়েই হয় না। **'মনসিজ'** শব্দটিতে 'ন' ও 'স' উভয়ই দন্ত্যবর্ণ, কিন্তু ইহার শ্রুত্যনুপ্রাস বাঙালীর কানে ধরা পড়ে না, আবার 'ন' ও 'ণ', কিংবা 'জ' (বর্গীয়) এবং 'য' (অন্তঃস্থ), কিংবা শ, ষ, স ভিন্ন জাতীয় হইলেও তাহাদের ধ্বনিগত মিল আমরা সহজেই স্বীকার করি। বাঙলায় অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণও প্রায় এক প্রকার (যেমন, ভাত=বাত, ঘর=গর); এখানে র, ড়, ঢ়-এর ধ্বনিগত পার্থক্যও বড় রক্ষা করা হয় না—উহাদেরও উচ্চারণ প্রায় একরূপ; আবার সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে ক, ক্য ও ক্ক—খ্য ও ক্ষ; দ, দ্ম, দ্য ও দ্ব—প্রভৃতির উচ্চারণ এক প্রকার। অতএব বাঙলার

শ্রুত্যনুপ্রাস বাঙালীর উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী ধ্বনি-সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ সন্নিবেশিত হইল—

[ক] আমি যেটা বলি সোজা সেটা জলবৎ যায় বোঝা— (রজনীকান্ত)
[এখানে য, জ এবং ঝ ধ্বনি দ্বারা শ্রুত্যনুপ্রাস হইয়াছে]

[খ] মৌলোভী যত মৌলবী আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে (নজরুল)
[এখানে 'ভ' ও 'ব'-এর শ্রুত্যনুপ্রাস]

[গ] ঈশান কোনে বিষাণ বাজে।
[এখানে 'শান' ও 'ষাণ'-এ শ্রুত্যনুপ্রাস।

[ঘ] জীবনের স্রোতে সহস্র অশ্রু-সজল স্মৃতি ভাসিযা যায়।
[এখানে 'স্র', 'শ্রু', 'স্ম' ধ্বনিতে শ্রুত্যনুপ্রাস হইয়াছে]

[ঙ] 'দেখিয়া বিশ্বের লাগে পরম বিস্ময়' ['শ্ব' ও 'স্ম'-এর শ্রুত্যনুপ্রাস]

[চার] অন্ত্যানুপ্রাস

অন্ত্যানুপ্রাস বিশেষ ভাবে কবিতার মিলের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি কবিতায় দুই চরণের অন্তে অথবা পর্ব্বগুলির অন্তে অক্ষর-ধ্বনিগত যে মিল থাকে, তাহাকে **অন্ত্যানুপ্রাস** বলে। শেষ ধ্বনিটির সহিত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরধ্বনিকে যুক্ত করিয়া মিল রক্ষা করিলেই অন্ত্যানুপ্রাস শ্রুতিসুখকর হয় অর্থাৎ 'ফল'-এর সহিত 'জল'—'কুটিল'-এর সহিত 'জুটিল'—এইরূপ মিল থাকিলে উত্তম অনুপ্রাস হয়; 'ফল'-এব সহিত 'জাল', 'কুটিল'-এর সহিত 'পাটল'-এর মিল উত্তম মিল নয়। চরণান্তিক মিল প্রাচীন বাঙলা মিত্রাক্ষর ছন্দের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। যথা,

[ক] আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার।
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার॥ (কৃত্তিবাস)

বাঙলার-উচ্চারণ রীতি অনুসারে নানারূপ শ্রুত্যনুপ্রাস দ্বারা বিচিত্র ধরণের অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি কিংবা তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির মিল তো থাকেই, তাহা ছাড়াও আরও নানারূপ মিল দৃষ্ট হয়। যেমন,

[খ] আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!...
আমরা, মোটা খাব, ভাইরে পরব মোটা
মাখবো না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'। (কান্তকবি)

[গ] সাজি' বাটা ভরা ছাঁচি পান ব্য**জনী** হা**তে**
করে স্বজনে বীজন কত **সজনি ছাতে** !
সেথা চোখে চোখে স**ঙ্কেত** কানে কথা—যাও ধে**ৎ**—
ঢলে-পড়া অ**ঙ্কেতে মন্মথ** ঘায় !
আজ আমি ছাড়া আর সবে **মন মত্ত** পায়। (নজরুল)

গদ্যেও কখনও কখনও হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্বাস পর্ব্বের অন্তে, অনুপ্রাস প্রয়োগ করা হয়। যেমন,

'যদি বাঁকাটিকে চাও, ত' সংসার ভাসিয়ে দা**ও**। লোকে দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় ফির**বেন**—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখ**বেন**, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হয়ে ননী খা**বেন**।' (গিরিশচন্দ্র)

[পাঁচ] লাটানুপ্রাস

অর্থসমেত একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে **লাটানুপ্রাস** হয়: অবশ্য অর্থের যে একটু পার্থক্য না থাকে, তাহা নয়—সে-পার্থক্য হয় তাৎপর্য্যের দিক হইতে। সাহিত্য দর্পণে আচার্য্য বিশ্বনাথ লাটানুপ্রাসের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপে,—'শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ'

লাটানুপ্রাসে শব্দটির দ্বিরাবৃত্তি হইলেও, অর্থের দিক হইতে তাহা দ্ব্যর্থক হয় না, তাই বলা হইয়াছে 'ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ ন তু অর্থতঃ'; অর্থের দিক হইতে ভেদ দেখা গেলে, তাহা হয় 'যমক' অলঙ্কার। লাটানুপ্রাসে অর্থের দিক হইতে কোন পরিবর্ত্তন সূচিত হয় না। যেমন,

'লোকটা **টাকা টাকা** বলিয়া পাগল হইযা গেল'—এখানে 'টাকা', শব্দটি একই অর্থে দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে কিন্তু এই দ্বিরুক্তি দ্বারা 'টাকা টাকা'র তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে 'টাকা বিষয়ে অতিশয় চিন্তা'; অতএব ইহা লাটানুপ্রাস। অন্যান্য উদাহরণ,—

[ক] **'যাও যাও** যত ভাব জানা সব আছে' (রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য)

[এখানে 'যাও' শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা ক্রোধের ব্যঞ্জনা হইয়াছে]

[খ] **কালো** তা সে যতই **কালো** হোক্ (রবীন্দ্রনাথ)

[প্রথম 'কালো'র অর্থ 'কৃষ্ণবর্ণ', দ্বিতীয় 'কালোর' অর্থও তাই, কিন্তু দ্বিতীয় 'কালো' দ্বারা কালোর নিবিড়তা সূচিত হইয়াছে—অতএব ইহা লাটানুপ্রাস]

শব্দ (প্রাতিপদিক) ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি চিহ্নযুক্ত হইলেও কিংবা ভিন্ন সমাসান্তর্গত হইয়া পুনরুচ্চারিত হইলেও, যদি অর্থের বৈষম্য না ঘটে, তাহা হইলে তাহা লাটানুপ্রাসের অন্তর্গত হয়। যথা,

[ক] গাছে গাছে **ফুল, ফুলে ফুলে** অলি সুন্দর ধরাতল (যতীন্দ্রনাথ)

[খ] ওগো চন্দ্রা**ননে**! তোমার **আনন** আজ ম্লান কেন?

[গ] বিশ্ব তবোদ**রে** তুমি বিশ্বোদ**রী**,
পালন কর **বিশ্ব** নাম **বিশ্ব**ম্ভরী। (কাঙাল হরিনাথ)

যমক

বিভিন্নার্থে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে বা তুল্যরূপ দুইটি শব্দ ভিন্নার্থে বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হইলে **যমক** অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যমকের আরও সূক্ষ্মতর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন,

সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জন সংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে॥[১]

—ভিন্নার্থবোধক একটি পদ, স্বরসমেত ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্রমসাদৃশ্যানুসারে (স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ ক্রমেণ) সার্থক, নিরর্থক বা সার্থক-নিরর্থকরূপে পুনরাবৃত্ত হইলে **যমক** অলঙ্কার হয়।

(১) যমক অলঙ্কারে স্বরধ্বনি সহ ব্যঞ্জন ধ্বনির সাম্য থাকা চাই: 'বরষায় বরিষয়' যমক নয়—অনুপ্রাস, কারণ, উহাতে ব্যঞ্জনধ্বনির সাদৃশ্য থাকিলেও স্বরবৈষম্য বর্ত্তমান। তবে প্রাতিপদিকটি যদি এক হয় এবং তাহা যদি ভিন্নার্থবোধক হয়, তাহা হইলে বিভক্তিচিহ্ন দ্বারা ধ্বনির ঈষৎ বৈষম্য ঘটিলেও, তাহা যমক হইবে। 'পরাগে পরাগ মাখা' এখানে প্রথম 'পরাগ'-এর অর্থ পুষ্পরেণু, দ্বিতীয় 'পরাগ'-এর অর্থ ধূলা (রজঃ)। এখানে অলঙ্কার যমক।

(২) ধ্বনিগুলি ক্রমানুসারে পুনরাবর্ত্তিত হইবে: "**তবে বেত খাও**" যমক নয়—বৃত্ত্যনুপ্রাস। এখানে ধ্বনিগুচ্ছের স্বরূপসাদৃশ্য আছে, ক্রমসাদৃশ্য নাই।

(৩) যে পদটি পুনরাবৃত্ত হইবে, তাহা ভিন্নার্থবোধক হওয়া চাই: 'রাঙা কমল রাঙা পায়'—যমক নয়, লাটানুপ্রাস—কারণ এখানে 'রাঙা' শব্দ দুইটি একার্থবোধক। তবে, যমকে ব্যবহৃত পদদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ নিরর্থক

---

১ সাহিত্যদর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ

হইতে পারে, যেমন, মনেরি **বাসনা** শ্যামা, **শবাসনা** শোন্ মা বলি'—এখানে দ্বিতীয় 'বাসনা' নিরর্থক।

যমকের অসংখ্য প্রকারভেদ আছে। বস্তুতঃ পদ, পদার্দ্ধ, শ্লোক, শ্লোকাংশের ভিন্নার্থে আবৃত্তিভেদে এবং পদেরও আবার বাক্যের আদি, মধ্য ও অন্তে পুনরাবৃত্তি ভেদে যমক নানাপ্রকার। আমরা তাহাদের দিঙ্মাত্র উদাহরণ দিতেছি :—

আত্ত যমক : বাক্যের আদিতে স্থিত হইলে আদ্য যমক হয়। যথা,

[ক] **ভারত ভারত** খ্যাত আপনার গুণে।
[ভারত = ভারতচন্দ্র, ভারত = ভারতবর্ষ]

[খ] **এলো**কেশী **এলো** কেরে রণে কাল বরণে। (মহারাজ শিবচন্দ্র)
[এলো = আলুলায়িত, এলো = আসিল]

মধ্য যমক :

[ক] ভাবিলে ভবের **বাজি বাজি** হয় ভোর (ঈশ্বর গুপ্ত)
[বাজি = ভেল্‌কি, বাজি = খেলা]

[খ] পরে থাকি বলে বলি ইন্দ্রধনুর একাবলী
তাই **বৈ জয়ন্তী** কি আর পরবে **বৈজয়ন্তী** হার। (গোবিন্দ চৌধুরী)

[গ] মা আমার আনন্দময়ী নিরানন্দে যাব কেনে।···
এখন মিলেছে **তারা তারার** সনে। (কেদার নাথ রায়)
[তারা = চোখের তারা, তারা = এক মহাবিদ্যা]

[ঘ] সুদূর গোঠের শ্যাম**বার্তা** কি স্মরিছে রে **বার্তা**কু (যতীন্দ্রনাথ)
[বার্তা = খবর, দ্বিতীয় 'বার্তা' নিরর্থক]

[ঙ] নবীন ধানের আ-**ঘ্রাণে** আজি অ**ঘ্রাণ** হল মাৎ— (নজরুল)
[ঘ্রাণে = গন্ধ শুঁকিয়া, পরের 'ঘ্রাণ' নিরর্থক]

অন্ত্য যমক :

[ক] আটপণে আধ সের কিনিয়াছি চি**নি**।
অন্যলোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি **চিনি**॥ (ভারতচন্দ্র)
[চিনি = মিষ্ট দ্রব্য বিঃ, চিনি = জানি]

[খ] যত কাঁদে বাছা বলি **সর সর**
আমি অভাগিনী বলি **সর্ সর্**। (কৃষ্ণকমল গোস্বামী)
[সর = দুধের সর, সর্ = সরিয়া যা']

[গ] ক্ষুধায় মলিন হয়েছে **অধর**
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা **ধর্**। (মহেন্দ্রলাল খান)
[প্রথম 'ধর' অর্থহীন, দ্বিতীয় 'ধর্' = গ্রহণ কর্]

সর্ব্ব যমক :

কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে॥

[প্রথম চরণে কান্তার = দয়িতার, আমোদ = আনন্দ, কান্ত = স্বামী, সহকারে = সঙ্গে। দ্বিতীয় চরণে কান্তার = বনভূমি, আমোদ = সৌরভ, কান্ত = বসন্ত কাল, সহকারে = সমাগমে। সর্ব্ব যমকের দৃষ্টান্ত বাঙলায় বিরল]

অন্যান্য দৃষ্টান্ত

[ক] **মশায়,** দেশান্তরী করলো আমায় কেশ নগরের মশায়। (অন্নদাশঙ্কর)
[মশায় = মহাশয়, মশায় = মশাতে]

[খ] জগতে **মানুষ** কেহ নাই। মনের **মানুষ** কোথা পাই। (ঈশ্বর গুপ্ত)
[মানুষ = খাঁটি লোক, মানুষ = অন্তরঙ্গ জন]

[গ] হেরিয়ে গগন-**তারা,** মনে হলো প্রাণের **তারা,**
শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না **তারা**। (অন্ধ চণ্ডী)
[তারা = নক্ষত্র, তারা = উমা, তারা = তাহারা]

যমক সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা

[এক] ইংরাজি Pun বা Paronomasia অলঙ্কারের সহিত যমকের আংশিক মিল আছে : ইংরাজির Pun হইতেছে –'A play on the various meaning of the same word.' (Bain), যেমন,

I from my mistress come to you in post;
If I return, I shall be post indeed.*
[Post = quickly, Post = wooden post]

কিন্তু ইংরাজিতে Pun-এর ব্যবহার হয় কেবলমাত্র রসিকতার সৃষ্টিতে : বাঙলায় রসান্তরের যোজনাতেও যমকের ব্যবহার দেখা যায়। ধ্বনিবাদীরা অবশ্য রসসৃষ্টির ব্যাপারে যমককে বাদ দিতে বলিয়াছেন, কারণ ইহা প্রায়ই 'অপৃথগ্‌যত্নে' সৃষ্ট হয় না।

*Comedy of Errors, Act I Sc. 2,

[দুই] লাটানুপ্রাসের সহিত যমকের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রকৃতিতে দুইটি ভিন্ন। লাটানুপ্রাসে একটি শব্দ একই অর্থে বাক্যমধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়, তাৎপর্য্যের দিক হইতে তাহাদের ভেদ থাকে, কিন্তু যমকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে পদটির পুনরাবৃত্তি ঘটে : যেমন 'কপাল**কুণ্ডলা** কে তা জানি না, আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্**কুণ্ডলা** হইয়াছি' (বঙ্কিমচন্দ্র)

—ইহা যমক, না লাটানুপ্রাস ? 'কপাল (মাথার খুলি) কুণ্ডল যাহার= কপালকুণ্ডলা, কুণ্ডল নাই যাহার=নিষ্কুণ্ডলা; উভয় স্থলেই 'কুণ্ডলা' একার্থবোধক —এইরূপ বিচার করিলে ইহা লাটানুপ্রাস। কিন্তু ইহা লাটানুপ্রাস নয়, যমক। 'কপালকুণ্ডলা' যে একটি ব্যক্তির নাম, 'কে' সর্ব্বনাম হইতে তাহা প্রতীয়মান হইতেছে, আর 'নিষ্কুণ্ডলা'র 'কুণ্ডলা' কুণ্ডলধারিণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে : অতএব এখানে একটি পদেরই সাথক ও নিরর্থক দ্বিরাবৃত্তি দ্বারা **যমক** সৃষ্টি হইয়াছে।

[তিন] অন্ত্যানুপ্রাস ও অন্ত্য যমকও একপ্রকার : কেবলমাত্র ধ্বনিগত মিলের দিক হইতে বিচার করিলে যাহা অন্ত্যানুপ্রাস, ধ্বনিগত সাদৃশ্য এবং অর্থগত পার্থক্য এতদুভয়ের যুগপৎ বিচারে তাহা অন্ত্য যমক। যেমন,

দয়া কর দয়া কর পাতিযাছি **কর**।
কর পাত একবার আমি দিই **কর**॥ (ঈশ্বর গুপ্ত)

— ইহা একদিকে অন্ত্যানুপ্রাস। আবার 'কর=হাত, কর=রাজস্ব' বিচারে অন্ত্য যমক। অর্থের পার্থক্য না থাকিলে অন্ত্যানুপ্রাস হইবে।

শ্লেষ

বক্তা যখন একটি ভিন্নার্থক শব্দের উভয় অর্থ লক্ষ্য করিয়াই শব্দটিকে বাক্য মধ্যে একবার মাত্র প্রয়োগ করেন, তখন **শ্লেষ** অলঙ্কার হয়।

বাঙলায় শ্লেষ শব্দটি নিন্দাসূচক ব্যঙ্গোক্তি (Taunt) অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অর্থশ্লেষের মধ্যে অনেক সময় এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি যে বর্ত্তমান না থাকে, তা নয়—শব্দ-শ্লেষে তাহা গণনীয় নয়। শ্লেষ অলঙ্কারে 'শ্লেষ' শব্দের অর্থ 'সংযোগ, আলিঙ্গন'। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ এই শেষোক্ত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্লেষ অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন : 'শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে' (সাহিত্যদর্পণ)

সাধারণতঃ একটি উচ্চারিত শব্দে একটি অর্থই প্রকাশ পায়, তৎসত্ত্বেও এক প্রযত্নে উচ্চারিত একটি শব্দ দ্বারা যখন অনেকার্থ প্রতিপাদিত হয়, তখন

শ্লেষাখ্য অলঙ্কার হইয়া থাকে। শব্দটি যেন ভিন্নার্থে দুইবারই প্রযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্বর ও ব্যঞ্জনসমূহের একরূপতা হেতু, সংযুক্ত (শ্লিষ্ট) হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, অর্থ ভিন্ন ভিন্নই রহিয়াছে। শ্লেষ যেন যমকেরই একটি পরিণত রূপ: যমকে শব্দটি যেখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুইবার (বা বহুবার) প্রয়োগ করা হয়, শ্লেষে সেখানে শব্দ দুইটি সংযুক্ত হইয়া একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অর্থ যমকেরই মত ভিন্ন থাকিযা যায়।

শ্লেষ ও যমক

সংস্কৃতে বর্ণ, প্রত্যয, লিঙ্গ, প্রকৃতি, পদ, বচন, বিভক্তি ও ভাষা-গত শ্লিষ্টতাহেতু শ্লেষের নানা প্রকারভেদ আছে। বাঙলায় শ্লেষের এরূপ প্রয়োগ বড় দেখা যায় না, কেবল একশেষ দ্বন্দ্বের উদাহরণে (যেমন, আমরা =তুমি, সে ও আমির শ্লেষ বা সংযোগ, তাহারা=রাম, যদু, মধু ইত্যাদির শ্লেষ)—এইরূপ শ্লেষের নমুনা দেখা যায়। বাঙলায় শ্লেষ বলিতে একাধিক অর্থে একটি মাত্র পদ বা শব্দের প্রযোগকেই বুঝায, যেমন,

[ক] **ইলাবৃতে** ঘর মোর জাতিতে **ব্রাহ্মণী**।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥ (কবিকঙ্কণ)

[ফুল্লরার নিকট চণ্ডীদেবীর আত্ম-পরিচয়: ইলাবৃত—(১) পুরাণোক্ত দেশবিশেষ (২) মোঙ্গলদের দেশ; ব্রাহ্মণী - (১) ব্রাহ্মণের স্ত্রী (২) ব্রহ্ম বিদ্যা-দায়িনী; শিশুকাল···ভ্রমি একাকিনী—(১) আশৈশব নিরাশ্রয় (২) চিরকাল অদ্বিতীয়া—(তুলনীয়: 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীযা কা মমাপরা'—শ্রীশ্রীচণ্ডী)। অতএব পরিচযটি শ্লেষাত্মক অর্থাৎ দ্ব্যর্থক: ইহার এক অর্থ, আমার ইলাবৃতে নিবাস, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণী এবং আশৈশব নিরাশ্রয়; অন্য অর্থ—আমি মোঙ্গলদেশবাসিনী মঙ্গলচণ্ডী, ব্রহ্মবিদ্যা-দায়িনী এবং নিত্যা, অদ্বিতীয়া]

[খ] **মধুহীন** করো না গো তব মনঃ কোকনদে (মধুসূদন)

[এখানে মধু=(১ মধুসূদন (২) পুষ্পের মিষ্ট রস, এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় শ্লেষ অলঙ্কার হইযাছে। বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ্য করিযা মধু কবির এই মিনতি—তোমার মানস-পদ্ম মধুহীন করিও না।]

[গ] অপরূপ রূপ **কেশবে**। (দাশরথি রায়)

[এখানে কেশব=কৃষ্ণ: দ্বিতীয় অর্থ পাওযা যায় 'কেশব' শব্দটিকে ভাঙ্গিয়া 'কে শবে' উচ্চারণ করিলে, তখন অর্থ হয়—'কালী'; অতএব বাক্যটি কৃষ্ণপক্ষে ও কালীপক্ষে—উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া শ্লেষাত্মক]

শ্লেষ অলঙ্কারকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—[এক] **অভঙ্গ শ্লেষ** ও [দুই] সভঙ্গ শ্লেষ। যেখানে মূল শব্দকে না ভাঙ্গিয়া দুইটি অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে বলে **অভঙ্গ শ্লেষ :** যেমন 'বামুন বাদল বান, **দক্ষিণা** পেলেই যান'—ব্রাহ্মণ, বাদল এবং বন্যা 'দক্ষিণা' পাইলেই বিদায় গ্রহণ করে : এখানে 'দক্ষিণা' শব্দটি ভিন্নার্থক—(১) ব্রাহ্মণপক্ষে ইহার অর্থ 'ক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্রাপ্য অর্থ', (২) বাদল ও বন্যা পক্ষে ইহার অর্থ 'দক্ষিণা বাতাস'; দক্ষিণাবহ বায়ু বহিলে বাদল ও বন্যা চলিয়া যায়।

যেখানে মূল শব্দে এক অর্থ এবং শব্দটিকে ভাঙ্গিলে আর এক অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে হয় **সভঙ্গ শ্লেষ**। 'পরম **কুলীন** স্বামী'—'কুলীন' শব্দটিকে না ভাঙ্গিয়া অর্থ পাওয়া যায়, 'বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন'; দ্বিতীয় অর্থটি পাওয়া যায়, শব্দটিকে ভাঙ্গিলে—'কু-লীন' = জগদাত্ম।

কেহ কেহ বলেন, 'সভঙ্গ শ্লেষ'ই প্রকৃত শব্দশ্লেষ, কারণ ইহাতে কণ্ঠ-স্বরের উদাত্ত-অনুদাত্তাদি উচ্চারণভেদে ধ্বনিসৌন্দর্য্য প্রকট হয় : অভঙ্গ শ্লেষ প্রকৃতপক্ষে অর্থশ্লেষের বিষয় : একবৃন্তে যেমন দুইটি ফল তেমনই অভঙ্গ শ্লেষে একটি অখণ্ড শব্দে দুইটি অর্থের সমাবেশ হইয়া থাকে। কিন্তু আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন, বস্তুতঃ শব্দ বা শ্লেষ অলঙ্কার শব্দের সভঙ্গত্ব বা অভঙ্গত্বের উপর নির্ভর করে না; যেখানে শব্দের ধ্বনিসৌন্দর্য্যই প্রধানভাবে প্রকট, তাহাই শব্দশ্লেষ, সেখানে শব্দ-ধ্বনিরই প্রাধান্য। আর যেখানে সৌন্দর্য্য অর্থের দিক হইতে সূচিত হয়—সেখানে অর্থশ্লেষ। শব্দ পরিবর্ত্তন করিলেও যেখানে শ্লেষ অব্যাহত থাকে, সেখানে অর্থশ্লেষ; শব্দশ্লেষ শব্দের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। ইহাই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মূল পার্থক্য। শ্লেষ অলঙ্কারের আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত :—

[এক] **অভঙ্গ শ্লেষ :**

[ক] ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নদার আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র চমৎকার শ্লেষের অবতারণা করিয়াছেন :

> অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
> কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
> কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
> কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

[ইহার এক অর্থ :—আমার স্বামী (১) 'অতি বড় বৃদ্ধ' (অত্যন্ত বুড়া) ; (২) 'সিদ্ধিতে নিপুণ' (ভাঙ্-খোর), তাঁহার (৩) 'কোন গুণ নাই' (গুণহীন) (৪) 'কপালে আগুন' (অর্থাৎ পোড়াকপাল) ; তিনি (৫) কুকথায় পঞ্চমুখ (কটু বাক্য বলিতে ওস্তাদ), তাঁহার (৬) 'কণ্ঠ ভরা বিষ' (কথায় বিষের জ্বালা) এবং তিনি (৭) কেবল (শুধু) (৮) 'আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' (দিবারাত্র আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন : দ্বন্দ্ব=বিবাদ)। ইহার দ্বিতীয় অর্থ :—আমার স্বামী (১) অনাদি (২) সিদ্ধ, মুক্ত পুরুষ (৩) গুণাতীত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত), (৪) তাঁহার ললাটে তপঃসঞ্জাত বহ্নি, ইহাদ্বারা মদন ভস্মীভূত হইযাছিল, (৫) তিনি 'কুকথা' অর্থাৎ প্রপঞ্চ-সৃষ্টির কথায় পটু (তিনিই আগম ও পুরাণের বক্তা) এবং পঞ্চমুখ (পঞ্চবক্ত্র) মহাদেব, (৬) তাঁহার কণ্ঠে সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত বিষ, তাই তিনি নীলকণ্ঠ এবং (৭) তিনি 'কেবল' (অদ্বিতীয়) এবং (৮) আমার সহিত তাঁহার চির মিলন (তন্ত্রমতে শিব সর্ব্বদা শক্তি-বিশিষ্ট)। ইহা ব্যাজস্তুতি অর্থালঙ্কারেরও দৃষ্টান্ত]

[খ] বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি, দুই এক টান টানিযা বলিলেন,
'ওহে হুঁকাটা **পীসে পীসে** বলছে, **খুড়াখুড়া** বলছে না কেন ?'—টেকচাঁদ

[হুঁকার নল অপরিষ্কার থাকিলে তামাক খাইযা সুখ হয় না, টানিতেও কষ্ট হয়—টানিলে 'পিস্ পিস্' আওযাজ হয : আব নল পরিষ্কাব থাকিলে দিব্যি 'খুড় খুড়' (গড়্গড়্) আওয়াজ দেয। গড়গড়া হুঁকাই হুঁকাবির নিকটাত্মীযের মত (খুড়ার মত) এবং পিস্পিসে হুঁকা দূরাত্মীয়ের মত (পিসার মত)। বাবুবাম বাবু শ্লেষ প্রযোগ করিযা এই কথাটিই বুঝাইতে চাহিতেছেন : ইহার এক অর্থ,-হুকা দূরাত্মীয়ের মত 'পীসে পীসে' বলে, নিকটাত্মীয়ের মত 'খুড়া খুড়া' বলে না : আর দ্বিতীয অর্থ—হুঁকাটা পিসপিসে অর্থাৎ অপরিষ্কার, তাই 'খুড়্ খুড়্' আওযাজ হয না, অতএব ইহা পরিষ্কার করা প্রয়োজন।]

[গ] কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু—ওর নাম কি—আজ তবে উঠি
—ঈশান-কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ)

['ঈশান' বৈকুণ্ঠবাবুর ভৃত্য ; কেদার বৈকুণ্ঠবাবুব নিকট হইতে টাকা বা খাবার আদায় করিয়া লয়, তাহা ঈশান পছন্দ করে না, বরং ক্রুদ্ধ হয : উপরি-উক্ত 'ঈশাণ-কোণে ঝড়ের লক্ষণ' তাহারই ইঙ্গিত, ইহাই ব্যঙ্গার্থ,

বাচ্যার্থটি স্পষ্ট, তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না। ঈশান—(১) ভৃত্য ঈশান (২) উত্তর-পূর্ব্ব কোণ—যেখান হইতে ঝড় উঠে ; ঝড়ের লক্ষণ—(১) ক্রোধের লক্ষণ, (২) ঝটিকার ইঙ্গিত]

[দুই] **সভঙ্গ শ্লেষ :**

সভঙ্গ শ্লেষের দৃষ্টান্ত বাঙলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। প্রাচীনেরা হেঁয়ালি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইরূপ সভঙ্গ শ্লেষ সৃষ্টি করিতেন। যেমন

[ক] 'পৃথিবী**টা কার** বশ ?'—এই প্রশ্নটির উত্তর হইবে, 'টা' পৃথক করিয়া 'কার'-এর সহিত যোগ করিলে—'পৃথিবী টা**কার** বশ।'

তেমনই,—

[খ] '**মালা কার** বাড়ী পাওয়া যায় ?'—'**মালাকার** বাড়ী পাওয়া যায়।'

[গ] 'রাবণ বধের হেতু **জান কী** ?'—'রাবণ বধের হেতু **জানকী**।'

শ্লেষ অলঙ্কার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) ইংরাজীর Pun বা Paronomasia অলঙ্কারের সহিত শ্লেষেরও সাদৃশ্য আছে : ইংরাজিতে Pun—শ্লেষ ও যমক উভয়ই। সংস্কৃতে ইহারা পৃথক পৃথক অলঙ্কার। ইংরাজি Pun-এ শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে লইয়া শ্লেষ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। যেমন,

Prince : Is not a buff-jerkin a most sweet robe of durance ?*

[এখানে Robe of durance কথাটিতে Pun রহিয়াছে—ইহার এক অর্থ 'a dress that will wear well and long' ; দ্বিতীয় অর্থ 'a prison dress' (i. e. reference to imprisonment)]

(১) শব্দশ্লেষের সহিত অর্থশ্লেষের আকার-গত সাদৃশ্য আছে। 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি'—ব্যাজস্তুতি (অর্থশ্লেষ) অলঙ্কারও হয়। কিন্তু শব্দ ও অর্থশ্লেষের পার্থক্য শব্দ-ধ্বনি ও শব্দার্থের দিক হইতে। যেখানে অর্থ হইতেও শব্দ-ধ্বনির চমৎকারিত্ব—সেখানে শব্দশ্লেষ, আর যেখানে শব্দ-ধ্বনি হইতেও অর্থের চারুত্ব সেখানে অর্থশ্লেষ হয়। মনে রাখিতে হইবে, শব্দালঙ্কার শব্দের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না।

বক্রোক্তি

বক্রোক্তি বলিতে সাধারণভাবে বুঝায় 'বাঁকা কথা' : সাধারণ উক্তি হইতে ইহা স্বতন্ত্র। কেহ কেহ 'বক্রোক্তি'কে প্রসারিত অর্থে গ্রহণ করিয়া সমগ্র

* King Henry IV. Part I, Act I. Sc. II

অর্থালঙ্কারকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য কুন্তক 'বক্রোক্তি'কে বলিয়াছেন, 'কাব্যজীবিতম্'। তাঁহার মতে, সমগ্র অলঙ্কার, রীতি, গুণ—এমন কি, রস পর্য্যন্ত এই বক্রোক্তির অন্তর্ভূত।

কিন্তু বাচ্যালঙ্কার রূপে বক্রোক্তি এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বক্তা একটি ভিন্নার্থক শব্দকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলে, অপরে অর্থাৎ শ্রোতা যদি সেই অভিপ্রেত অর্থকে গ্রহণ না করিয়া, শ্লেষনিবন্ধন বা কাকুনিবন্ধন, অন্য অর্থে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে **বক্রোক্তি** অলঙ্কার হয়। আচার্য্য বিশ্বনাথ এইরূপে বক্রোক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েৎ যদি।
অন্যঃ শ্লেষেণ কাক্বা বা সা বক্রোক্তিঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ)

বক্রোক্তি অলঙ্কারে দুইটি পক্ষ থাকে—বক্তা ও শ্রোতা: উভয়ের প্রশ্নোত্তর বা উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতে বক্রোক্তির সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। যেমন,

[ক] প্রশ্ন: **দ্বিজ** হয়ে কেন কর **বারুণী** সেবন?
উত্তর: রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

[এখানে প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন, দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) হইয়া বারুণী (মদ্য) সেবন কর কেন? উত্তরকর্ত্তা 'দ্বিজ' ও 'বারুণী'র এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া উত্তর দিলেন, সূর্য্যের ভয়েই চন্দ্র পশ্চিমদিকে যাইতেছে, অর্থাৎ উত্তরকর্ত্তা প্রশ্নটিকে গ্রহণ করিয়াছেন 'দ্বিজ (চন্দ্র) কেন বারুণী (পশ্চিমদিকে) যায়?—এই অর্থে। ইহাই বক্রোক্তি অলঙ্কার]

(২) প্রশ্ন: বিপ্র হয়ে **সুরাসক্ত** কেন মহাশয়?
উত্তর: **সুরে** না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয়।

[এখানে প্রশ্নের দুইটি অর্থ হইতে পারে (১) বিপ্র (ব্রাহ্মণ) হইয়া সুরা (মদ্য)-আসক্ত কেন; (২) ব্রাহ্মণ হইয়া সুর (দেবতা)-আসক্ত কেন? প্রথমটিই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেত, কিন্তু উত্তরদাতা সে অর্থে বাক্যটি গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতেছেন, দেবতায় আসক্ত না হইলে কি মুক্ত হওয়া যায়?]

বক্রোক্তি দুই প্রকারের—[এক] শ্লেষ বক্রোক্তি ও [দুই] কাকু বক্রোক্তি।

[এক] **শ্লেষ বক্রোক্তি:** এক শব্দ দ্বারা দুইটি অর্থ প্রকাশিত হইলে শ্লেষ হয়। যে বক্রোক্তি শ্লেষাশ্রিত, তাহাকে বলা হয় শ্লেষ-বক্রোক্তি। শ্লেষ-

বক্রোক্তিতে শব্দার্থের বৈচিত্র্যই লক্ষণীয় : বক্তার অভিপ্রেত অর্থ শ্রোতা অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন : যথা,—

[ক] রাধা—কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
কৃষ্ণ—**হরি** হাম।
রাধা— জানি না, কর পরচার।
পরিহরি সো গিরি কন্দর-মাঝ
মন্দিরে কাহে আওত মৃগরাজ। (ঘনশ্যাম দাস)

['হরি' শব্দ দ্ব্যর্থক—(১) কৃষ্ণ (২) সিংহ (মৃগরাজ)। কৃষ্ণ প্রথম অর্থেই 'হরি হাম' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন : কিন্তু রাধা দ্বিতায় অর্থে গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতেছেন—সিংহ কেমন করিয়া গিরিকন্দর পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরে আসিবে ?—ইহা শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার]

[খ] ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া কহিল, 'সে কি! একি! তুমি? তুমি **সাগর?**' পাঁচকড়ি বলিল, 'আমি **সাগর**। গঙ্গা নই, যমুনা নই—বিল নই, খাল নই, সাক্ষাৎ **সাগর**।'

[ব্রজেশ্বরের স্ত্রীর নাম 'সাগর', ব্রজেশ্বর সেই অর্থেই 'সাগর' কথাটি ব্যবহার করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর-কর্তা পাঁচকড়ি (সাগরবৌ) 'সাগর=সমুদ্র', অর্থ ধরিয়া উত্তর দিতেছেন।]

[দুই] **কাকু বক্রোক্তি :** 'কাকু' শব্দের অর্থ কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হেতু ('কাকা') যেখানে এক শব্দ ভিন্নার্থ প্রকাশ করে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করেন, সেখানে কাকু বক্রোক্তি হয়। সাধারণতঃ এই অলঙ্কারে প্রশ্নের বিধি (Affirmation) নিষেধরূপে (Negation) বা নিষেধ বিধিরূপে গৃহীত হয়। যেমন,

[ক] কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ? —কেউ ছেঁড়ে না। জিজ্ঞাসা দ্বারা এই অর্থই সূচিত হয়। ইহা কাকু বক্রোক্তি।

[খ] অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ, অগম গহন অরণ্যানী আঁধার, সর্ব্ব লোকাশ্রয়, আলোর আলো · সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণ-পুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? (শরৎচন্দ্র)

—এখানেও প্রশ্ন দ্বারা নিষেধস্থলে বিধি বুঝাইতেছে। কিন্তু সত্যকারের কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি হইতেও অন্য অর্থ গৃহীত হয়। যথা,—

[গ] সাহেব। হুঁয়া একটা **ঘর** হ্যায়?
বৈষ্ণবী বলিল। ঘর?—কত ঘর আছে? (বঙ্কিমচন্দ্র)

সাহেবদের উচ্চারণে বাঙলা 'গ'—অনেকটা 'ঘ'-এর মত শুনায়; সাহেব গড় (কেল্লা) বুঝাইতে সেইভাবেই 'গর' উচ্চারণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবীবেশিনী শান্তি তাহা গ্রহণ করিল 'ঘর' এই অর্থে। অতএব ইহা কাকু বক্রোক্তি।

তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে: বক্রোক্তিতে বক্তা যে অর্থ লক্ষ্য করিয়া শব্দটি প্রয়োগ করেন, শ্রোতা তাহা বুঝিয়াও যদি সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া উত্তর দেন, তবেই তাহা সার্থক বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়,—তাহা না হইলে ঠিক বক্রোক্তি হয় না, যেমন,—বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের এই অংশটি—

ইংরেজ। হম্ again আয়া হ্যায়—

শৈবলিনী। কেন, **যমের** বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিয়া কহিল, কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?

শৈবলিনী। বলি, **যম** কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। **যম**। John you mean? হম্ জন্ নহি, হম্ লরেন্স।

শৈবলিনী-প্রোক্ত 'যম' কথাটিকে উচ্চারণের তারতম্য হেতু ইংরেজ লরেন্স ফষ্টর 'John' বলিয়া মনে করিতেছে। এখানে 'কাকু' কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি আছে বটে, কিন্তু ইহা ঠিক 'বক্রোক্তি' হয় নাই। কারণ, উত্তর দাতা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য নয়, প্রমাদবশতঃ এক শব্দকে অন্য শব্দ বলিযা মনে করিতেছেন।

পুনরুক্তবদাভাস

কোনও বাক্যে যদি একার্থক অথচ পৃথগাকার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয় এবং আপাতশ্রবণে তাহাদিগকে পুনরুক্ত বলিয়া মনে হইলেও তাৎপর্য্য অবধারণে যদি দেখা যায় যে, তাহা পুনরুক্তি হয় নাই, তাহা হইলে **পুনরুক্তবদাভাস** অলঙ্কার হয়।

এই অলঙ্কারে একার্থক, অথচ পৃথগাকৃতিবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বাক্যমধ্যে পর পর ব্যবহৃত হয়। শব্দগুলি শুনিলেই মনে হয়, বুঝি শব্দের পুনরুক্তি (Repetition) হইতেছে, কিন্তু অর্থ অবধারণ করিলে দেখা যায় যে, শব্দগুলি একার্থক হইলেও তাহাদের তাৎপর্য্য ভিন্ন ভিন্ন: যেমন, **ভুজঙ্গ কুণ্ডলী**—ভুজঙ্গ ও কুণ্ডলী উভয়ই একার্থবোধক, শ্রবণমাত্রে মনে হয়, বুঝি এখানে পুনরুক্তি হইতেছে, কিন্তু তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে দেখা যায়, 'ভুজঙ্গ-কুণ্ডলীর' অর্থ 'ভুজঙ্গরূপ কুণ্ডলী'—অতএব ইহা একার্থক শব্দের পুনরুক্তি মাত্র নয়:

তেমনই **বনমালী কৃষ্ণ**—এখানে 'বনমালী' শব্দটি কৃষ্ণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। একার্থক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বিরুক্তি দ্বারা অলঙ্কারটি গঠিত হইলেও প্রত্যেকটি শব্দ ভিন্ন তাৎপর্য্যবোধক—ইহাই পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষণীয়—

[ক] বন্দ নারায়ণী ভৈরবী ভবানী নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী (কবিকঙ্কণ) —ভৈরবী (ভয়ঙ্করী), ভবানী (ভব-পত্নী), নগেন্দ্র-নন্দিনী (গিরিসুতা), চণ্ডী (মঙ্গল-চণ্ডী) নারায়ণীকে বন্দনা কর।—অন্যান্য একার্থবোধক শব্দগুলি 'নারায়ণী'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[খ] ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে **ভোলা ত্রিপুরারি** (রামপ্রসাদ)

[গ] এপারেতে লঙ্কা গাছটি **রাঙা টুকটুক** করে। (প্রচলিত ছড়া)

[ঘ] 'অরুণ-সূর্য্য', 'স্রোতস্বিনী নদী', 'পীতাম্বর কৃষ্ণ', 'নীলকণ্ঠ-শিব', 'এলোকেশী কালী', 'তনু দেহ', 'বিশ্ব জগৎ', 'নিশীথ রাত্রি', 'পঞ্চশর মদন' —এই ধরণের পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার কথায় কথায় ব্যবহার করা হয়।

পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

[এক] যমক ও পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কারের পার্থক্য এই যে যমকে ভিন্নার্থক একাকৃতি-বিশিষ্ট একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বারবার ব্যবহৃত হয়, পুনরুক্তবদাভাসে একার্থক ভিন্নাকৃতি দুইটি বা ততোধিক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য অনুযায়ী বার বার ব্যবহৃত হয়: 'মনেরি **বাসনা** শ্যামা, শ**বাসনা** শোন মা বলি' (যমক: বাসনা=কামনা, দ্বিতীয় 'বাসনা' নিরর্থক) 'মনেরি বাসনা **শ্যামা শবাসনা** শোন মা বলি' (পুনরুক্তবদাভাস)।

[দুই] লাটানুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কারের পার্থক্য এই যে, লাটানুপ্রাসে একার্থক একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য অনুসারে—একাধিকবার উচ্চারিত হয়, কিন্তু পুনরুক্তবদাভাসে একার্থক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য অনুযায়ী একাধিকবার ব্যবহৃত হয়: 'গ্রাম **ছোট**, জমিদার আরও **ছোট** (লাটানুপ্রাস): '**ছোট** এক **খুদে** জমিদার' '**একরত্তি ছোট** ছেলে' (পুনরুক্তবদাভাস)

(৩)

অর্থালঙ্কার পরিচিতি

[ক] সাদৃশ্যবোধক অলঙ্কার

সাদৃশ্য-বোধ মানব-মনের একটি চিরন্তন ধর্ম্ম। এই বোধদ্বারা এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর সাদৃশ্য অনুভূত হয়, ইহাকে বলা যায—'Power of like to recall like'। মনের এই প্রবণতা থাকার জন্যই মানুষ বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর মধ্যে অহরহ একরূপতা আবিষ্কার করিয়া চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক বিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আইনজ্ঞ এক মকদ্দমার নজির দিযা অন্য মকদ্দমার সওয়াল করিতেছেন, নৈয়ায়িক সাদৃশ্যবোধের আশ্রয়ে অনুমান করিতেছেন, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও সাদৃশ্য আবিষ্কারের বিরাম নাই: 'তাদের ছেলেটা বাঁদর', 'আমার মেয়েটি লক্ষ্মী', 'ও আমার অন্ধের নড়ি বা ষষ্ঠীর সল্‌তে', 'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি', 'ও একটা গোমূর্খ', 'তিনি বিদ্যায বৃহস্পতি' এমনই কত কি। কবিদের তো কথাই নাই, কল্পনা-সাগর মন্থন করিযা তাঁহারা ঔপম্য-গর্ভ অলঙ্কার সংগ্রহ করেন।

সাদৃশ্যের প্রতি লেখক মাত্রেরই আকর্ষণের অন্যান্য কারণও আছে :—

(১) তুলনা করিযা বুঝাইলে, অতি সহজে বক্তব্য অন্যের নিকট পরিস্ফুট করা যায। 'তার মুখখানি সুন্দর'- এইটুকু বলিলেও বক্তব্য যেন স্পষ্ট হয় না, শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগে,—কেমন সুন্দব ?'—ইহাব উত্তরে লেখক যখন বলেন, 'চাঁদেব মত সুন্দর' তখন অস্পষ্টতা কাটিয়া যায, মুহূর্ত্তে যেন মনের মধ্যে চাঁদ আর মুখ খেলা করিতে থাকে। যে-সমস্ত ভাব অনির্ব্বাচ্য, তুলনা করিয়া না বুঝাইলে, তাহা কিছুতেই স্পষ্ট হইতে চায না।

(২) তুলনায় বক্তব্য বিষয় হৃদযে গভীরতর বেখাপাত করিতে সমর্থ হয, বাচ্য অধিকতর শক্তিশালী হয়—ইহা যেন মন্ত্রশক্তির মত ক্রিয়া করে। তুলনার ছবি চিরদিনের মত হৃদয়ে মুদ্রিত হইযা যায। মনে করি, শরৎচন্দ্রের অন্নদা দিদির কথা :

> আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। (শ্রীকান্ত)

—কেবল দুইটি উৎপ্রেক্ষা। ইহা দ্বারা অন্নদাদিদির মূর্তিখানি কেবল নয়, তাঁহার চরিত্রটিকেও লেখক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ওই চিত্র, ওই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বঙ্গীয় পাঠক-হৃদয়ে চিরকালের জন্য অমর হইয়া গিয়াছে।

(৩) অলঙ্কার মাত্রেরই লক্ষ্য—সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সৃষ্টি করা। সাদৃশ্য-প্রতীতির সাহায্যে যত সহজে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সঞ্জীবচন্দ্রের উপমা-সাদৃশ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

> উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড় আনন্দের উদয় হয় · সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের সহিত আর কতগুলি সৌন্দর্য্য জড়িত হইয়া যায়। সে একটা ইন্দ্রজালের মত।[১]

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের স্বরূপ ও উপকরণ :

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার সৃষ্টি করিতে হইলে বা বিচার করিতে হইলে গোড়াতেই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক : প্রথম কথা,—

> Resemblance is not a Figure of Speech, unless the things compared be different in kind. (Bain)

এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু তাহা অলঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। যদি বলা যায, 'হেনার চোখ দুটি মঞ্জুর চোখ দুটির মত'—তাহা হইলে তাহা অলঙ্কার হইবে না। আমরা কথায় কথায় বলি, 'রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মত বড় কবি', 'তোমার ছেলেটি দেখিতে আমার ছেলেটির মত', 'এই লোকটি ওই লোকটির মতই চঞ্চল'—এগুলির কোনটিই সাদৃশ্য-বাচক অলঙ্কার নয় : এগুলি সাধারণ ভাষণ বা বস্তুর বিবৃতি মাত্র। সাদৃশ্যকে পরিস্ফুট করিতে প্রয়োজন দুইটি বিসদৃশ বস্তু বা বিষয়। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্যের আবিষ্কার করাই অলঙ্করণের লক্ষ্য। যখন বলা হয়, 'পাখীর নীড়ের মত চোখ', 'বিদ্যুৎতুল্য কটাক্ষ', 'এও যে রক্তের মত রাঙা'—তখনই সৌন্দর্য্য-চর্ব্বনা সুরু হয়। ইহাই অলঙ্কার।

দ্বিতীয়তঃ সাদৃশ্য-কল্পনা দ্বারা বক্তব্য যদি অধিকতর মনোজ্ঞ না হয়, তাহা যদি শ্রোতার হৃদয়ে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে না পারে—তাহা হইলে অলঙ্কার যোজনার কোন সার্থকতাই থাকে না। এই জন্যই সাদৃশ্যমূল অলঙ্কার

---

[১] আধুনিক সাহিত্য ('সঞ্জীবচন্দ্র প্রবন্ধ') —রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকগণ বার বার 'প্রতিভোত্থিত' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'সর্প রজ্জুবৎ'—এই উক্তির মধ্যে কোন অভিনবত্ব নাই : সর্প ও রজ্জু বিসদৃশ, তাহাদের মধ্যে দীর্ঘত্বের দিক হইতে সাদৃশ্যও আছে, তথাপি উক্তিটিকে অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ হয়, কারণ উক্তিটি অতি সাধারণ, ইহা কবি-প্রতিভায় উত্থিত হয় নাই। কিন্তু কবি যখন বলেন, 'বেণীভুজঙ্গ তুলিয়াছে ফণা'—তখন সর্পাকৃতি বেণীর সৌন্দর্য্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতএব সাদৃশ্য-কল্পনায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাতে কবি-প্রতিভার স্পর্শ থাকা প্রযোজন।

সাদৃশ্য-বোধক অলঙ্কারের প্রধান উপকরণ তিনটি : (১) **উপমেয়** (২) **উপমান** ও (৩) **সাধারণ ধর্ম্ম**। ইহাদের এক এক প্রকার সন্নিবেশে, এক এক প্রকার অলঙ্কার গঠিত হয।

উপমেয় : সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারে যে বস্তুটি প্রধান অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিযা অলঙ্কারটি সৃষ্ট হয় তাহাকে **উপমেয়** বলে। যেমন, **অসীম আকাশ প্রায় নীল জলরাশি'** (বিহারীলাল)—এই উক্তিটির মধ্যে কবির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় **জলরাশি** : ইহাকেই কবি দেখিযাছেন, ইহাকেই তিনি তুলনা করিয়া আরও সুস্পষ্ট করিতে চান, ইহাই তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয। এই 'জলরাশি' এখানে উপমেয। সংস্কৃতে উপমেয়কে 'প্রকৃত', 'প্রস্তুত', 'বর্ণনীয বিষয়' অথবা শুধু 'বিষয়' নামেও অভিহিত করা হয।

উপমান : উপরের উদাহরণে কবি 'জলরাশি'—এই প্রস্তুত বিষযটিকে **'আকাশ'**-এর সহিত তুলনা করিযাছেন। 'আকাশ' এখানে প্রধানভাবে বর্ণনার বিষয় নয় ; বর্ণনাব প্রধান বিষয জলরাশিকে তুলনায পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে 'আকাশ' বাহির হইতে সমাহৃত। **'আকাশ' উপমান**। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারে যে অপ্রকৃত বিষযের সহিত প্রকৃত বিষয়কে তুলনা করা হয, তাহাকে **উপমান** বলে। সংস্কৃতে উপমানকে 'অপ্রকৃত' বা 'অপ্রস্তুত' বিষয়ও বলা হয় ; 'অপ্রস্তুত' এইজন্য যে ইহা মূল প্রস্তাবিত বিষয নয়, ইহা কল্পিত বা সমাহৃত। কবি প্রধানতঃ 'জলরাশি'কেই বুঝাইতে চান, কিন্তু বুঝাইতে চান একটি তুলনা দিয়া। কাহার সহিত তিনি এই 'জলরাশিকে' তুলনা করিবেন ? কবির কল্পনায় ধরা দিল 'আকাশ', কারণ, 'সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্' (বাল্মীকি)। এই 'আকাশ' উপমান—কবির কল্পনা-ধৃত অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত বিষয।

উপমানের অভিনবত্ব ও চারুত্বের উপরেই সাধারণতঃ সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। প্রস্তুত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র, অথচ কোন এক বিষয়ে সমান গুণবিশিষ্ট যে কোন বস্তুকে কবি উপমান রূপে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উপমেয় হইতে যদি তাহার তেমন অভিনবত্ব না থাকে, তাহা হইলে অলঙ্কারটি মনোজ্ঞ হয় না।

সাধারণ ধর্ম্ম : সাগরের 'জলরাশি' ও 'আকাশ'—দুইটি দুই পৃথক বস্তু, স্থূল দৃষ্টিতে ইহারা বিসদৃশ : জল রসের আধার—আকাশ শব্দের আধার, একটির স্থান নিম্নে অপরটির স্থান উর্দ্ধে। ইহাদের সাদৃশ্য কোথায়? কবির কল্পনায় বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইল। কবি দেখিলেন, জলরাশি **নীল**—আকাশও **নীল**। এই নীলিমা রসাধার ও শব্দাধারকে, অধঃ ও উর্দ্ধকে এক করিয়া দিল ; ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম উপমেয় ও উপমান উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান অথবা উভয়েরই অনুগত তাহাকে **সাধারণ ধর্ম্ম** বলে। ইহাকে 'সামান্য ধর্ম্ম'ও বলা হয়। সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা দুই বিসদৃশ বস্তুর সাদৃশ্য প্রতীত হয়। সাধারণ ধর্ম্ম (১) গুণগত অথবা (২) ক্রিযাগত—দুই প্রকারের হইতে পারে। উপরেরর উদাহবণে 'নীল' সাধারণ ধর্ম্মটি গুণগত ; তেমনই 'দুগ্ধফেননিভ **শুভ্র** শয্যা', 'কপাট **বিশাল** বুক', **প্রফুল্ল** রাজীববৎ আনন', 'যম সম **ভীম** মুখ'। সাধারণ ধর্ম্ম আবার ক্রিযাগতও হইতে পারে যেমন,—

[ক] অনল সমান **পোড়ে** চইতের খরা। —কবিকঙ্কণ

[খ] **ভাতিল** অসি অগ্নিশিখা সম। —মধুসূদন

[গ] তলোয়ার বিদ্যুতের মত **চকমক্ করিয়া উঠিল**। —রবীন্দ্রনাথ

কোন কোন সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারে সাধারণ ধর্ম্মের অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখা যায় : সেখানে সাধারণ ধর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে অলঙ্কারের প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায। এইজন্য সাধারণ ধর্ম্মের প্রকারভেদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটি উপমায় সাধারণতঃ তিন প্রকারে সাধারণ ধর্ম্মের সমাবেশ হইয়া থাকে, —

(১) কথনও সাধারণ ধর্ম্মটি একটি মাত্র শব্দে (গুণবাচক বা ক্রিয়াবাচক) প্রকাশিত হইয়া উপমেয় ও উপমানের সাধর্ম্ম্য প্রতিষ্ঠা করে। উপরের সবগুলি উদাহরণেই সাধারণ ধর্ম্মেব এইরূপ অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

[ক] যুবক সূর্য্যের সম **দীপ্ত** দেহ-রূপ—ঈশ্বরগুপ্ত

[খ] শাল-**প্রাংশু** মহাভুজ রথী—কালিদাস রায়

[গ] কচি লাউয়ের ডগার মত বাহু দু-খান **লম্ব**—জসীমউদ্দীন

[ঘ] দূরে বালুচরে **কাঁপিছে** রৌদ্র ঝিঁঝিঁর পাখার মত—যতীন্দ্রনাথ সেন

(২) কখনও কখনও সাধারণ ধর্ম্ম **সমার্থক দুইটি পৃথক শব্দে** প্রকাশিত হয়। এরূপস্থলে সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি হইলেও অর্থের দিক হইতে তাহারা এক। এই প্রকারের সাধারণ ধর্ম্মকে **বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম** বলা হয়। যেমন,

[ক] **আভরণহীন** দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতনহীন বনসুশোভিনী
লতা। —মধুসূদন

—এখানে 'দেহ' উপমেয় তাহার সাধারণ ধর্ম্ম 'আভরণহীন'; 'লতা' উপমান, তাহার সাধারণ ধর্ম্ম 'কুসুমরতন-হীন': সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি; শব্দের দিক হইতে পৃথক হইলেও তাহারা একার্থবোধক, ইহারা বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন।

[খ] রক্ত উৎপল ফুলে যৈছে ভ্রমর **বুলে**
ঐছন **ফিরয়ে** দুন আঁখি।

—রাত্রি জাগরণে কৃষ্ণের চক্ষু দুইটি লাল, তাহার মধ্যে কালো তারা (মণি) চঞ্চলভাবে ঘুরিতেছে: রক্তচক্ষুর মধ্যে মণির চঞ্চলতাকে তুলনা করা হইয়াছে রক্ত উৎপলে কালো ভ্রমরের আনাগোনার সহিত: যেমন ভ্রমর 'বুলে' তেমনি দুন আঁখি 'ফিরয়ে'। এখানে সাধারণধর্ম্ম দুইটি ক্রিয়াগত, তাহারা পৃথক শব্দে প্রকাশিত হইলেও—সমার্থক। অতএব ইহারা বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন।

(৩) আবার কখনও কখনও সাধারণ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক দুইটি শব্দে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের সাদৃশ্য ধরা পড়ে না, সাদৃশ্যটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। এরূপস্থলে সাধারণ ধর্ম্ম দুইটিকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম** বলা হয়: যেমন,

[ক] যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে। —মধুসূদন

—এখানে উপমেয় 'বলী'র সাধারণ ধর্ম্ম 'চাহিলা', উপমান 'পথিক'-এর সাধারণ ধর্ম্ম 'ত্রাসে হীন গতি': সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নার্থবোধক; সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য। অতএব ইহারা বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন।

[খ] গন্ধ পাওয়া না গেলেও মালতীমালার সৌন্দর্য্য যেমন **নয়ন হরণ করে,** সৎ কবির কাব্যের অর্থবোধ না হইলেও তাহাও তেমনই কর্ণে সুধা **বর্ষণ করে।**

--এখানে 'হরণ করে' ও 'বর্ষণ করে'—এই সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি একরূপ নয়, তাহাদের সাম্য প্রণিধানগম্য ; ইহারা বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন।

উপমা

দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে, তাহাকে যদি একবাক্যে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে **উপমা** অলঙ্কার হয়।

উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানকে ভিন্ন জাতীয় হইতে হইবে। ইহাতে এতদুভয়ের বিসদৃশ কোন গুণের উল্লেখ থাকিবে না, থাকিবে ইহাদের সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ। সর্ব্বোপরি এই অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানকে একবাক্যে অবস্থান করিতে হইবে। সংস্কৃতেও উপমার এইরূপ সংজ্ঞার্থই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—'সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ' (সাহিত্য-দর্পণ) —এই সংজ্ঞার্থে 'বাক্যৈক্যে' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপমায় বাক্যের ঐক্য চাই, অর্থাৎ অলঙ্কারটি **এক বাক্যের** অলঙ্কার হওয়া চাই। অবশ্য বাক্যটি সরল বা জটিল হইতে পারে। যেমন,

[ক] 'সে কটাক্ষ, এই সাগরজলে ক্রীড়াশীল চন্দ্র কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।' (সরল বাক্যের উপমা)

[খ] 'গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী'। (জটিল বাক্যের উপমা)

[জটিল বাক্যে একাধিক বাক্য থাকিলেও, তাহারা সাপেক্ষ সর্ব্বনাম বা অব্যয় দ্বারা যুক্ত হওয়ায় একবাক্য বলিয়াই গণ্য হয়।]

উপরের বাক্য দুইটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, অন্যান্য সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের মতই একটি উপমায় সাধারণতঃ একটি প্রস্তুত বিষয় (উপমেয়), একটি অপ্রস্তুত বিষয় (উপমান), সাধারণ ধর্ম্ম (সামান্য ধর্ম্ম) থাকে। উপরন্তু ইহাতে থাকে সাদৃশ্যবোধক পদ। এইগুলিকে বলা হয়, উপমার চতুরঙ্গ। প্রাচীনকালে 'চতুরঙ্গ' কথাটি যুদ্ধ ব্যাপারেই প্রয়োগ করা হইত। প্রতিপক্ষ

দুইটি দল চতুরঙ্গ (অশ্ব, হস্তী, রথ, পদাতিক) লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন। উপমাতেও তেমনি উপমেয় ও উপমান—এই দুই প্রতিপক্ষের যুদ্ধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়; এখানকার চতুরঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপরে [ক]-দৃষ্টান্তে—'কটাক্ষ'—উপমেয়, 'চন্দ্রকিরণ' —উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম—'স্নিগ্ধোজ্জ্বল' এবং 'ন্যায়'—সাদৃশ্যবাচক পদ; [খ]-দৃষ্টান্তে—'বীরেন্দ্রবলী'—উপমেয়, 'জীমূতেন্দ্র' (মেঘরাজ)—উপমান, 'গম্ভীরে মন্দ্রে'—সাধারণ ধর্ম্ম এবং 'যেমতি' সাদৃশ্যবাচক পদ।

উপমেয়, উপমান এবং সাধারণ ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এখন **সাদৃশ্য-বাচক** শব্দটির কথা বলা যাইতেছে। যে শব্দটি উপমেয় ও উপমানকে একসূত্রে গ্রথিত করে এবং বাক্যটি জটিল হইলে, যাহা উপমেয় ও উপমানকে তো বটেই, সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে, এমন কি, নিরপেক্ষ বাক্য (Principal Clause) এবং সাপেক্ষ বাক্যকে (Subordinate Clause) অন্বিত করে—তাহাকে **ঔপম্যবাচী শব্দ** বা **সাদৃশ্যবোধক পদ** বলে। জন্থ=যেন (যেমন, যেমতি—এই অর্থে), হেন, পারা, মতন, সমান, প্রতিম, ছন্দ, যথা, ন্যায, রীতি, 'বৎ'-প্রত্যয় প্রভৃতি সাদৃশ্য-বোধক শব্দ। উপরের উদাহরণ দুইটিতে যথাক্রমে 'ন্যায়' ও 'যেমতি' —এই দুইটি সাদৃশ্য-বোধক পদ। পরে অপরাপর পদগুলিরও প্রয়োগ প্রদর্শিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজির উপমা (Simile) সংজ্ঞার্থটিও জানিযা রাখা প্রযোজন:

'The Simile or Comparison consists in likening one thing to another in formal or express language. It therefore necessitates the employment of some definite word to institute the comparison: '*as*', '*as-so*', '*like*', '*resemble*', '*compare*'. (Bain) : e. g.—'Human greatness is short and transitory, as the odour of incense in the fire'. (Johnson)

উপমার প্রকার ভেদ

উপমার প্রধান প্রকারভেদ দুইটি: **পূর্ণোপমা** (পূর্ণ+উপমা) এবং **লুপ্তোপমা** (লুপ্ত+উপমা)। এই দুইটি ছাড়াও উপমার অসংখ্য প্রকারভেদ আছে—মালোপমা (মালা+উপমা), মহোপমা, বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা,

বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা, স্মরণোপমা ইত্যাদি। আচার্য্য বিশ্বনাথ 'শ্রৌতী' ও 'আর্থী' ভেদে উপমার অনেকগুলি প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে প্রধান প্রধান কয়েকটি উপমার পরিচয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

[এক] **পূর্ণোপমা** (পূর্ণ+উপমা)

যে উপমায়—উপমেয়, উপমান, সামান্য ধর্ম্ম এবং ঔপম্যবাচী শব্দ—এই চতুরঙ্গই উপস্থিত থাকে, তাহাকে **পূর্ণোপমা** বলে : 'সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম্ম ঔপম্যবাচী চ উপমেয়ং চোপমানং ভবেদ্বাচ্যম্' (সাহিত্য দর্পণ)। যথা, 'শঙ্খ প্রায় শ্বেত অঙ্গ'—এখানে 'অঙ্গ'—উপমেয়, 'শঙ্খ' উপমান, 'শ্বেত'—সামান্য ধর্ম্ম, 'প্রায়'—সাদৃশ্যবোধক শব্দ—উপমার চতুরঙ্গই এখানে সুস্পষ্ট উল্লিখিত : ইহা পূর্ণোপমা। তেমনই,—

[ক] কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়। (চণ্ডীদাস)

—'কানুর পিরীতি' উপমেয়, 'চন্দন' উপমান ; 'রীতি'—সাদৃশ্যবোধক পদ ; সামান্য ধর্ম্ম 'ঘষিতে সৌরভময়'। কৃষ্ণপ্রীতি চন্দনের মত : চন্দন যেমন ঘষিলে সৌরভযুক্ত হয়, এই পিরীতিও তেমনই ঘর্ষণ (মনন বা বিশ্লেষণ) করিলে সৌরভ-মাধুর্য্য প্রকাশ করে অথবা বেদনার মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য প্রকট হয়। এখানে উপমার চতুরঙ্গ উপস্থিত থাকায় ইহা পূর্ণোপমা হইয়াছে।

[খ] চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল (দাশরথি রায়)

—জীবন 'চঞ্চলা' (বিদ্যুৎ)-এর মতই চঞ্চল (অস্থির) ইহাই বক্তব্য।

[গ] ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা। (মধুসূদন)

[ঘ] দেখিলেন, চিত্রিত ধনুদণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল তলে মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচন দুটি মুদিয়া আছে। (বঙ্কিমচন্দ্র)

—এখানে দুইটি পূর্ণোপমা (১) চিত্রিত ধনুদণ্ডবৎ ভ্রূযুগল (২) মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচন : চন্দ্রশেখর নিদ্রিত শৈবলিনীর এই রূপ দেখিলেন।

[ঙ] তাহার পরই 'কালাপানি'—**জল সিউ-কালীর মত কালো।** তাহাতে ছোট ছোট সাদা ঢেউ ; আর ঢেউয়ের উপর **মুক্তার মত সাদা জলের কণা।** (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে)

[চ] গফুর···পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল। (শরৎচন্দ্র)

[ছ] 'ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ চৌদশী চাঁদ সমান' (বিদ্যাপতি); 'কানুর পিরীতি কুহকের রীতি সকলি মিছাই রঙ্গ (চণ্ডীদাস); 'তৃষিত চাতকের মত রাণী চেয়ে পথ পানে' (কমলাকান্ত) 'তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত' (রবীন্দ্রনাথ)—সবগুলিই পূর্ণোপমা।

[দুই] লুপ্তোপমা (লুপ্ত+উপমা)

যে উপমায় সাদৃশ্যবোধক পদ, সামান্যধর্ম্ম এবং উপমান—এই তিনটির মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে, তাহাকে **লুপ্তোপমা** বলে। যেমন,—

(১) **সাদৃশ্যবাচক পদের লোপ :**

[ক] কপাট-বিশাল বুক। (মুকুন্দরাম)

—কপাটের **মত** বিশাল বুক। 'মত' লুপ্ত।

[খ] তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর। (গোবিন্দদাস কবিরাজ)

[গ] মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে। (ঈশ্বর গুপ্ত)

[ঘ] বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। (সঞ্জীবচন্দ্র)

[ঙ] দেখেছি তার কালোহরিণ-চোখ (রবীন্দ্রনাথ)

[চ] তাহার ননীর দেহে দুধে-আলতার রঙ : হৃদয়খানি কুসুম-কোমল।

(২) **সাধারণ ধর্ম্মের লোপ**

[ক] চন্দ্রতুল্য মুখ প্রিয়ে, পাণি তব পল্লব সমান,
স্নধাসম বাক্য আর ওষ্ঠ বিম্বসম, মন তব যেমতি পাষাণ।

—ইহা সাহিত্যদর্পণোক্ত সাধারণ ধর্ম্ম লোপে লুপ্তোপমার দৃষ্টান্তটির মুক্তানুবাদ। সাধারণ ধর্ম্মগুলি যোগ করিলে হইবে, চন্দ্রতুল্য **আহ্লাদক** মুখ, পল্লব সমান **কোমল** পাণি, সুধাসম **মধুর** বাক্য, বিম্বের মত **রক্তবর্ণ** ওষ্ঠ, পাষাণের মত **কঠিন** মন।

[খ] 'মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত'—রবীন্দ্রনাথ।

—সঙ্গীতের মত 'মধুর'—ইহাই তাৎপর্য্য।

[গ] আমাদের দেবতা হয় শ্যাম, নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয় মন্দিরে রজতগিরি সন্নিভ কিংবা জবাকুসুম সংকাশ দেবতার স্থান নাই।—বীরবল

—সাধারণ ধর্ম্ম হইবে রজতগিরি সন্নিভ **শুভ্র**, জবাকুসুম সংকাশ **রক্তবর্ণ**। 'সন্নিভ' ও 'সংকাশ'—সাদৃশ্যবোধক পদ।

[সাধারণ ধর্ম্ম লুপ্ত থাকিলে তাহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়। অগ্নিপুরাণে এই ধরণের উপমাকে 'বস্তূপমা' বলা হইয়াছে। যেখানে সাধারণধর্ম্ম পরিস্ফুট, তাহা 'ধর্ম্মোপমা'। 'নেত্র তব খঞ্জন-চঞ্চল'—ধর্ম্মোপমা; 'নয়ন খঞ্জন তুল্য'—বস্তূপমা। তেমনই পদ্মআঁখি; উৎপলাক্ষী, মীনাক্ষী, 'পাখীর নীড়ের মত চোখ'—বস্তূপমা; সাধারণ ধর্ম্ম এখানে প্রতীয়মান]

(৩) **উপমানের লোপ :**

[ক] 'লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা।
ছলচ্ছল, টলট্টল, কলক্কল তরঙ্গা ॥ (ভারতচন্দ্র)

—'তরঙ্গিত গঙ্গা' উপমেয়, উপমান অনুপস্থিত। 'ছলচ্ছল', 'টলট্টল', 'কলক্কল' —সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মগুলিতে উপমান যোগ করিলে উপমাগুলির রূপ হইবে—নর্ত্তকীর মত চঞ্চল (ছলচ্ছল), দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ (টলট্টল), বালিকার ন্যায় কলভাষিণী (কলক্কল)।

[খ] মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে,
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে। —জসীমউদ্দীন

—মুখখানি তার কোন **তরল পদার্থের** মত 'ঢলঢল': উপমান 'তরল পদার্থ' এখানে অনুভববেদ্য।

(৪) সাধারণ ধর্ম্ম, ঔপম্যবাচী শব্দ এবং উপমান—ইহাদের যে কোন একটি, দুইটি, এমন কি তিনটির লোপেও লুপ্তোপমা হয়। সাধারণতঃ উপমান ও সাধারণ ধর্ম্ম সমাসবদ্ধ হইলে উপমান ও সাদৃশ্যবোধক পদের লোপে লুপ্তোপমা হয়। সমাসবদ্ধ পদটিকে কেবল উপমেয় বলিয়া ধরিলে, উপমাটিকে **ত্রিলোপে লুপ্তোপমা** বলা যায়। যেমন,

[ক] **গোরোচনা-গৌরী** পেখনু ঘাটের কূলে—চণ্ডীদাস

—এখানে 'গোরোচনা-গৌরী' সমস্তপদটি উপমেয়: ইহার ব্যাসবাক্য করিলে পূর্ণোপমার রূপটি পাওয়া যায়,—**গোরোচনার মত হলুদবর্ণ গৌরী :** মূল পদে উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম, সাদৃশ্যবাচক পদ উহ্য ছিল। গোরোচনা গৌরী অর্থাৎ রাধিকা।

[খ] কারে কবে দুঃখের কথা আমার **স্বর্ণলতা বিধুমুখী**—অন্নদামঙ্গল

—স্বর্ণলতা বিধুমুখী অর্থাৎ 'উমা'; স্বর্ণলতা = স্বর্ণের মত উজ্জ্বল যে লতা; বিধুমুখী = বিধুর (চন্দ্রের) মত সুন্দর মুখ যাহার।

[তিন] **বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা**

আমরা পূর্ব্বে বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের সাধারণ ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি। 'বস্তু' মানে উপমেয়ের ধর্ম্ম, 'প্রতিবস্তু' উপমানের ধর্ম্ম। উপমানের ধর্ম্মটি উপমেয়ের ধর্ম্মেরই অনুরূপ, তাহাদের অর্থ এক, কেবল শব্দ দুইটি পৃথক। ধর্ম্ম দুইটি যেন একটি আর একটির প্রতিরূপ: যেমন, 'ফুটিল পদ্ম আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র উঠে'—এখানে'ফুটিল' ও 'উঠে' ক্রিয়া দুইটি স্বতন্ত্র হইলেও ফলিতার্থে এক; ইহাই বস্তু-প্রতিবস্তু ভাব'।

যে উপমায় উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন অর্থাৎ ধর্ম্ম দুইটির ভাষা ভিন্ন কিন্তু অর্থ এক এবং সাদৃশ্যবোধক পদটি লুপ্ত নয়, তাহাকে **বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা** বলে।

উপমার সংজ্ঞার্থে বলা হইয়াছে যে, উপমায়—উপমেয় ও উপমান **একই বাক্যে** থাকে। সাধারণ ধর্ম্ম যদি পৃথক শব্দে প্রকাশিত হয়, তবে বাক্যটি এক বাক্য হয় কিরূপে? - এক বাক্যই হয়, তবে তাহা সরল বাক্য হয় না, হয় জটিল বাক্য। বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমায় সাদৃশ্য-বাচক পদটি উপস্থিত থাকেই, তাহাই বাক্যের ঐক্য সম্পাদন করে। 'যথা', 'যেমন', 'যেমতি ·· তেমতি'—এই ঔপম্যবাচী শব্দগুলি একদিকে যেমন সাদৃশ্য প্রকট করে, অন্যদিকে তেমনই পরস্পরসাপেক্ষ সর্ব্বনাম বা অব্যয়রূপে দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করিয়া এক বাক্যে পরিণত করে, ইহার ফলেই উপমার 'বাক্যৈক্য' অব্যাহত থাকে। যেমন,

[ক] মত্ত লোভ-মদে
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় **নাশে** অনায়াসে
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র **গ্রাসয়ে** যেমতি
স্বশিশু। —মধুসূদন

—বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা। উপমেয় 'মূঢ়' (বিভীষণ)—তাহার ধর্ম্ম 'নাশে'; উপমান 'ব্যাঘ্র'—তাহার ধর্ম্ম 'গ্রাসয়ে': 'নাশে' ও 'গ্রাসয়ে' ধর্ম্ম দুইটি রূপে পৃথক হইলেও একার্থক অর্থাৎ বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। সাদৃশ্য-বাচক পদ 'যেমতি'—স্পষ্ট উল্লিখিত ইহা দুই বাক্যকে সংযুক্ত করিয়াছে।

[খ] বাঞ্ছা **ঘুরে** বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
বাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার **ফিরে**
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। —রবীন্দ্রনাথ

[গ] পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্ত লোহা ও মাথার সিন্দুর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী **সূচিত করিয়া দেয়**··· প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্ত মঙ্গল ঘট ও চূত পল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিব সুন্দর ভাব **সঞ্চারিত করিয়া দেয়**।

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ঘ] **আয়** মা এখন তারারূপে স্মিতমুখে শুভ্র বাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে **আসে**। —দ্বিজেন্দ্রলাল

—কালোবরণ তারার শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত হইয়া আবির্ভাব, নিশার ঘন আঁধারে উষার আবির্ভাবের মত। উপমাটি বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন।

[চার] বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা

'বিম্ব' অর্থ, উপমেয়ের ধর্ম্ম, 'প্রতিবিম্ব' অর্থ উপমানের ধর্ম্ম। বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব—ইহার অর্থ, উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম্মের, ভাষা ও অর্থ উভয়ই পৃথক, তাহাদের সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বলেন, 'বিম্বানুবিম্বত্বং— বিম্বস্য = সাদৃশ্যস্য, অনুবিম্বত্বং = প্রণিধানেন গম্যসাম্যত্বম্'।

যে উপমায় উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি শব্দ ও অর্থের দিক হইতে একেবারে ভিন্ন, সাদৃশ্য কেবল প্রণিধানগম্য এবং যাহাতে ঔপম্যবাচী শব্দ সর্ব্বদা উপস্থিত, তাহাকে বলে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা**। যেমন,—

[ক] কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো। (রামপ্রসাদ)

—জীব ভবে আসিবার আশা করিয়াছিল, আসা হইল—কিন্তু 'আসামাত্র হলো'—ইহাই এখানে 'বিম্ব'—উপমেয়ের ধর্ম্ম : ভ্রমর উপমান, তাহার ধর্ম্ম 'চিত্রের পদ্মেতে পড়ে···ভুলে রলো'—ইহা 'প্রতিবিম্ব'। এই সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি ভাষার দিক হইতে তো বটেই, অর্থের দিক হইতেও স্বতন্ত্র, কারণ 'আসামাত্র হলো' আর 'ভুলে রলো'—সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। তাহা হইলে সাদৃশ্য কোথায়? অনুমান করিয়া দেখা গেল, জীব সংসারে আসিয়াছে, কিন্তু আসল রসের আস্বাদন পায় নাই, মায়ের চরণ-পদ্মের রস আস্বাদন না করিয়া অসার সংসার-রসে প্রমত্ত রহিয়াছে। এই অনুমান দ্বারা জীবের 'আসামাত্র হলো'র সহিত—'চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো'র

সাদৃশ্য অনুভব করা যাইতেছে। প্রণিধানগম্য এই সাদৃশ্যই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব; যেন ছায়ার সহিত ছায়ার সাদৃশ্য। অতএব বলা যায়, ইহা বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা। উপমার বাক্যগত ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে 'যেমন' এই ঔপম্য-বাচী শব্দ দ্বারা।

[খ] বরিষার কালে সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে তীর অতিক্রমি
বারি রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মন
দুঃখিত, **দুঃখের কথা কহে সে** অপরে। —মধুসূদন

[পাঁচ] মালোপমা (মালা+উপমা)

যে উপমায় একটি মাত্র উপমেয়কে স্ফুটতর করিবার উদ্দেশ্যে একাধিক উপমান সমাহৃত হয়, তাহাকে **মালোপমা** বলে। মালোপমার অর্থ, উপমার মালা। মালা যেমন তুল্যজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় পুষ্প দ্বারা রচিত হইতে পারে, মালোপমাও তেমনই তুল্যজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় অনেক উপমানের দ্বারা গঠিত হইতে পারে। যেমন,

[ক] দেখিলাম, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় এক বিকটমূর্ত্তি সেনাপতি। —তারাশঙ্কর তর্করত্ন

- এখানে উপমেয় 'সেনাপতি', উপমান—তিনটি 'কৃতান্তের সহোদর', 'পাপের সারথি', ও 'নরকের দ্বারপাল,' উপমানগুলি একজাতীয়; সামান্য ধর্ম্ম 'বিকটমূর্ত্তি'।

[খ] শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। —বঙ্কিমচন্দ্র

—কল্যাণীর 'চক্ষুরুন্মীলন'কে এখানে 'প্রভাতরাগ-বিকাশ', 'প্রভাতপদ্মের 'প্রথমোন্মেষ' ও 'প্রথম প্রেমানুভব'—এই তিনটি উপমানের মালায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

[গ] সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানী-বিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম নিশা অবসানে
প্রফুল্ল। —মধুসূদন

[ঘ] সিংহের ন্যায় সরল তেজস্বী এবং হরিণ শিশুর মত সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল। —রবীন্দ্রনাথ

বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের মালোপমা :

[ঙ] স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গ করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। —বঙ্কিমচন্দ্র

—এখানে সাধারণ ধর্ম্মগুলি একার্থবোধক; দুইটি বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের মালায় এই উপমাটি নির্ম্মিত।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের মালোপমা :

[চ] শূন্য জল জলপথে জলে লোকে স্মরে;
দেবশূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে—
সেইরূপে ধড় যবে পড়ে কালগ্রাসে
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে। —মধুসূদন

—'প্রাণ' উপমেয়, উপমান তিনটি 'জল', 'দেবতা', 'বৈশ্বানর'। সাধারণ ধর্ম্মগুলি 'স্মরে', 'বাস করে', 'ঢাকে',- ভিন্ন ও ভিন্নার্থক; কল্পনা করিয়া সাদৃশ্য স্থির করিতে হয়। অতএব উপমাটি বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের মালোপমা।

[ছ] সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড হায়রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।

—প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এটি লুপ্তোপমার মালা : কারণ 'যথা'; যেমতি, সাদৃশ্যবাচক পদ উহ্য। দ্বিতীয়তঃ 'হিয়া'—উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম 'সভয় হইল'—উপমান-মালার সাধারণ-ধর্ম্ম হইতে শব্দ ও অর্থের দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক : সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য। এতএব ইহা বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের মালোপমা।

[ছয়] মহোপমা (মহা+উপমা)

মহাকাব্যে ব্যবহারের উপযোগী যে উপমা, তাহাই মহোপমা। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় Epic Simile ; Homer এই ধরণের উপমা বেশি ব্যবহার করিয়াছিলেন ; এ জন্য ইহাকে Homeric Simile-ও বলা হয়। ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত বলেন :

> যে উপমায় আক্ষিপ্ত উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য্য বিশদরূপে বিবৃত হওয়ার ফলে তাহা একটি প্রায় স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ চিত্রের আকার ধারণ করে, উপমার মহত্ব ও মহাকাব্যের উপযোগিত্ব হেতু তাহার নাম **মহোপমা**।[১]

বস্তুতঃ মহোপমা, সাধারণ উপমা হইতে দীর্ঘতর হয় এবং ইহাতে উপমানকে বিশদ করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে - উপমার মধ্যে উপমার সৃষ্টি করা হইয়া থাকে : শেষোক্ত উপমা, উপমানকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। মহোপমার বিস্তৃতি ও গাম্ভীর্য্য মহাকাব্যের বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিপোষক। যেমন,

[ক] লজ্জায় আরক্ত মুখ এবে ধীরে ধীরে
প্যারিস প্রাসাদ হতে বাহিরে বাহিরে—
ঝকে ঝক্‌ঝকে চারু পিত্তল বরম,
যুবক নগর দ্রুত করে অতিক্রম—
তেজস্বী বন্ধনমুক্ত তুরঙ্গ যেমতি
পরিহরি অশ্বাগার ধায় দ্রুতগতি
পদক্ষেপে কাঁপে ভূমি, উল্লাস অন্তরে
দর্পভরে রণ-অশ্ব প্রবেশে সমরে ;
সতত বিশাল শিরঃ কাঁপযে আকাশে
উড়ায় কেশররাজি সতত বাতাসে
অধীর তুরগবর তুরগী-মিলনে
ধায় বেগভরে গর্ব্বে সমর-অঙ্গনে
প্রায়ামের কমনীয় তরুণ-নন্দন
সদর্পে কাঁপায়ে ধরা প্রফুল্ল বদন
ধাবিল তেমতি রণে হেক্টরের সনে।[২]

---

১ কাব্যশ্রী (অর্থালঙ্কার) ২ ইলিয়াড, ষষ্ঠ কাণ্ড—যোগেন্দ্রনাথ কাব্য-বিনোদের অনুবাদ

—প্রায়াম-পুত্র প্যারিস অগ্রজ হেক্টরের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছেন: 'যুবক নগর দ্রুত করে অতিক্রম'—ইহার সহিত বন্ধনমুক্ত তেজস্বী অশ্বের রণপ্রবেশ তুলিত হইতেছে। অশ্বের ভীমবেগের বর্ণনাই এই উপমায় মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাই মহোপমা। উপমানের বিশদ বর্ণনায় ইহা বিশালাকার।

[খ] যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে। —মধুসূদন

[গ] শিব করে আকর্ষিত হ'য়ে আখণ্ডল
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব—
যবে বাত্যা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল
বেষ্টি চতুর্দ্দিক দৃঢ় পাষাণ ভিত্তিতে। —হেমচন্দ্র (বৃত্রসংহার)

[সাত] স্মরণোপমা (স্মরণ+উপমা)

কোন বস্তুর দর্শনাদি জন্য অনুভব হইতে তৎসদৃশ অপর বস্তুর স্মরণ হইলে **স্মরণোপমা** অলঙ্কার হয়। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন, 'সদৃশানুভবাৎ বস্তু-স্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে।' (সাহিত্যদর্পণ)।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধিজ্ঞান জন্য স্মৃতির উদ্দীপন হইলেই স্মরণোপমা হয় না, স্মরণোপমায় বস্তু ও স্মৃত বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অনুভূত হওয়া চাই। যেমন,—

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল·· তাহা মনে পড়িল।

—ইহা স্মরণোপমা নয়, ইহা স্মৃতির রোমন্থন মাত্র। বস্তুদর্শনে যে স্মৃতি

জাগ্রত হইবে তাহার সহিত দৃষ্টবস্তুর উপমান-উপমেয়বৎ সাদৃশ্য থাকিলে স্মরণোপমা হয়। যথা,—

[ক] কেশ পানে চাহি যদি নয়ন কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥ —চণ্ডীদাস

—'কেশ', 'বসন'—প্রভৃতির দিকে চাহিয়া রাধিকার কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে: কেশ কালো, বসন নীল (গভীর কৃষ্ণবর্ণ) কৃষ্ণের বর্ণও কালো; কৃষ্ণ কেশ নীল বসন- কৃষ্ণের কৃষ্ণকান্তির স্মৃতি-উদ্বোধক। অতএব ইহা স্মরণোপমা।

[খ] হেরিয়ে গগন-তারা মনে হলো প্রাণের তারা। —অন্নদামঙ্গল

[গ] জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। —রবীন্দ্রনাথ

[ঘ] এই পদ্ম দেখে তোমার মুখ যে মনে পড়ে,
মৃণাল দেখে বাহু তোমার হৃদয় আমার স্মরে
হাসিখানি দেখি তোমার ফোটা শতদলে,
সেই চাহনি ছড়িয়ে আছে দীঘির কাল জলে।

—এখানে সরোবরের পদ্ম, মৃণাল, ফোটা শতদল ও কালোজল দেখিয়া কবির যথাক্রমে প্রিয়ার মুখ, বাহু, হাসি ও চাহনির কথা স্মরণ হইতেছে: অলঙ্কার স্মরণোপমা।

রূপক

উপমেয়কে অপহ্নব (গোপন) না করিয়া তাহাতে উপমানের অভেদ আরোপ করিলে **রূপক** অলঙ্কার হয়। সাহিত্যদর্পণে রূপকের এইরূপ সংজ্ঞার্থই নিরূপিত হইয়াছে:

'রূপকং রূপিতারোপাৎ বিষয়ে নিরপহ্নবে।'

[বিষয় = উপমেয়, রূপিত = বিষয়ী = উপমান, অপহ্নব = গোপন]

রূপক অলঙ্কারে উপমার মতই উপমেয় ও উপমান উভয়ই উপস্থিত থাকে। উপমায় এই দুইটি উপাদান পরস্পর প্রতিস্পর্দ্ধী, কিন্তু অবশেষে উপমেয়েরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ উপমা হয় উপমেয়-প্রধান। রূপকালঙ্কারে সে

স্থলে বিষয়ী (উপমান) প্রধান হইয়া উঠে : উপমেয়ের উপরে উপমানকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাহাতে উপমেয় উপমানের রূপেই রূপায়িত হইয়া উঠে অর্থাৎ উপমেয় উপমানের সহিত তাদাত্ম্য (একরূপতা) প্রাপ্ত হয়। উপমেয়ের উপরে উপমান-রূপ রূপিতের এই যে আরোপ, ইহাই রূপকালঙ্কারের সৌন্দর্য্য। এখানে উপমেয় যেন উপমানের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়; তাই কেহ কেহ বলেন, 'রূপকং স্যাৎ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ'—উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদকল্পনাই রূপক। রূপকে উপমানেরই প্রাধান্য, সাধারণ ধর্ম্মও উপমানের অনুগামী। যেমন,

এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা। —রামপ্রসাদ

—এখানে 'মানব' উপমেয়, 'জমিন' উপমান। মানবকে আবাদ করা যায় না, তাহাতে সোনা ফলানোও সম্ভব নয়, তাই জমিনের সহিত অভেদ কল্পনা করিয়া কবি মানবকেই জমিন করিয়া তুলিলেন; সাধারণ ধর্ম্ম 'পতিত', 'আবাদ করা' প্রভৃতিও 'জমিন' উপমানের অনুগামী হইয়াছে। উপমেয়ের উপর উপমান আরোপিত হওয়ায় সমগ্র বাক্যটি উপমানের রূপেই রূপবান্ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই রূপকের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, রূপকালঙ্কারে যদিও উপমেয় ও উপমান অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, যদিও উপমান নিজের রূপে উপমেয়কে রূপায়িত করে, তথাপি এই অভেদ অবাস্তর, কাল্পনিক। উপমান প্রাধান্য লাভ করিলেও, ইহা উপমেয়কে অপহ্নব করিতে পারে না; কেবল ইহাকে নিজের রূপে ও রঙে অনুরঞ্জিত করে মাত্র। রূপকে অভেদ আরোপিত বলিয়াই ইহা অভেদ-সর্ব্বস্ব অলঙ্কার নয়। ['অতিশয়োক্তি' অভেদ-সর্ব্বস্ব অলঙ্কার; আমরা পরে ইহার আলোচনা করিব]।

রূপকালঙ্কারে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ নানাভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে: (১) কখনও কখনও উপমেয় ও উপমান সমাসবদ্ধ হইয়া **সমস্ত পদ** রূপে অবস্থান করে, যেমন রোষ-বহ্নি, আঁখি-পাখী, শোক-সাগর, চিত্ত-চকোর;

[ক] **ভকত-ভ্রমরগণ** ভোর। —গোবিন্দদাস
[খ] **করুণা-কুঠারে** কেন **ক্রোধ-কাষ্ঠ** ফাড় না। —ঈশ্বর গুপ্ত
[গ] কেন নিভাইবে এ **রোষাগ্নি** অশ্রুনীরে। —মধুসূদন
[ঘ] **ক্ষত্রিয় মহিমা-সূর্য্য** উঠে আর নামে। —রবীন্দ্রনাথ

এইরূপ রূপকে উপমেয় ও উপমান সমস্তপদবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে **সমস্ত রূপক** বলা হয়।

(২) কখনও কখনও উপমেয় ও উপমান সমাসবদ্ধ না হইয়া ব্যাসবাক্যে (ব্যস্তভাবে) অবস্থান করে এবং 'রূপ'—এই অভেদ-বাচক শব্দদ্বারা উভয়ের অভেদত্ব সূচিত হয়, যেমন, মুখরূপ চন্দ্র, শোকরূপ অনল, মনরূপ মাঝি;

[ক] **প্রজ্ঞা-রূপ সূর্য্যের** উদয়ে **চিত্ত-রূপ কমল** প্রস্ফুটিত হয়।

[খ] নুণ মেখে লেবু রস রসে পূর্ণ করি।
চিণ্ময়ী **চৈতন্যরূপা চিনি** তায় ভরি। —ঈশ্বর গুপ্ত

[গ] **কৌতূহল রূপ দীপ্ত হুতাশন** ক্রমে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

এই ধরণের রূপককে বলা হয় **'ব্যস্তরূপক'**। ব্যাসবাক্যে থাকে বলিয়াই এইরূপ নাম।

(৩) উপমেয় কখনও উপমানের পাশে থাকে, কখনও বা ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদরূপে উপমানের সহিত অভেদ সম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন, **'তুমি চাঁদ, আমি চকোর'**, **'তুমি মাথার মণি** যে মোর' কিংবা,—

[ক] সেই **চাহনি নীল কমল,** ভরল আমার মানস-জল—নজরুল

[খ] মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,...
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে। —মধুসূদন

[গ] শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥ —বিদ্যাপতি

[ঘ] হাম চাতক ধনি তুহুঁ নব মেহ।
দীনবন্ধু ভণ ঘনরস দেহ॥

ইংরাজির Metaphor নামক Figure of Speech-এর সহিত রূপকের মিল আছে। ব্যাপকভাবে, Metaphor—সমাসোক্তি ও অতিশয়োক্তি। Metaphor শব্দটির অর্থ Transfer:

The word **metaphor** means **transfer**, because in the figure the predicate of one subject is transferred to the other. (Bain)

এই transfer সমাসোক্তির 'ব্যবহার-আরোপ'। সমাসোক্তিতে অপ্রস্তুতের ধর্ম্ম প্রস্তুতের উপর আরোপিত হয়। Metaphor figure-এও তেমনই একের ধর্ম্ম অপরের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। আবার 'A **ray** of hope', 'a **shade** of doubt', 'a **flash** of wit'—এগুলিও Metaphor-এর উদাহরণ। বাঙলায় 'আশার আলো', 'সন্দেহের ছায়া', 'বুদ্ধির দীপ্তি'—এগুলিকে রূপকই

বলিতে হইবে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে Metaphor—সমাসোক্তি ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কারেরই দ্যোতক। ইংরাজিতে Metaphor-কে বলা হয়, 'condensed simile'; রূপক কিংবা অতিশয়োক্তি উভয়ই ঘনীভূত উপমা। উপমাই ক্রমশঃ সংহত হইয়া রূপক, তৎপরে আরও সংহত হইয়া অতিশয়োক্তি হয়, যেমন, তাহার নয়নে ক্রোধ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল (উপমা)—তাঁহার নয়নে ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল (রূপক)—তাঁহার নয়নে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল (অতিশয়োক্তি)। ইংরাজিতে শেষোক্ত দুইটি অলঙ্কারকেই Metaphor বলা হয়।

ইংরাজির Allegory-কেও রূপক বলা যাইতে পারে—এই প্রকারের রূপকে নিহিতার্থ ব্যঞ্জক একটি আখ্যান বর্ণনা করা হয়, যেমন অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক বা কীর্ত্তিবিষয়ক', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটক। অনেক সময় একটি গোটা কবিতাও রূপকাকারে বর্ণিত হয়—শাক্ত পদাবলীর বহু সঙ্গীত, প্রাচীন বাঙলার চর্য্যাগীতিকা, বাউল গান, রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখী', 'পরশ পাথর' প্রভৃতি কবিতা এই ধরণের রূপক।

রূপকের প্রকারভেদঃ-সাহিত্যদর্পণে রূপকের আট প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ছাড়াও অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপকের কথা বলা হইয়াছে। বাঙলায় সাধারণভাবে [এক] **নিরঙ্গ রূপক,** [দুই] **সাঙ্গরূপক** [তিন] **পরম্পরিত রূপক** ও [চার] **অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপকের** নাম করা যাইতে পারে। নিরঙ্গরূপক আবার দুই ভাগে বিভক্ত—**কেবল** ও **মালারূপক।**

[এক] নিরঙ্গ রূপক

একটি বিষয়ে (উপমেয়ে) একটি বিষয়ীর (উপমানের) আরোপ হইলে **নিরঙ্গ রূপক** অলঙ্কার হয়। ইহাকে **কেবল নিরঙ্গ রূপক** বলাই সঙ্গত। 'কেবল' এইজন্য যে ইহাতে একটি মাত্র বিষয় ও একটি বিষয়ী থাকে। 'নিরঙ্গ' শব্দটির অর্থ 'অবয়বহীন': একটি মানবদেহের অঙ্গ—হস্ত, পদ, আনন ইত্যাদি। নিরঙ্গ রূপকে কেবল অঙ্গীই বর্ত্তমান থাকে—তাহার অঙ্গগুলির উল্লেখ থাকে না এবং ইহাতে অঙ্গী উপমেয়ে অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপিত হয়। যেমন,—

[ক] ফুটিল সে **শ্যাম-শেল** বাহির নহিল। —চণ্ডীদাস

[খ] খেয়েছ **বিষয়-মদ** সে মদের কি ঘোর ঘুচে না! —রামপ্রসাদ

[গ] **পদ্মিনী প্রবন্ধ সুধা** পথিক সুজন।
শ্রুতি পথে **পান করি** পরিতৃপ্ত মন॥ —রঙ্গলাল

[ঘ] এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের **হৃদয়-বীণা** বাজিয়া উঠিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

[ঙ] **ব্রহ্মা** আমার **অলক্তের জল**
কেশব আমার **চোখের কাজল**
কালান্তক তাম্বুল আমি চর্ব্বণ করি বারংবার। —গোবিন্দ চৌধুরী

[চ] আমরা **সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার** তলে নাহি চরি,
আমরা **দুখের বক্রমুখের চক্র** দেখে ভয় না করি। —রবীন্দ্রনাথ

[ছ] অভাগীর **জীবন-নাট্যের** শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। —শরৎচন্দ্র

মালারূপক

যে রূপকালঙ্কারে একটিমাত্র বিষয়ে (উপমেয়ে) একাধিক বিষয়ীর (উপমানের) আরোপ হয়, তাহাকে **মালারূপক** বলে। মালারূপকে উপমেয়ের একটিমাত্র গুণের দিক হইতে তৎ-সদৃশ গুণযুক্ত বিভিন্ন উপমানের আরোপ হইয়া থাকে এবং আরোপটি কাল্পনিক হয়। যেমন,

[ক] হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥ —বিদ্যাপতি

—এখানে রাধিকা তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণকে হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের কাজল ও মুখের তাম্বুলের সহিত অভিন্ন মনে করিতেছেন। এক উপমেয় কৃষ্ণে একাধিক উপমানের আরোপ হইয়াছে এবং **কৃষ্ণ যে রাধা-অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ**, বিভিন্ন উপমানের আরোপে, উপমেয় ও উপমানের এই অভেদ-সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই মালারূপকের বৈশিষ্ট্য।

[খ] সাহিত্যদর্পণে মালারূপকের যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মুক্তানুবাদ করিলে, এইরূপ হয়,—

ধাতার বিচিত্র সৃষ্টি, জ্যোৎস্না যিনি লোকলোচনের,
নীলোৎপল নেত্রা নারী, কেলিকুঞ্জ ইনি মদনের।

[গ] নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার। —বিহারীলাল

[ঘ] এই যে ললাট—প্রশস্ত চন্দন চর্চ্চিত, চিন্তা রেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন। — বঙ্কিমচন্দ্র

—এখানে অলঙ্কার মালারূপক। অনুতপ্ত শৈবলিনীর নিকট আজ চন্দ্রশেখরের ললাট সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন স্বরূপ। উপমানের মালা যে উপমেয় ললাট হইতে অভিন্ন 'এ যে'—শব্দ দুইটি দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। অভেদারোপই রূপকের প্রধান লক্ষণ।

[এই প্রসঙ্গে **উল্লেখ** নামক অলঙ্কারের কথা স্মরণীয়। **উল্লেখ** অলঙ্কার অনেকটা **মালারূপকের** মত। উল্লেখে একই বস্তু গ্রহীতৃভেদে বা বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়। উল্লেখ ও মালারূপকের পার্থক্য এই যে-- মালারূপকে একই উপমেয়ে বিভিন্ন উপমানের আরোপ হয়, উল্লেখ অলঙ্কারে সেখানে, বহু গুণ থাকার জন্য একই বস্তু (উপমেয়), বিভিন্ন লোক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কিংবা একই লোকদ্বারা ভিন্ন দৃষ্টিতে গৃহীত হয়। রূপকের 'আরোপ' অবাস্তব, উল্লেখের 'উল্লেখ' বাস্তব। তবে উল্লেখ অলঙ্কারও রূপকাশ্রিত হইতে পারে; একবস্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে গৃহীত হইলেই **উল্লেখ** হয়: উল্লেখের সংজ্ঞা সাহিত্য-দর্পণে এইরূপে নিরূপিত হইয়াছে—

ক্বচিৎ ভেদাদ্ গ্রহীতৃণাং বিষয়াণাং তথা ক্বচিৎ
একস্যানেকধোল্লেখো যঃ স উল্লেখ ইষ্যতে॥

গ্রহীতার রুচিভেদে বা বস্তুর গুণভেদে— একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখই উল্লেখের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বাস্তবতাও ইহার অন্যতম লক্ষণ। যথা —

[ক] শাক্তে বলে তুমি **শক্তি**, **শিব** তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে **সূর্য্য** তুমি, বৈরাগী কয় **রাধিকাজি**।
গাণপত্য বলে **গণেশ**, যক্ষ বলে তুমি **ধনেশ** মা,
শিল্পী বলে **বিশ্বকর্ম্মা**, **বদর** বলে নায়ের মাঝি॥

-- রামদুলাল নন্দী

—এখানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহীতার রুচিভেদে, একই 'শক্তি' ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

[খ] ভোগবিলাসী **লক্ষপতি**, **পথের ফকির**, **জাতির গতি**,
মরণজয়ী **বীর বাঙ্গালী**, বক্ষে হোমের আগুন থালি। —যতীন্দ্রপ্রসাদ

— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিভিন্ন গুণ কবিকর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লিখিত **হইয়াছে**।]

[দুই] সাঙ্গরূপক (স+অঙ্গ=সাঙ্গ)

যে রূপকালঙ্কারে উপমেয়ের বিভিন্ন অঙ্গের উপরে তৎসদৃশ উপমানের বিভিন্ন অঙ্গ আরোপিত হয়, অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের অভেদ প্রদর্শনের সহিত উপমেয়-অঙ্গ ও উপমান-অঙ্গগুলিরও অভেদ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে **সাঙ্গরূপক** বলে।

সাঙ্গ (স+অঙ্গ)—মানে অঙ্গসমেত। একটি উপমেয়ের বিভিন্ন অঙ্গ থাকিতে পারে, তেমনই উপমানেরও বিভিন্ন অঙ্গ থাকিতে পারে। সাঙ্গরূপকে অঙ্গীর সঙ্গে এই অঙ্গগুলিও রূপিত হয়। যেমন, 'নয়ন-চাঁদের দৃষ্টি-ছটা ভুলায় আমার মন'—এখানে উপমেয় অঙ্গী 'নয়ন', তাহার অঙ্গ 'দৃষ্টি' আর উপমান অঙ্গী 'চাঁদ', তাহার অঙ্গ 'ছটা' ইহাদের মধ্যে অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে অতএব ইহা সাঙ্গরূপক। আচার্য্য বিশ্বনাথ সাঙ্গরূপকের এইরূপ সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করিয়াছেন: 'অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।'

উদাহরণ, --

[ক] কৃষ্ণ জিতি পদ্মচাঁদ পাতিয়াছে মুখ-ফাঁদ
তাহে অধর-মধু, স্মিত-চার।
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার॥ —চৈতন্য চরিতামৃত

—'কৃষ্ণ' উপমেয়, তাঁহার অঙ্গ মুখ, অধর, স্মিত (মৃদু হাসি)—ইহাদের উপরে উপমান ব্যাধ-এর আচার-অঙ্গ 'ফাঁদ', 'মধু', এবং 'চার' এর অভেদ কল্পিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণ ব্যাধ অধর রূপ মধু, স্মিত রূপ চার ফেলিয়া মুখরূপ ফাঁদ পাতিয়াছেন।' অলঙ্কার সাঙ্গরূপক।

[খ] ষড়্‌রিপু জ্যেষ্ঠ যে কাননগুই হয়েছে সে
হস্তবুদে জব্দ করি ফিরিছে সদাই।
ক্রোধ হল পট্টয়ারি লোভ-মোহ মোহরী
খাজাঞ্চী হয়েছে মদ-মাৎসর্য্য এই দুটি ভাই॥

—কুমার নবচন্দ্র

—এখানে ষড়্‌রিপুর অঙ্গ কাম (ষড়্‌রিপুর জ্যেষ্ঠ), ক্রোধ, লোভ-মোহ, মদ্-মাৎসর্য্য—ইহাদের সহিত অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে যথাক্রমে—কাননগুই, পট্টয়ারি, মোহরী, খাজাঞ্চী ইত্যাদির। বলা বাহুল্য-- পট্টয়ারি, মোহরী, খাজাঞ্চী প্রভৃতিও কাননগুই-এর অধীন অঙ্গবিশেষ। অতএব অলঙ্কার সাঙ্গরূপক।

[গ] আনন-অটবী শোভা···

প্রফুল্ল নয়ন-কুঞ্জে পলক-পল্লব,
চঞ্চল পুতলী যেন নয়ন বল্লভ ॥
গণ্ড-যোগে বিকসিত হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ ॥
হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে।
দশন হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে ॥ —ঈশ্বর গুপ্ত

—আনন অটবীর রূপে রূপিত হইয়াছেঃ আননের অঙ্গ নয়ন, পলক, (নয়ন) তারা, গণ্ড, হাসি, অধর ও দশন-- এইগুলি যথাক্রমে অটবীর অঙ্গ — কুঞ্জ, পল্লব, কুসুম, কোকনদ, হিল্লোল, পুষ্কর (সরোবরবিশেষ), হংস প্রভৃতির রূপে অভেদ কল্পিত হইয়াছে। অলঙ্কার সাঙ্গরূপক।

[ঘ] শোকের ঝড় বহিল সভাতে;
শোভিল চৌদিকে সুর সুন্দরীর রূপে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব। --মধুসূদন

[ঙ] ঋষি পত্নীগণ···

করিলেন শিশুদের ক্ষুধা নিবারণ।
সেই দয়া, সেই প্রীতি, স্নেহ পারাবার
কাননে দ্বিতীয় বর্ষা হইল সঞ্চার!
চিকুর-প্রভা মেঘ; বিজলী সে হাসি;
সুশীতল বারিধারা স্নেহ সুধারাশি। —নবীনচন্দ্র (রৈবতক)

[তিন] পরম্পরিত-রূপক

পরম্পরিত রূপক কার্য্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত। যদি একটি বস্তুতে রূপের আরোপ হওয়ার ফলে, তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য বস্তুতেও রূপের আরোপ ঘটে, তবে **পরম্পরিত**-রূপক হয়। যেমন,

[ক] বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম উদ্‌ঘাটিত হইল। —রবীন্দ্রনাথ

—'বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ'—একটি রূপক; ইহাতে 'সূর্য্যোদয়' আরোপিত হওয়ায় 'হৃৎপদ্ম' উদ্ঘাটিত' হওয়ার রূপক কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব ইহা পরম্পরিত-রূপক।

[খ] এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানী॥ —চৈতন্য-চরিতামৃত

—শ্রীচৈতন্য উপমেয়ে মালাকার-ধর্ম্ম আরোপিত হওয়ায় ফলোদ্যান-কর্ম্ম, ভক্তি-কল্পতরু রোপণ ও ইচ্ছাপানী সিঞ্চনের রূপকগুলির অবতারণা হইয়াছে। অলঙ্কার পরম্পরিত-রূপক।

[গ] চন্দ্রাননে কি শোভা কমল-নয়ন।
ভুরু-ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান॥ --নিধুবাবু

—নয়ন কমল হওয়ায়, ভুরু ভৃঙ্গ হইয়াছে। উপমান কমল ও ভৃঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক না থাকায় এখানে অলঙ্কার পরম্পরিত-রূপক।

[ঘ] সংসার-সাগর দুঃখ-তরঙ্গের খেলা
আশা তায় একমাত্র ভেলা —গিরিশচন্দ্র

[ঙ] মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত, শোক শার্দ্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম। —দীনবন্ধু মিত্র (নীলদর্পণ)

[চার] অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য-রূপক

অনেক সময় দেখা যায়, যে উপমানের সহিত উপমেয় রূপিত হয়, সেই সেই উপমানে অধিক কোন বিশেষ গুণ কল্পিত হইয়া থাকে। অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য বলিতে বুঝায়—অতি অসম্ভব ধর্ম্মযুক্ত বৈচিত্র্য। যে রূপকের উপমান অধিকারূঢ় অর্থাৎ অবাস্তব ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, তাহাকে **অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য-রূপক** বলা হইয়া থাকে। যেমন,

[ক] এই মুখ সাক্ষাৎ কলঙ্ক-রহিত চন্দ্র।

—এখানে 'চন্দ্র' উপমানে 'কলঙ্ক-রহিত' এই অসম্ভব ধর্ম্মের কল্পনায় অলঙ্কার হইয়াছে অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য-রূপক।

[খ] **থির বিজুরি** নবীনা গোরী
পেখনু ঘাটের কূলে। —চণ্ডীদাস

[গ] পরি আমি **স্থির তড়িতের** তারায় গাঁথা হীরার ফুল।—গোবিন্দ চৌধুরী

উৎপ্রেক্ষা

অত্যন্ত সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে যদি উপমান বলিয়া প্রবল সংশয় হয়, তাহা হইলে **উৎপ্রেক্ষা** অলঙ্কার হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন, 'ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।'—প্রকৃতকে (উপমেয়কে) অপ্রকৃত (উপমান) বলিয়া 'সম্ভাবনা'ই উৎপ্রেক্ষার প্রাণবস্তু। 'সম্ভাবনা' শব্দটি ইঙ্গিতগর্ভ, ইহার অর্থ উৎকট এককোটিক সংশয় ('উৎকটৈককোটিকঃ সংশয়ঃ')। যেমন, 'মুখ যেন চাঁদ'—এখানে উপমেয় **মুখ** উপমান **চাঁদ** বলিয়া সংশয়িত হইয়াছে। তেমনই 'হাসিটি যেন জ্যোৎস্না', 'পদযুগ যেন পদ্মযুগল'।

কিন্তু এইখানেই উৎপ্রেক্ষার শেষ নয়ঃ 'উৎপ্রেক্ষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, উৎ=উৎকটা, প্র=প্রকৃষ্টস্য (উপমানস্য), ঈক্ষা=ধারণা। উপমান সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য্য কবিকল্পিত সংশয়ই উৎপ্রেক্ষাঃ ইহা একপ্রকারের poetic fancy। কেহ কেহ বলেন, উৎপ্রেক্ষা=ঊর্দ্ধদৃষ্টি; অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলে মানুষ ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়। কথাটি মিথ্যা নয়। উৎপ্রেক্ষায় কবি-কল্পনার অদ্ভুত চমৎকারিত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে করি চণ্ডীদেবীর আবির্ভাবে কালকেতুর অবস্থার কথাঃ কুটীরে চণ্ডীদেবীর রূপ ঝলমল করিতেছে, দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, 'তিমির ফেটেছে যেন তপন তরাসে'। এই অত্যাশ্চর্য্য কবি-কল্পনাই উৎপ্রেক্ষা। কবি-কল্পনায় উপমানই প্রধান হইয়া উঠে, বিশেষভাবে উপমানের দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ঃ তাই কেহ কেহ বলেন, 'অধ্যবসায়ে ব্যাপার-প্রাধান্যে উৎপ্রেক্ষা' (অলঙ্কার সর্ব্বস্ব)। আচার্য্য দণ্ডী উৎপ্রেক্ষার আরও ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ তিনি বলেন,

অন্যথৈব স্থিতা বৃত্তিশ্চেতনস্যেতরস্য বা।
অন্যথোৎপ্রেক্ষতে যত্র তামুৎপ্রেক্ষাং বিদুঃ ...॥[১]

—চেতন বা অচেতন পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিকে অন্যপ্রকার 'সম্ভাবনা' করিলেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষার যে দৃষ্টান্তটি তিনি দিয়াছেন, তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম, মুক্তানুবাদ করিলে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়ঃ

মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-তপ্ত এক করিবর
গাহন করিতে ওই নামে সরোবর,
মনে হয়, সূর্য্য বৈর নির্য্যাতন তরে
নাশিতে সূর্য্যের প্রিয় কমলনিকরে।

১ কাব্যাদর্শ, ২য় পরিচ্ছেদ।

—হস্তী সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া সরোবরে অবগাহন করিতে নামিয়াছে, কবি মনে করিতেছেন, বুঝি সূর্য্যপ্রিয়া পদ্মকে উন্মূলন করিবার নিমিত্তই হস্তী সরোবরে নামিয়াছে। কবি হস্তীর 'অবগাহন'কে অন্যরূপ কল্পনা করিতেছেন। ইহা চেতন বৃত্ত্যুৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

বস্তুতঃ অতিশয় সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে উপমানরূপে প্রবল সংশয়দ্বারাই উৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে। ইহাতে উপমানপক্ষে যে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহাকে 'যেন', 'জনু', 'মনে হয', 'বুঝি' ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দদ্বারা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, উপমাতেও সাদৃশ্য-বোধক পদরূপে 'যেন', 'জনু' প্রয়োগ করা হয়ঃ সেক্ষেত্রে কোন্‌টি উপমা, কোন্‌টি উৎপ্রেক্ষা, তাহা চিনিবার উপায় কি ?—উপমায উপমানাংশের কল্পনা লোকতঃ সিদ্ধ, কিন্তু উৎপ্রেক্ষায উপমানাংশ লোকতঃ অসিদ্ধ অর্থাৎ কবি-কল্পিত : যেমন,

'বীরবর যুঝে **যেন** কুরুরণে ভীম' (উপমা)

'লোচন **জনু** থির ভৃঙ্গ আকার' (উপমা)

'তুমি **যেন** ওই আকাশ উদার
আমি **যেন** এই অকূল পাথার'— (উৎপ্রেক্ষা)

উৎপ্রেক্ষা দুইপ্রকার—[এক] বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা (বাচ্যোৎপ্রেক্ষা), [দুই] প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)।

[এক] বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষা-বাচক 'যেন', 'জনু', 'বুঝি', 'মনে হয়' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে উপমেয়কে উপমান বলিয়া প্রবল সংশয় হইলে **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** হয়। যেমন,

[ক] বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥ —বিদ্যাপতি

—স্নানান্তে রাধিকা বেশ করিয়া মুখ মুছিলেনঃ কৃষ্ণের মনে হইল, যেন একখানি সোনার আয়না মাজিয়া ধরিল। কৃষ্ণের চোখে রূপের নেশা সৃষ্টি হইয়াছে; উপমেয় 'বদন'কে তিনি একখানি স্বর্ণমুকুর বলিয়া সংশয় করিতেছেনঃ সংশয়টি প্রকাশিত হইয়াছে 'জনু'—এই উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দ দ্বারা। অতএব অলঙ্কার বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

[খ] দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
যেন নব আষাঢ়ের মেঘের গর্জ্জন॥ —কবিকঙ্কণ

[গ] নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়
স্থষ্টির স্থজনে যেন নব সূর্য্যোদয়। —হেমচন্দ্র

[ঘ] ফেনিল সলিল রাশি বেগভরে পড়ে আসি
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে। —বিহারীলাল

[ঙ] ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবশে কপোলে বিন্যস্ত হইয়াছে, যেন কুসুমরাশির উপর কে কুসুমরাশি ঢালিয়া দিয়াছে···সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল, যেন জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। —বঙ্কিমচন্দ্র

[চ] রঘুপতি যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে·· মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে,—অন্ধকার যেন বহুকষ্টে নিদ্রারাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। —রবীন্দ্রনাথ

—বনে রাত্রি ঘনাইয়াছে, মাঝে মাঝে আগুন জ্বলিতেছে, রঘুপতির মনে হইতেছে,—'অন্ধকার যেন বহুকষ্টে নিদ্রারাঙা চক্ষু মেলিয়াছে' : উৎপ্রেক্ষাটি চমৎকার।

[ছ] একদিন মেয়েটি বলিল, 'হাঁ বাবা, মাস্তুল ধ'রে যখন ছইএর উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, দেখি কিনা, জলটা যেন গোল হয়ে গিয়াছে, আর তাহার ওদিকের জল যেন নামিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন একটা খুরা-দেওয়া বাটি উবুর করিয়া রাখিয়াছে।'

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বেণের মেয়ে)

[দুই] প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দ অনুপস্থিত থাকে, 'সম্ভাবনা'র ভাব অনুমান করিয়া লইতে হয়, তাহাকে **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা** (প্রতীয়মানা + উৎপ্রেক্ষা) বলে। যেমন,

(ক) অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণী-হীন হিমধামা॥ —বিদ্যাপতি

—'রামা' (রাধিকা) উপমেয় : 'হরিণী-হীন হিমধামা' (নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র) উপমান। কৃষ্ণ রাধিকাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার মনে হইতেছে, একটি নিষ্কলঙ্ক চাঁদ যেন কনকলতা অবলম্বন করিয়া উদিত হইয়াছে। উপমেয়কে অধঃকরণ করিয়া উপমানটিই এখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে। উৎপ্রেক্ষাবাচক কোন শব্দ উপস্থিত না থাকায় 'সম্ভাবনা' প্রতীযমানা। অতএব ইহা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(খ) কি পেখনু নটবর গৌরকিশোর।

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু

সুরধনী তীরে উজোর॥ — গোবিন্দদাস

– উপমেয় 'গৌরকিশোর', উপমান—'অভিনব হেম কল্পতরু'; কবির মনে হইতেছে 'ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করিয়া যেন একটি সোনার কল্পবৃক্ষ সঞ্চরণ করিতেছে।' 'কল্পতরু সঞ্চরু'—প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা, কারণ, কল্পবৃক্ষ তো চলিতে পারে না, 'যেন সঞ্চরু'—ইহাই সম্ভাবনা।

[গ] তাঁহার অতি নিবিড় কুঞ্চিত কেশদাম **চক্র ধরিয়া** তাঁহার চম্পকরাজি নির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে। -বঙ্কিমচন্দ্র

—কুঞ্চিত কেশদাম 'চক্র ধরিযা' স্কন্ধোপরে পড়িয়াছেঃ কেশের পক্ষে 'চক্র'ধরা সম্ভব নয়, লেখক কল্পনা করিতেছেন, কেশ **যেন** চক্র ধরিয়া স্কন্ধোপবে পডিযাছে। সম্ভাবনাসূচক শব্দ অনুপস্থিত থাকায এখানে উৎপ্রেক্ষা প্রতীযমানা।

[ঘ] একখানি গ্রাম শোভে জলময মাঠে,

গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা গগন-ললাটে। — গোবিন্দচন্দ্র দাস

[ঙ] 'কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির কবিলেন—বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল' রবীন্দ্রনাথ

[তিন] মালা উৎপ্রেক্ষা

উপমার যেমন মালা হয়, তেমনই উৎপ্রেক্ষার মালা বচিত হইতে পারে। একই উপমেযে যখন বহু উপমানের সম্ভাবনা হয়, তখন হয **মালা উৎপ্রেক্ষা**। বাচ্যা বা প্রতীয়মানা উভয়প্রকার উৎপ্রেক্ষারই মালা হইতে পারে। যেমন,

বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার মালা

[ক] 'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিযা মূরতি

মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।

অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥ —কাশীরাম দাস

—বিরাট রাজসভায দ্বিজবেশী অর্জ্জুন; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন (১) জলদে আবৃত সূর্য্য, (২) ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার মালা।

[খ] (শান্তি) সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, গোলাপজলের মুখ কার্ব্বাআঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপধুনা গুগ্‌গুল্ ফেলিয়া দিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

—এখানে মালা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা: চারিটি উৎপ্রেক্ষাদ্বারা উৎপ্রেক্ষার মালা রচিত হইয়াছে।

প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষার মালা

[ক] (শৈবলিনী) কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্রবসনে কবরীসমেত মস্তকের অগ্রভাগ মাত্র আনত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল; মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

—জলমধ্যে কবরীসমেত প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর শৈবলিনীকে দেখিয়া মনে হইল (১) যেন মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল, (২) যেন ভীমার শ্যামতরঙ্গে এইমাত্র স্বর্ণকমল ফুটিল। প্রতীয়মানা মালা উৎপ্রেক্ষা।

সন্দেহ

উপমেয় এবং উপমান উভয়পক্ষেই যদি যুগপৎ সংশয় বর্ত্তমান থাকে এবং সে সংশয় যদি কবি-কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে **সন্দেহ** অলঙ্কার হয় ('সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ'—সাহিত্যদর্পণ)।

সন্দেহ অলঙ্কারে সংশয় উভয়কোটিক, অর্থাৎ এখানে উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষেই সন্দেহ বর্ত্তমান থাকে, তাই বলা হয় 'উপমানোপমেয়সংশয়ঃ সন্দেহঃ'; উৎপ্রেক্ষায় সংশয় থাকে কেবল উপমান বিষয়ে। যেমন, 'মুখ যেন চাঁদ' (উৎপ্রেক্ষা), কিন্তু 'একি মুখ, না চাঁদ' (সন্দেহ)।

সংশয়টি যদি সাধারণ হয়, তাহা হইলে অলঙ্কার হয় না, বাস্তব হইলেও তাহাকে অলঙ্কার বলা চলে না। যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে—

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কে! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? —শরৎচন্দ্র

—এখানে অলঙ্কার হয় নাই। কারণ, সংশয়টি বাস্তব এবং ইহা কবি-কল্পনায় চমৎকারও নয়। উভয়কোটিক সংশয় কবির 'প্রতিভোত্থিত' হইলে তাহা অলঙ্কারে পরিণত হয়। যেমন,

[ক] কে এই নীলবরণী ?
নীল অপরাজিতা একি! কিংবা কাদম্বিনী ?

—শ্যামা মায়ের কালো বরণ দেখিয়া কবির মনে সংশয় জাগিয়াছে—এ নীলবরণী কে? ইনি কি নীল অপরাজিতা কুসুম? অথবা ইনি নীল কাদম্বিনী? সংশয় উভয়কোটিক। এখানে **সন্দেহ** অলঙ্কারের মালা হইয়াছে।

[খ] শ্যামর তনু কি এ তিমির বিরাজ।
সিন্দূর চিহ্ন কি এ আরকত সাঁঝ॥
তরল তার কি এ টুটল হার।
নখপদ কি এ নব শশিক সঞ্চার॥ —গোবিন্দ দাস

—রাত্রিপ্রভাতে খণ্ডিতা রাধিকার কুঞ্জে কৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন: তাঁহার অঙ্গে সিন্দূরের দাগ, ছিন্ন হার, নখাঘাত চিহ্ন। রাধিকার সন্দেহ জাগিয়াছে, একি কৃষ্ণ, না প্রভাতে 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব!—একি শ্যামের দেহ, না সন্ধ্যার অন্ধকার? উহা কি সিন্দূরবিন্দু, না সন্ধ্যার আরক্তিমা? একি ছিন্ন হার না সন্ধ্যার তারা? একি নখচিহ্ন, না নব চন্দ্রের আবির্ভাব?—আলোচ্য অংশে অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্নধারী কৃষ্ণে ও সন্ধ্যায় চমৎকার 'সন্দেহ' সৃষ্টি হইয়াছে।

[গ] সমরে কে রে কাল কামিনী ?
সুধাংশুসুধা কি শ্রমজবিন্দু,
শ্রীমুখ না কি এ শারদ ইন্দু ? —রামপ্রসাদ

—এখানে দুইটি সন্দেহ অলঙ্কার রহিয়াছে। মায়ের রণরঙ্গিনী মূর্তি, মুখে শ্রমজনিত স্বেদ; কবির মনে সংশয় জাগিয়াছে, ইহা কি 'শ্রমজবিন্দু', না সুধাংশুসুধা? (২) শ্যামামায়ের বদনখানিতেও সংশয়—'একি শ্রীমুখ, না শারদ-ইন্দু'?

[ঘ] কুঞ্জের দ্বারে কে ওই দাঁড়ায়ে? ওকি বারিধর কি গিরিধর?
ওকি নবীন মেঘের উদয় হল, না কি মদনমোহন ঘরে এল?

—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

অপহ্নুতি

উপমেয়কে (প্রকৃতকে) নিষেধ বা অস্বীকার করিয়া যদি উপমানের (অপ্রকৃতের) স্থাপন হয়, তাহা হইলে **অপহ্নুতি** অলঙ্কার হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণে বলা হইয়াছে, 'প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্য-স্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ'।

'অপহ্নুতি' শব্দটির অর্থ—গোপন বা অস্বীকার: এই অলঙ্কারে উপমেয় অস্বীকৃত হয় এবং তাহার স্থলে উপমানের স্থাপনা হয়। রূপকালঙ্কারে যেমন উপমেয় ও উপমানের অভেদ-প্রতীতি হয়, অপহ্নুতিতে তাহা হয় না। এখানে উপমেয় ও উপমান ভিন্ন এবং ভিন্ন অবস্থাতেই উপমেয়কে অপহ্নব করিয়া উপমানের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। দণ্ড্যাচার্য্য বলেন, 'অপহ্নুতিরপহ্নুত্য কিঞ্চিদন্যার্থদর্শনম্'—যেখানে বর্ণনীয় বিষয়ের গুণক্রিয়াদিরূপ ধর্ম্মের অসত্য প্রতিপাদনপূর্ব্বক অপ্রস্তুত বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদিত হয়, সেইখানে হয় অপহ্নুতি অলঙ্কার। যেমন, কবি মুখই দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাকে অপহ্নব করিয়া বলা হইল, 'এতো মুখ নয়, এ যে চাঁদ'। ইহাই অপহ্নুতি অলঙ্কার।

অপহ্নুতি অলঙ্কারে 'না', 'নয়', 'ছল', 'ব্যাজ' প্রভৃতি অপহ্নব-বাচক শব্দদ্বারা উপমেয়কে গোপন করা হয়। যেমন,

[ক] নীলাকাশ নহে, দেখিতেছ যাহা সাগরের নীলজল,
ও নহে তারকা, জলধির বুকে ফেনারাশি উজ্জ্বল।

এই দৃষ্টান্তটি সাহিত্যদর্পণোক্ত **অপহ্নুতির** উদাহরণের প্রথমাংশের মুক্তানুবাদ। এখানে উপমেয় 'আকাশ', 'তারকা'—উপমান 'সাগর', 'জল', 'ফেনা'।

[খ] গৈরিক হেরি বৈরি করি মানসি উরপর যাবক ভাগে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি সিন্দূর করি অনুমানে॥
-গোবিন্দদাস কবিরাজ

—কৃষ্ণ অঙ্গে ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া রাধিকার কুঞ্জে আসিলে, রাধিকা অনুযোগ করিয়াছিলেন, তোমার বক্ষে 'যাবক' (আলতা), অঙ্গে 'সিন্দূর' দেখিতেছি কেন?—কৃষ্ণ ইহাদিগকে অপহ্নব করিয়া উত্তর দিতেছেন, গৈরিক দেখিয়া তুমি আলতা মনে করিতেছ, আবির (ফাগু) দেখিয়া তুমি সিন্দূর অনুমান করিতেছ। কৃষ্ণের বক্তব্য এই যে, ইহা আলতা নয়, গৈরিক—সিন্দূর নয় আবির। অলঙ্কার অপহ্নুতি।

[গ] ভাবুক স্বভাবে ভাবে কোরে অনুরাগ।
বলে, ও যে রাঙ্গা নয়, নয়নের রাগ॥ —ঈশ্বর গুপ্ত

-আনারসের গায়ে রক্তাভ চোখের মত গোল দাগ থাকে, এখানে সেই 'রাঙা' রঙকে (প্রকৃতকে) অপহ্নব করিয়া অপ্রকৃত 'নয়নরাগ'-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

[ঘ] কে বলে শিশিরজল? প্রেমঅশ্রু অবিরল। বিহারীলাল
—কবি 'শিশিরজল'ই দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাকে অপহ্নব করিয়া বলিতেছেন, ইহা 'প্রেমাশ্রু'।

[ঙ] বৃষ্টিছলে কাঁদিলা গগন মধুসূদন।

[চ] দিগঙ্গনা কুতূহলে সমীর হিল্লোলছলে
বরষে মন্দার ধারা আবরি গগন। —বিহারীলাল

[ছ] দেবতা আশিস ছলে বরষে শিশিব। - অক্ষয় বড়াল

[জ] ধূম নয, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন মল্লিকা। —মোহিতলাল

[ঝ] তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দব হযে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এসেছে।
—অবনীন্দ্রনাথ

নিশ্চয়

উপমানকে নিষিদ্ধ করিযা উপমেয়ের স্থাপনা হইলে **নিশ্চয়** অলঙ্কার হয; 'অন্যন্নিষিধ্য প্রকৃত-স্থাপনং নিশ্চযঃ' (সাহিত্যদর্পণ)। নিশ্চয অলঙ্কার অপহ্নুতির ঠিক বিপরীত। অপহ্নুতিতে উপমেযের অপহ্নব, উপমানের প্রতিষ্ঠা—আর নিশ্চয় অলঙ্কারে উপমানকে নিষেধ করিযা উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা। যেমন,

মুখ নয়, চাঁদ; হাসি নয, জ্যোৎস্না (অপহ্নুতি)
চাঁদ নয, মুখ, জ্যোৎস্না নয, হাসি (নিশ্চয়)

উপমেয-উপমান ভাব না থাকিলে 'নিশ্চয' অলঙ্কার হয় না: 'এতো মালা নয, এযে তোমার তরবারি'—ইহা 'নিশ্চয' অলঙ্কার হয় নাই, কারণ 'মালা' ও 'তরবারি'তে সাদৃশ্য নাই। তেমনই,—'যে বুদ্ধিকে আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ করে এসেছি—সে বর নয়, অভিশাপ; সে সজীব মূর্ত্তি নয়, কঙ্কাল' (দ্বিজেন্দ্রলাল)—এখানেও 'নিশ্চয়' অলঙ্কার নাই। সাদৃশ্যহেতু

অপহ্নুতিতে যে উপমেয়কে উপমান বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল, তাহা নিরসন করিয়া পুনরায় উপমেয়ের নিশ্চয় প্রতীতিই **নিশ্চয়** অলঙ্কার। যথা,—

[ক] কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর হুঁ বর নারী॥
নহি জটা, ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে, নহে গঙ্গ॥
মোতিমবদ্ধ মৌলি, নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে, মণিহার॥ —বিদ্যাপতি

—কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতী রাধিকা আজ মদন-পীড়নে অস্থির: তাই মদনের প্রতি এই উক্তি—মদন ভুল করিয়াছে, শঙ্কর-জ্ঞানে রাধাকে আক্রমণ করিয়াছে। মদনের দৃঢ় প্রতীতির জন্য রাধিকা 'নিশ্চয়' প্রয়োগ করিতেছেন, আমি শঙ্কর নহি, আমি বরাঙ্গনা (রাধা), মদন যাহাকে জটা, গঙ্গা, চন্দ্র, নয়ন, কণ্ঠগরল ও ফণী বলিয়া মনে করিতেছে তাহা যথাক্রমে রাধার, বেণী, মালতীমালা, মতি, সিন্দূর, মৃগমদ ও মণিহার। উপমানগুলিকে নিষেধ করিয়া উপমেয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় ইহা 'নিশ্চয়' অলঙ্কার হইয়াছে।

[খ] কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ, স্বর্ণবর্ণ আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশদিশ। —মধুসূদন

[গ] অসীম নীরদ নয়, ওই গিরি হিমালয় —বিহারীলাল

[ঘ] ছৈয়ের ভিতর থেকে শরীর লুকায়ে রেখে
চুপি দিয়ে চেয়ে আছে সরলা সুন্দরী!
গগনের পূর্ণশশী ভূতলে পড়েনি খসি
ফোটেনি কুমুদ নীল জল পরিহরি। —গোবিন্দচন্দ্র দাস

—উপমান দুইটি, (১) পূর্ণশশী, (২) কুমুদ: ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া উপমেয় 'সুন্দরী বালা'র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। উপমেয়টিই সত্য—অতএব অলঙ্কার 'নিশ্চয়'।

[ঙ] ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতর ঢুকিয়া গল্প শুনিতাম **সাতশ' রাক্ষসী** মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া-গুড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এ-ও যেন তেমনি · তবে রাক্ষসী **সাতশ' নয়, শতকোটি** : উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। **রাক্ষসী নয়,—সাইক্লোন**। —শরৎচন্দ্র

—কথশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন'—এর বর্ণনা : 'সাতশ'কে নিষেধ করিয়া 'শতকোটি' (অসংখ্য) এবং 'রাক্ষসী'কে নিষেধ করিয়া প্রকৃত 'সাইক্লোন'কে প্রতিষ্ঠা করায় এই অংশে চমৎকার **নিশ্চয়** অলঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান

সাদৃশ্যহেতু কোন বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া যদি ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রান্তি যদি কবি-কল্পনা দ্বারা চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে **ভ্রান্তিমান** অলঙ্কার হয়। সাহিত্যদর্পণে বলা হইয়াছে, 'সাম্যাদতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিমান্ প্রতিভোত্থিতা।' 'অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধি' মানে, অতথাভূতবস্তুতে তথাভূত বস্তুর ভ্রম, যেমন সাদৃশ্য হেতু 'আঁখিতে পদ্মভ্রম' : এই যে ভ্রম, ইহা বাস্তবিক ভ্রম হইলে চমৎকারিত্ব থাকে না, তাই বলা হইয়াছে 'প্রতিভোত্থিতা'—কবি-প্রতিভায় উত্থিত অর্থাৎ কবির 'অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞার স্পর্শে চমৎকার। এই জন্যই 'শুক্তিতে রজতভ্রম' কিংবা 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'—ভ্রান্তিমান অলঙ্কার নয় কারণ ইহা সাধারণ ভ্রম। কেহ কেহ কাশীরাম দাসবর্ণিত মহাভারতের সভাপর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিম্নলিখিত বিচিত্র ভ্রমকে ভ্রান্তিমান বলিয়াছেন,

নির্ম্মল নির্বাত হ্রদ তাহে অনুপম।
জল দেখি কুরুরাজে হৈল কাঁচ ভ্রম॥
সম্ভ্রমে সঞ্চারি পদ দিল তদুপর।
অমনি পড়িল গিয়া সরসি ভিতর॥

—কিন্তু ইহা অলঙ্কার হয় নাই : দুর্য্যোধনের ভ্রান্তি বিচিত্র হইলেও, বাস্তবিক : তেমনই উন্মত্তজনের ভ্রান্তি বা স্বপ্নের ভ্রান্তি কিংবা নেশামত্ত-জনের ভ্রান্তিও ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের পর্য্যায়ে পড়ে না। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনীর

ভ্রান্তি, কিংবা আফিংখোর কমলাকান্তের ভ্রান্তি কিংবা উন্মাদ গোবিন্দলালের —'সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন'—ইত্যাদি ভ্রমও ভ্রান্তিমান অলঙ্কার নয়। অলঙ্কার তখনই হইবে, যখন অতিশয় সাদৃশ্য-বশতঃ বর্ণনীয় বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হইবে এবং তাহাদ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইবে। যেমন,

[ক] দেখিতে বদন মোহিত মদন নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া ছুটিছে মরালকুল॥
আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা ছুটিতেছে নিরবধি॥ —চণ্ডীদাস

—মরাল রাধিকার 'আঁখি'কে মানস সরোবর ভাবিয়া সেইদিকে ছুটিতেছে, আর ভ্রমর সেই আঁখিকে নীলপদ্ম ভাবিয়া লুব্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে। চোখের সঙ্গে 'মানস সরোবর' অথবা 'নীলপদ্মে'র সাদৃশ্য এখানে ভ্রান্তির কারণ, অথচ চোখ সত্যই মানস-সরোবর কিংবা নীলপদ্ম নয়। এই যে চমৎকার ভ্রান্তি—ইহাই ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

[খ] নিদ্রায় আকুল রামা হন অচেতন।
চরণ-পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ॥ —কবিকঙ্কণ

[গ] কুসুমিত কাননে শেজ বিছায়ি।
নিজ তনুছা হেরি নিরখতি রাই॥
নাগর ভরমে আদর বহু করই। —চন্দ্রশেখর

—কুসুমিত কাননে শয্যা পাতিয়া রাধিকা নিজের তনুছা (তনুছায়াখানি) শয্যার উপরে দেখিয়া এক দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ছায়াতে নাগর-ভ্রান্তি জন্মিল, কারণ কৃষ্ণ কালো, ছায়াও কালো। ভ্রান্তিবশে তিনি ছায়াকেই আদর করিতে লাগিলেন। কবি-কল্পনায় রাধার এই ভ্রান্তি চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার ভ্রান্তিমান।

[ঘ] পদকর্ত্তা শশিশেখরের 'আজু অদ্ভুত তিমির রঙ্গ' পদখানিতেও চমৎকার ভ্রান্তিমান অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে : তিমিরঘন রজনীতে নীলবসনে মুখ ঢাকিয়া রাধিকা অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন, কখন অসাবধানতাবশে মুখের বসন খসিয়া পড়িয়াছে : রাধার মুখখানিকে চাঁদ ভাবিয়া চকোরের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে—

মুখমণ্ডল শশী উজোর
হেরি ধায়ল তঁহি চকোর
উড়িয়া পড়ে হই বিভোর
চাহে পীযূষ দানরে। —শশিশেখর

[ঙ] কেরে নব নীল কমল-কলিকাবলি,
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি
নখচন্দ্রে চকোরগণ করিছে অধরার্পণ
পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমব চকোরে লাগিল বিবাদ
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ
দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ
চিচিকি গুন্‌গুন্ কবিযে ধ্বনি। —বামপ্রসাদ

—মাযেব পদতল আজ ভ্রমব আব চকোবেব ভ্রান্তি সৃষ্টি করিযাছে। ভ্রমর বলে, এ নীলকমল, চকোব বলে, এ চাঁদ। ভ্রান্তিবশেই তাহাদের দ্বন্দ্ব। অলঙ্কার ভ্রান্তিমান।

[চ] শোভিল আকাশে
দেবযান, সচকিতে জগত জাগিলা
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত
পূবিল নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে! মধুসূদন

প্রতিবস্তূপমা (প্রতিবস্ত + উপমা)

আমরা পূর্ব্বে বস্তু-প্রতিবস্তুভাবেব উপমার বিষয আলোচনা করিযাছি। তাহাতে দেখানো হইযাছে যে উপমেয ও উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম যদি দুইটি সমার্থক শব্দে প্রকাশিত হয, তাহা হইলে তাহারা হয় বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। যেমন,

দীপ্তিহেতু শোভে যথা মধ্যাহ্ন ভাস্কর
পৃষ্ঠে তূণ বিরাজিছে তথা বীরবর।

— এথানে উপমাটি দুই বাক্যের হইলেও 'যথা তথা' দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় এক বাক্যেই পবিণত হইয়াছে। উপমেয 'বীরবর', উপমান 'ভাস্কর':

ইহাদের সাধারণ ধর্ম্ম যথাক্রমে 'বিরাজিছে' ও 'শোভে': সাধারণ ধর্ম্ম দুইটি—দুইটি পৃথক শব্দে প্রকাশিত হইলেও, সমার্থক: অতএব ইহারা বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। উপমাটিও বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা।

বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমাই **'প্রতিবস্তূপমায়'** পরিণত হয়, যখন সাদৃশ্য-বোধক পদটি লুপ্ত থাকে। সাদৃশ্য-বোধক পদ লুপ্ত হওয়ায় উপমেয় ও উপমান পৃথক দুইটি বাক্যে অবস্থান করে এবং বাক্যদ্বয়ের সাদৃশ্যটি হয় প্রতীয়মান। বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম দুইটিই বাক্যার্থের সাদৃশ্য সূচনা করে। ইহাই প্রতিবস্তূপমা: 'প্রতিবস্তু—প্রত্যর্থম্, উপমা যস্যাং তথাভূতা সা প্রতিবস্তূপমা' (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সাহিত্য দর্পণের টীকা)। এইভাবে উপরের উদাহরণটি প্রতিবস্তূপমায় হয়,

দীপ্তিহেতু শোভে ওই মধ্যাহ্ন-ভাস্কর
পৃষ্ঠে তূণ বিরাজিছে আহা! বীরবর।

সাহিত্যদর্পণে প্রতিবস্তূপমা'র নির্ব্বচনটি এইরূপ:—

প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্য সাম্যয়োঃ।
একোঽপি ধর্ম্মঃ সামান্যো যত্র নির্দ্দিশ্যতে পৃথক্॥

—দুইটি বাক্যের সাদৃশ্য প্রতীয়মান উপমেয়-উপমান ভাবের হইলে (বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন হইলে) এবং তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ অথবা এক হইয়াও ভিন্নরূপে নির্দ্দেশিত হইলে **প্রতিবস্তূপমা** হয়।

প্রতিবস্তূপমার প্রধান লক্ষণ (১) ইহাতে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে অবস্থান করে, (২) সাদৃশ্য-বোধক পদটি উহ্য থাকে, (৩) সাধারণ ধর্ম্ম **দুইটি** হয়: কখনও শব্দ দুইটি একরূপ, কখনও বা এক পর্য্যায়ের সমার্থক দুইটি ভিন্ন শব্দ এবং (৪) উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য দুই বাক্যের অর্থগত সাদৃশ্য হইতে প্রতীয়মান হয়। যেমন,—

[ক] অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে তত্ত্বজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥ —কৃষ্ণদাস কবিরাজ

এখানে দুইটি প্রতিবস্তূপমার সমাবেশ হইয়াছে: (১) অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে·· অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে তত্ত্বজ্ঞান (২) রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে · কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান। প্রথম উপমায় 'জ্ঞানী' উপমেয়, 'কাক' উপমান সাধারণ ধর্ম্ম

'আস্বাদয়ে' ও 'চুষে'—একার্থবোধক অর্থাৎ বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় উপমায় 'ভাগ্যবান' উপমেয়, 'কোকিল' উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম 'পান করে' ও 'খায়' সমার্থক অর্থাৎ বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। উভয় স্থলেই সাদৃশ্য-বোধক পদ উহ্য। অতএব অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা।

[খ] চারিদিকে **সখীদল** যত
বিরসবদন, মরি সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে **ফুলকুল বিরস বদনা**
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী। —মধুসূদন

[গ] জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে, নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। —বঙ্কিমচন্দ্র

প্রতিবস্তূপমাতেও এক উপমেয় বাক্যের সহিত একাধিক উপমান-বাক্যের অর্থগত সাদৃশ্য সূচিত হইতে পরে: সে স্থলে প্রতিবস্তূপমাটি হয় **মালা প্রতিবস্তূপমা**। যেমন,

[ঘ] জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃ পাতি? —মধুসূদন

[ঙ] সেইদিন ফুলবনে **কহিল** সঙ্গিনীগণে
আপনার **মন-অভিলাষ**।...
নিরখিয়ে নীরধর চাতকীর মনোহর
গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস?
ফুল্ল ফুল দৃষ্টি করি কতক্ষণ মধুকরী
গুঞ্জরণে থাকে বা বিরত?
নিজদলে চারুস্বরে মধুময় গান করে
প্রকাশ করয়ে মনোগত। —রঙ্গলাল

—কর্ম্মদেবী (উহ্য) নায়ক 'সাধু'কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সঙ্গিনীদের নিকট তাহার মনের কথা প্রকাশ করিলেন—'কহিল মন-অভিলাষ' (সাধারণ ধর্ম্ম): (১) মেঘ দেখিয়া চাতকী কি উল্লাস গুপ্ত রাখে?—রাখে না; (২) ফুল্লফুল দেখিয়া মধুকরী গুঞ্জন করিতে বিরত থাকে

না, তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ করে—'প্রকাশ করয়ে মনোগত'।

সাদৃশ্য বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের : অলঙ্কার মালা প্রতিবস্তূপমা।

[চ] বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ গেল মিশাইয়া
সেই প্রকৃতির সনে : মিশিল তুষার
অনন্ত সলিলে ; গীত, যন্ত্রের সুতানে
হইল মধুর লয়। —নবীনচন্দ্র সেন

দৃষ্টান্ত

আচার্য্য দণ্ডী 'দৃষ্টান্ত' নামে কোন পৃথক্ অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। প্রতিবস্তূপমাকে তিনি 'বাক্যার্থোপমা'র অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া ইহার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রতিপাদ্য কোন বস্তুকে গ্রহণ করিয়া তাহার সমান ধর্ম্মের অনুরূপ অন্য অপ্রস্তুত বিষয়ের উপস্থাপন হইয়া বাক্যার্থের মধ্যে সাম্যপ্রতীতি হইলে প্রতিবস্তূপমা হয়।

দণ্ড্যাচার্য্য উল্লিখিত 'সাম্যপ্রতীতি' কথাটি ইঙ্গিতগর্ভ : ইহাতে সাদৃশ্য-বোধক পদ থাকে না, সাদৃশ্যটি ব্যঞ্জনায় অনুমান করিয়া লইতে হয়। বাক্যার্থ-গত এই সাদৃশ্য প্রস্তুতের সমান ধর্ম্মের অনুরূপ উপমান বাক্যের সমানধর্ম্ম হইতে প্রতীত হয়। এই সমানধর্ম্ম একার্থক শব্দে বা ভিন্নার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারে।

পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ সেখানে এই ধরণের উপমার দুইটি ভেদ স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'বাক্যয়োরেকসামান্যে প্রতিবস্তূপমা মতা' —যেখানে উপমেয় ও উপমানের এক সমান ধর্ম্ম পৃথক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়, তাহা প্রতিবস্তূপমা। কিন্তু যেখানে সমানধর্ম্ম এক নয়, শব্দ ও অর্থ দুইই পৃথক, সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান—তাহা **দৃষ্টান্ত** অলঙ্কার। সমান-ধর্ম্মের এইরূপ ভাবকে তাঁহারা বলিলেন **বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব** : 'ভিন্নে বিম্বানুবিম্বত্বম্'—দুই বাক্যগত সাধারণ ধর্ম্ম ভিন্ন হইলে তাহাদের সাদৃশ্য হয় বিম্বের প্রতিবিম্ব ভাবের ('বিম্বস্য প্রতিবিম্বনং প্রণিধানগম্যসাম্যত্বম্') : উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্মকে যদি বলা যায় বিম্ব, তবে উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম

তাহার প্রতিবিম্ব ঃ এ যেন ছাযার ছায়া। তাহা হইতেই জন্মে প্রণিধানগম্য সাদৃশ্যবোধ ঃ যেমন,

আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায না।

আমরা শাঁকের করাত, যেতেও কাটি আসতেও কাটি। —টেকচাঁদ

– বাবুরামের বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের মন্তব্য ঃ ব্রাহ্মণের 'প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না' —ইহাই প্রস্তাবিত বিষয় ঃ 'প্রাপ্তি' উপমেয, তাহার ধর্ম্ম 'কেহ ছাড়ায় না' ; দ্বিতীয় বাক্যটি উপমান-বাক্য—'শাঁকের করাত' উপমান, 'যেতে কাটা আসতে কাটা' তাহার ধর্ম্ম। উপমেয বাক্যের সাধারণ ধর্ম্ম ও উপমান বাক্যের সাধারণধর্ম্ম এক নয় ঃ তাহাদের সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য। শাঁখের করাত আসিতে যাইতে কাটে ; জন্ম উপলক্ষ্যেই হউক অথবা মৃত্যু উপলক্ষ্যেই হউক সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের 'প্রাপ্তি' হইযা থাকে। এইখানেই ধর্ম্ম দুইটির সাদৃশ্য। ইহাই '**বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব**'।

এইবার আমরা দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছি। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন, 'দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্'—সমানধর্ম্মবৎ বিষয়ের প্রতিবিম্বন অর্থাৎ প্রণিধানগম্য সাম্যই **দৃষ্টান্ত**। দুইটি বাক্যের গুণক্রিয়াদি ধর্ম্ম এক না হইযাও যদি ভাবসাদৃশ্য সূচনা করে এবং তাহাতে যদি সাদৃশ্য-বোধক পদ উহ্য থাকে তাহা হইলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয। এখানে উপমেয় ও উপমান এবং তাহাদের সামান্য ধর্ম্মের সাদৃশ্য বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুমান-গম্য। যথা,—

[ক] বুঝি না, তবুও কবির কাব্য সুধা বরিষয কর্ণে,
পাই না গন্ধ তথাপি মালতী দৃষ্টি যে হরে বর্ণে।

—কবির কাব্যের অর্থবোধ না হইলেও, তাহা কর্ণে সুধা বর্ষণ করে – ইহা প্রস্তাবিত বাক্য ; ইহার সাধারণ ধর্ম্ম 'সুধা বরিষয কর্ণে ঃ পরবর্ত্তী বাক্যের অর্থ মালতীর গন্ধ না পাওয়া গেলেও তাহার বর্ণ '**দৃষ্টি যে হরে বর্ণে**' (সাধারণ ধর্ম্ম)। দ্বিতীয় বাক্যের সাধারণ ধর্ম্ম প্রস্তাবিত বাক্যের সাধারণ ধর্ম্মের প্রতিবিম্বন মাত্র, তাহাদের সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য। অলঙ্কার **দৃষ্টান্ত**।

[খ] পুঁথি পাঠ করে শিশু নাহি তায মন
কেমনে পাইবে সেই জ্ঞানরূপ ধন ?
প্রদীপে না তেল দিয়া বাতি যদি জ্বালো
কোথায় প্রতিভা তার, কোথা তার আলো ? —ঈশ্বর গুপ্ত

—মনঃ সংযোগ না করিয়া যদি শিশু পুঁথি পাঠ করে, তবে সে জ্ঞানরূপ ধন পায় না ; প্রদীপে তেল-সংযোগ না করিয়া প্রদীপ জ্বালাইলে, তাহাতেই প্রতিভা (প্রভা) হয় না। উপমাটি বাক্যার্থগত এবং বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন : অলঙ্কার **দৃষ্টান্ত**।

[গ] হায় নাথ গহন কাননে
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি? —মধুসূদন

—প্রমোদ-কানন ত্যাগ করিয়া লঙ্কায় গমনোদ্যত মেঘনাদ-মাতঙ্গের প্রতি প্রমীলা-ব্রততীর উক্তি। এখানে প্রস্তাবিত বাক্যটি পরে রহিয়াছে : প্রথম দীর্ঘ বাক্যটি উপমান বাক্য। বাক্যদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য।

[ঘ] যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি? —বঙ্কিমচন্দ্র (দেবী চৌধুরাণী)

[ঙ] রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে ; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা —রবীন্দ্রনাথ

নিদর্শনা

সম্ভব বা অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ যেখানে দুইটি বস্তুর মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের প্রতীয়মান সাদৃশ্য সূচনা করে, সেখানে **নিদর্শনা** অলঙ্কার হয়।[১]

নিদর্শনা অলঙ্কারের ফলশ্রুতি সাদৃশ্য-বোধ : প্রণিধানগম্য বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত করাই নিদর্শনার কাজ। এই সাদৃশ্য-বোধ আসে সম্ভব বা অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ হইতে। 'বস্তু-সম্বন্ধ' মানে উপমেয় ও উপমানের

১ সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাঽপি কুত্রচিৎ।
যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা॥ —সাহিত্যদর্পণ

সম্পর্ক। এই সম্পর্ক অনুমানে বাস্তবিক হইলে হয়--সম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ এবং অবাস্তবিক হইলে হয়—অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ।

সম্ভব বস্তু-সম্বন্ধের নিদর্শনার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বেশি দেখা যায় না। প্রাচীনকাল হইতে একটিমাত্র উদাহরণই কিছুটা অদলবদল করিয়া আলঙ্কারিকগণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আমরাও অনুরূপ একটি উদাহরণ দিতেছি,--

'চিরস্থায়ী কিছু নয়'—মানুষে বলিয়া
সূর্য্যদেব অস্তাচলে পড়েন ঢলিয়া।

—অচেতন সূর্য্যের পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব, কিন্তু তাহার 'অস্তগমন' কার্য্যটি দ্বারা 'কিছুই চিরস্থায়ী নয়'—ইহার দ্যোতনা সম্ভব। ইহা দ্বারা—সূর্য্য যেমন অচিরস্থায়ী মানুষও তেমনই নশ্বর— এই সাদৃশ্যবোধ প্রতীত হয়। ইহাই সম্ভব বস্তু-সম্বন্ধের নিদর্শনা।

অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধের নিদর্শনার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়। এই সম্বন্ধ নানাভাবে নির্দ্দেশিত হয়। 'বস্তু-সম্বন্ধ' অর্থে উপমেয় ও উপমানের সম্পর্কই বুঝায়ঃ সাদৃশ্যহেতু উপমেয় উপমানের অসম্ভব বা অবাস্তবিক ধর্ম্ম কল্পিত হইলেই অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ হইতে পারে। নিদর্শনা যেন অনেকটা Transference of attributes। আচার্য্য দণ্ডীও এই অর্থেই 'নিদর্শনা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[২] তবে দণ্ড্যাচার্য্যের সংজ্ঞায় প্রস্তুতার্থপ্রবৃত্তির তৎসদৃশ অপ্রস্তুতার্থান্তর জ্ঞাপনই নিদর্শনা, নবীন আলঙ্কারিকগণ সেখানে বলেন 'অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধোঽপি যত্র সাদৃশ্যং নিদর্শযতি সাপি নিদর্শনা'। বাঙলা সাহিত্যে এই ধরণের 'নিদর্শনা'রই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,—

[ক] শকুন্তলার অধরে নব পল্লবশোভার আবির্ভাব। —বিদ্যাসাগর

--অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব হইতে পারে নাঃ ইহা অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ। কিন্তু নবপল্লব ঈষৎ রক্তাভ। এই প্রতীয়মান সাধারণধর্ম্মটি অধর ও নবপল্লবের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের সাদৃশ্য সূচনা করিল। অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জনায় এই সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইল যে, শকুন্তলার অধর নবপল্লবের ন্যায় রক্তাভ—এইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। অতএব অলঙ্কার নিদর্শনা।

২ অর্থান্তরপ্রবৃত্তেন কিঞ্চিৎ তৎসদৃশংফলম্।
সদসদ্বা নিদর্শ্যেত যদি তৎস্যান্নিদর্শনম্॥ —কাব্যাদর্শ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, 'হরণ বা চৌর্য্যক্রিয়ার দ্বারা অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধের নিদর্শনা সৃষ্টি এদেশের সুপ্রাচীন প্রথা।'—এই ধরণের নিদর্শনার দৃষ্টান্ত :

[খ] 'চাঁপা কোথা হতে এনেছে হরিয়া অরুণ কিরণ কোমল করিয়া।'

—চাঁপার বর্ণ কোমল অরুণ-কিরণের মত ইহাই কল্পনা।

[গ] উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম। —মধুসূদন

—প্রমীলার কান্তি চুরি করিয়া কুঞ্জবনে কুসুম ফুটিতেছে: নিদর্শনার ভাবটি এই যে, প্রমীলার কান্তির মতই ফুলের কান্তি। উপমার বিষয় এখানে বিপরীত হইয়া গিয়াছে, অপ্রকৃত বিষয় প্রকৃত হইয়া উঠিয়াছে। সম্বন্ধ অবশ্য অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ।

[ঘ] সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখীর গান লুটিয়া লইত। —রবীন্দ্রনাথ

--'সম্বোধন'টি পাখার গানের মতই মধুর -ইহাই পরিকল্পিত উপমা।

নিদর্শনায় সাদৃশ্যটি বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের হয় বলিয়া, ইহাকে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু নিদর্শনা দৃষ্টান্ত নয়। দৃষ্টান্তে উপমেয় ও উপমান **দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে** অবস্থান করে, নিদর্শনায় দুইটি বস্তুর উপমেয়-উপমান ভাব **একবাক্যে** প্রকট হয়। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে বাক্য শেষ হইলে প্রতীয়মান সাদৃশ্যের প্রতীতি হয়। নিদর্শনায় সাদৃশ্য দেখাইয়া বাক্য শেষ হয়, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের উপমান বাক্যকে একটি বাক্যে আত্মসাৎ করিয়া নিদর্শনা সার্থক হয়। যেমন,

(১) ভোগলিপ্সায় কে করে জীবন ক্ষয়!
কাঁচের মূল্যে কোন্‌জন করে কাঞ্চন বিক্রয়? (দৃষ্টান্ত)

(২। ভোগলিপ্সায় জীবন করিয়া ক্ষয়
কাঁচমূল্যে করিয়াছ কাঞ্চন বিক্রয়। (নিদর্শনা)

দৃষ্টান্তাশ্রয়ী নিদর্শনার উদাহরণ:

[ঙ] প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন,
চাঁদ ধরিতে চাহে সেই হৈয়া বামন। —কৃষ্ণদাস কবিরাজ

[চ] মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ। —গিরিশচন্দ্র

[ছ] যিনি এই স্বভাবরমণীয় তনুখানিকে দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত করিতে চান, তিনি নিশ্চয় নীলোৎপল-পত্রের প্রান্তভাগ দ্বারা শমীলতাকে ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন।

—এই অংশটুকু কালিদাসের বিখ্যাত 'ইদংকিলাব্যাজমনোহরংবপুঃ'—শ্লোকটির মুক্ত গদ্যানুবাদ। অলঙ্কার নিদর্শনা।

[জ] চল্‌তি পাল্পী চার পয়সায় ভাড়া কবা আমার কর্ম্ম নয়—একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা ? —টেকচাঁদ

সমাসোক্তি

প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হইলে **সমাসোক্তি অলঙ্কার** হয়।[১]

যে বিষয়টি প্রধানভাবে বর্ণনীয় তাহাই 'প্রস্তুত'। সমাসোক্তি অলঙ্কারে এই বর্ণনীয় বিষয়ে উপমান বস্তুর গুণক্রিযাদি 'ব্যবহার' আরোপিত হয়। রূপক অলঙ্কারেও 'আরোপ' হয ; সেখানে উপমান নিজের রূপে উপমেয়কে রূপিত করে। সমাসোক্তিতে মুখ্যভাবে বর্ণনীয় বিষযে, যাহা বর্ণনীয় নয তাহার 'ব্যবহার' (অবস্থাভেদ) আরোপিত হয় : 'ব্যবহারসমারোপো ন তু স্বরূপ-সমারোপঃ'—ইহাই সমাসোক্তির লক্ষণ।

সাধারণতঃ দেখা যায, সমাসোক্তিতে প্রস্তুত বিষয়টি হয় কোন অচেতন পদার্থ। এই অচেতন পদার্থে (বর্ণনীয বিষযে) চেতন পদার্থের গুণ-ক্রিয়াদি ব্যবহার আরোপিত হয—ফলে অচেতন পদার্থটি দ্বারা চেতন বিষয় ব্যঞ্জিত হয়। এই দিক হইতে ইংরাজির Personification ও Pathetic fallacy ('Attribution of human emotion to inanimate objects')-এর সহিত সমাসোক্তির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহা সমাসোক্তির একটি দিক মাত্র।

সমাসোক্তি অলঙ্কারে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বিষয় সংক্ষেপে (=সমাসে) উক্ত হয় বলিয়া অলঙ্কারটির নাম সমাসোক্তি ('সকৃদুচ্চারণরূপ সংক্ষেপেণাবস্থাদ্বয় প্রতীতিঃ সমাসোক্তিঃ')। উদাহরণ,

১ সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারঃ সমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ ॥—সাহিত্যদর্পণ

[ক] নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে।
আমার যে প্রাণধন স'পেছি তোমারে॥
পলক না যদি দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি।
দুখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে॥ —নিধুবাবু

—এখানে অচেতন 'নলিনী'তে চেতন নায়িকার 'ব্যবহার' আরোপিত হইয়াছে: ভ্রমরকে প্রেমিক মনে করিয়া নলিনী যে সকল উক্তি করিতেছে তাহা সর্ব্বৈব একটি প্রেমিকা নায়িকার উক্তি। অলঙ্কার সমাসোক্তি।

[খ] নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায়! রতন মুকুট
আর রাজ আভরণ; হে রাজসুন্দরি,
তোমার! —মধুসূদন

—বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদ সেনাপতি-পদে বৃত হইলে রক্ষোপুরীর উদ্দেশ্যে বন্দীদের বন্দনা; এখানে রক্ষোপুরীতে শোকসন্তপ্তা রমণীর ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

[গ] দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী
সুনীল বসনে ঢাকি ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেমবাণী —অক্ষয়কুমার বড়াল

—দূরে সুমেরুর শিখরে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইতেছে; তাহাতে আরোপিত হইয়াছে অভিসারিকা 'নববধূর ব্যবহার'। রস-ব্যঞ্জনায় সমাসোক্তিটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যতিরেক

উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রদর্শিত হইলে **ব্যতিরেক অলঙ্কার** হয়।[১] আচার্য্য দণ্ডী বলেন, উপমেয় ও উপমানের বৈধর্ম্ম্য প্রতিপাদনই ('ভেদ কথন') ব্যতিরেকের লক্ষণ: এই বৈধর্ম্ম্য সাধারণ ধর্ম্মবাচক শব্দের প্রয়োগে প্রদর্শিত হইতে পারে, অথবা সাধারণ ধর্ম্মবাচক

১। 'আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাথবা ব্যতিরেকঃ' —সাহিত্যদর্পণ

শব্দের অনুপস্থিতিতে ব্যঞ্জনায় বোধগম্য হইতে পারে। এই দিক হইতে ব্যতিরেক প্রধানতঃ দুই প্রকার: প্রথম ক্ষেত্রে উপমান হইতে উপমেয়ের বৈলক্ষণ্যের হেতুর উল্লেখ থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হেতুটি অনুল্লিখিত থাকে, উৎকর্ষ বা অপকর্ষের ভাব ব্যঞ্জনায় বুঝিয়া লইতে হয়। যেমন,

[ক] তোমার মুখখানি চাঁদের মতই; ভেদ এই যে, চাঁদ কলঙ্কযুক্ত তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক।

—এখানে উপমান চন্দ্র হইতে উপমেয় 'মুখ'-এর উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে: উৎকর্ষের হেতুও স্পষ্ট উল্লিখিত—চাঁদ কলঙ্কযুক্ত, কিন্তু মুখ নিষ্কলঙ্ক।

[খ] গাম্ভীর্য্যে তুমি সমুদ্রতুল্য: কিন্তু সমুদ্র চঞ্চল, তুমি স্থির।

—এখানে উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ: উপমেয়ের স্থির গাম্ভীর্য্য, কিন্তু উপমানের গাম্ভীর্য্য অতলস্পর্শী হইলেও চঞ্চল—ইহাই উপমেয়ের উৎকর্ষের হেতু।

যেখানে 'হেতু' অনুল্লিখিত থাকে, সেখানে নানাভাবে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ব্যঞ্জিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে যে-কোন রূপবর্ণনায় ব্যতিরেক বাচক 'জিনি', 'নিন্দি', 'গঞ্জি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে ব্যতিরেক অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইত: যেমন,

[গ] 'চরণযুগল জিনিয়া কমল' (চণ্ডীদাস), 'কৃষ্ণ-অঙ্গ···ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন' (কৃষ্ণদাস), 'গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, মোতি পাতি জিনিয়া দশন' (মুকুন্দরাম), 'খঞ্জননাশিনী কুরঙ্গনিন্দনী লোচনিঞা' (ভারতচন্দ্র), 'মুখ···বিনিন্দিত কোটি শশধরে', অথবা,—

(i) বিকচ কমলদল গর্ব্ব খর্ব্ব করি।
হাস্যমুখে সুখে বসি সকল সুন্দরী॥ —রঙ্গলাল

(ii) (রোহিণীর) অধর এখনও বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল
পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত। —বঙ্কিমচন্দ্র

কিন্তু 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার সৃষ্টিতে 'এহো বাহ্য'। একটি হইতে অন্যটির উৎকর্ষ বুঝাইবার জন্য কবিগণ যে কত রকমের নব নব বাচনভঙ্গি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাহিত্যদর্পণকার চল্লিশ প্রকার 'ব্যতিরেক'-এর উল্লেখ করিয়াছেন: আমরা কয়েকটির দিঙ্মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

[ঘ] জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল।
তাহার অধিক রাঙা কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর ॥—প্রচলিত ছড়া

[ঙ] শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে। —মধুসূদন

[চ] যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥ —ভারতচন্দ্র

প্রতীপ

সাধারণতঃ একটি উপমায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—আনন, নয়ন, কেশ, বাহু ইত্যাদি উপমেয়রূপে গৃহীত হয় : এইগুলিই উপমেয়রূপে প্রসিদ্ধ। এবং আকাশের চাঁদ, জলাশয়ের পদ্ম, মৃণাল, বনের হরিণ এইগুলি উপমানরূপে কল্পিত হয় : এইগুলি প্রসিদ্ধ উপমান। উপমায় এই প্রসিদ্ধ উপমেয়গুলিকেই প্রস্তুতবিষয় ধরিয়া তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ উপমানগুলির সহিত তুলনা করা হয়। যেমন, 'তোমার মুখখানি চাঁদের মত'। কিন্তু এই বাক্যটিকে যদি এইরূপ বলা হয়,—'ওই চাঁদ তোমার মুখের মত'—তাহা হইলে প্রসিদ্ধ উপমানটি উপমেয় হইয়া যায় এবং প্রসিদ্ধ উপমেয়টি উপমানের মত অবস্থান করে। প্রসিদ্ধ উপমেয় ও উপমানের এই যে প্রতিলোম (উল্টা) সাদৃশ্য-কথন, ইহাই **প্রতীপ** অলঙ্কার। আলঙ্কারিকেরা বলেন, 'প্রতীপমুপমানস্যোপমেয়ত্ব কল্পনম্' (জয়দেব) ; প্রসিদ্ধ উপমান উপমেয় এবং উপমেয়কে উপমান ধরিয়া সাদৃশ্য কল্পনা করিলে **প্রতীপ** অলঙ্কার হয়, যেমন,—

[ক] তোমার আননসম পূর্ণিমার চাঁদ,
উজ্জ্বল করেছে ওই কেশসম অন্ধকার রাত।

[খ] বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বার মতো। —রবীন্দ্রনাথ

—'পথ' উপমেয় ; 'তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বা' উপমান। প্রসিদ্ধ উপমেয় উপমানরূপে গৃহীত হওয়ায় প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে।

[গ] **নক্ষত্রমণ্ডলী**

সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। —রবীন্দ্রনাথ

এই তো গেল প্রতীপ অলঙ্কারের একটি দিক। প্রতীপের আর একটি দিক আছে, তাহা অনেকটা ব্যতিরেক অলঙ্কারের মত। উপমেয়ের উৎকর্ষ হেতু উপমানের নিষ্ফলত্ব কথিত হইলেও প্রতীপ অলঙ্কার হয়ঃ

'প্রসিদ্ধস্যোপমানস্যোপমেয়ত্ব প্রকল্পনম্।
নিষ্ফলত্বাভিধানং বা প্রতীপমিতি কথ্যতে॥'

—ইহাই প্রতীপের পূর্ণতর সংজ্ঞা। সাধারণতঃ 'নহে', 'তুচ্ছ', 'ছার' ইত্যাদি দ্বারা উপমানের প্রত্যাখ্যান বা নিষ্ফলতা জ্ঞাপিত হয়, যথা,—

[ঘ] আপাদলম্বিতকেশ কস্তুরী সৌরভ।
মহা অন্ধকার মধ্যে দৃষ্টি পরাভব॥
অলি, পিক, ভুজঙ্গ, চামব, জলধর।
শ্যামতাসৌষ্ঠবে তার নহে সমস্বর॥ —আলাওল

—পদ্মিনীর আপাদলম্বিত কেশের শ্যামতা-সৌষ্ঠবের নিকট অলি, পিক, ভুজঙ্গ, চামর, জলধর তুচ্ছ।

[ঙ] কিবা অঙ্গ আভা মরি কি সৌরভ তার।
কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতার॥ —রঙ্গলাল

[চ] মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা। শতদল দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে। —মধুসূদন

—প্রমীলার নয়ন-জলের নিকট পদ্মের উপর ঝরা শিশির বিন্দু তুচ্ছ।

[ছ] গাঁদা ফুলের রঙ দেখেছি আর যে চাঁপার কলি
চাষী মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি?
রামধনুকে না দেখিলে কিই বা ছিল ক্ষোভ,
পাটের বনের বউ-টু-বাণী নাইক দেখার লোভ। —জসীমউদ্দিন

—চাষী মেয়ের রূপ দেখিয়া কবি গাঁদা ফুলের রঙ, চাঁপার কলি, রামধনুক ও বউ-টু-বাণী ফুলের রূপকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন: অলঙ্কার প্রতীপ।

অতিশয়োক্তি

ঔপম্যগর্ভ অলঙ্কারগুলির মধ্যে **অতিশয়োক্তি** অলঙ্কারটিই নানাদিক হইতে অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আচার্য্য দণ্ডী এই অলঙ্কারটিকে বলিয়াছেন, 'অলঙ্কারোত্তমা' ('অতিশয়োক্তিঃ স্যাদলঙ্কারোত্তমা')। কেবল দণ্ড্যাচার্য্য কেন, প্রায় সকল আলঙ্কারিকই অতিশয়োক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন বলেন, অতিশয়োক্তি 'সর্ব্বালঙ্কাররূপ'—কারণ, সকল অলঙ্কারের মধ্যেই অতিশয়োক্তি সন্নিবেশিত হইতে পারে; মহাকবিগণ যখন ঔচিত্য অনুসারে রচনায় অতিশয়োক্তি যোজনা করেন, তখন তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে ('স্ববিষয়ৌচিত্যেন ক্রিয়মাণা সতী কাব্যেনোৎকর্ষমাবহেৎ' —ধ্বন্যালোক, বৃত্তি ৩/৩৭)। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলেন, প্রায় সকল অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তি ধ্বনিত হয় ('অতিশয়োক্তেশ্চ প্রায়শঃ সর্ব্বালঙ্কারেষু ধ্বন্যমানত্বম্'—ধ্বন্যালোক টীকা ২/২৬)।

বস্তুতঃ উপমার চরম অভিব্যক্তি অতিশয়োক্তিতে: উপমা হইতে আরম্ভ করিয়া রূপক-ব্যতিরেকের মধ্য দিয়া, অতিশয়োক্তিতে আসিয়া উপমেয় 'লোক সীমাতিবর্ত্তিনী' চমৎকারিত্ব লাভ করে। এখানে উপমেয়কে লইয়া কবিকল্পনা অত্যাশ্চর্য্য লীলা করিয়া থাকে: কখনও উপমান আসিয়া উপমেয়কে গ্রাস করে, কখনও দূরবর্ত্তী উপমান উপমেয়ের অঙ্গে আসিয়া খেলা করে, কখনও পদানত হইয়া তাহাকে প্রণাম করে (দ্রঃ 'কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা'—ভারতচন্দ্র): উপমেয়ের অস্তে উদয়ে সে এক চমৎকার শোভা। এই অতিশয়োক্তি কি? দণ্ড্যাচার্য্য বলেন,

> বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্ত্তিনী।
> অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদলঙ্কারোত্তমা॥ —কাব্যাদর্শ; ২/২১৪

—প্রস্তুত বিষয়ের (উপমেয়ের) লোকসীমাতিবর্ত্তিনী (অতিশয় লোক চমৎকার) উক্তিই অতিশয়োক্তি। অলঙ্কার মধ্যে ইহা মুখ্য। কাব্য-সাহিত্য এইরূপ অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। লোক সংস্কারে যাহা অসম্ভব—কবিকল্পনায় তাহাই সম্ভব হইয়া উঠে; উপমেয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য কবিগণ অতিশয়োক্তির সৃষ্টি করেন। মনে করি ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণনা: কবি-কল্পনাকে কোথায় না ছুটাইয়াছেন, নায়িকার রূপোৎকর্ষ প্রস্ফুটনের জন্য তিনি আকাশের চাঁদকে নায়িকার পদ-নখে স্থাপন করিয়াছেন;

দেবাসুরের সমুদ্রমথিত সুধায় নায়িকা-মুখের অনির্ব্বচনীয় শোভা দ্যোতিত করিয়াছেন :

দেবাসুর সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥

ইংরাজিতে এই প্রকারের অলঙ্কারকে বলা হয়—Hyperbole। অধ্যাপক Bain বলেন,

> Hyperbole consists in magnifying objects beyond their natural bounds, so as to make them more impressive or more intelligible. 'Swift as the wind', 'Rivers of blood and mountains of slain' are hyperbolical expressions.

কিন্তু ইহা হইতেও Hyperbole-এর চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। হৃদয়ে গভীর আবেগ উত্থিত হইলে, বর্ণনা সীমা ছাড়াইযা যায়। প্রেম, ঘৃণা, ভয উপস্থিঃ হইলে মানুষ অসম্ভব কল্পনা করে: তাই Hyperbole হয় একপ্রকার poetic exaggeration, যেমন,

So frowned the mighty combatants, that hell
Grew darker at their frown. —Milton

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অতিশযোক্তির এই ব্যাপক রূপটি স্বীকার করিলেও, ইহার আর একটি সূক্ষ্মতর রূপ দেখিযাছেন, এবং তাহাই অলঙ্কারশাস্ত্রে অতিশযোক্তির বিশিষ্ট রূপ বলিযা স্বীকৃত হইযাছে। আচার্য্য বিশ্বনাথ অতিশয়োক্তির এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কবিযাছেন,—'সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায-স্যাতিশযোক্তির্নিগদ্যতে।' ইহাই অতিশযোক্তির বিশেষ সংজ্ঞা: বাঙলায় ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয়,—

উপমেয়কে পূর্ণ-গ্রাস করিয়া উপমান উপমেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

উপমায়—উপমেয় ও উপমান উভয়ই উপস্থিত থাকে, কিন্তু উপমেয়টিই তুলনায় প্রধান হয়, রূপকে উপমেয়ে উপমানের আরোপ হয়, উপমানটির ক্রিয়াই প্রধান হইয়া উঠে। উৎপ্রেক্ষায় উপমান যেন উপমেয়কে অর্দ্ধেক গ্রাস করে, উপমেয়কে উপমান বলিযা দৃঢ় সংশয় জন্মে; অতিশয়োক্তিতে উপমেয় একেবারে গ্রস্ত হয়, থাকে কেবল উপমান। নিম্নে উপমেয় উপমানের বিবর্ত্তন-ক্রমটি প্রদর্শিত হইল :

আমার গৃহে **চাঁদের মত একটি মুখ** দেখিতেছি। (উপমা)

মুখ চন্দ্রের আলোতে গৃহ উদ্ভাসিত হইল। (রূপক)

মুখখানি **যেন একটি পূর্ণিমার চাঁদ**। (উৎপ্রেক্ষা)

আমার গৃহে **পূর্ণচন্দ্রের** উদয় হইয়াছে। (অতিশয়োক্তি)

অতিশয়োক্তিতে যে উপমেয়কে লুপ্ত করিয়া উপমেয়রূপে উপমানের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে বলা হয় 'সিদ্ধ অধ্যবসায়'; ইহা রূপকেরই পরিণাম। ইহাতে ভেদে অভেদ প্রতীতি হয়; তাই এই ধরণের অতিশয়োক্তিকে **রূপকাতিশয়োক্তি** বলে। মানুষের কথায়-বার্ত্তায় এই রূপকাতিশয়োক্তির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়,—

[ক] 'ওরে আমার **চাঁদ**'; (কবিকঙ্কণ) 'ঘরে একটা **ব্রহ্মদৈত্য** জন্মেছে'; 'হল মাটিতে **চাঁদের** উদয়' (ব্রতচারী গান) 'দুধ দিয়ে **কালসাপ** পুষেছি'; '**রসিক নাগর** আর কি?' 'মুখে **মধু** বুকে **বিষ**'; 'আমার **অন্ধের নড়ি** কেড়ে নিও না বাবা' (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

[খ] কমল-যুগল পর চান্দ কি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেড়ল বিজুরী-লতা।
কালিন্দীতীর ধরি চলি যাতা॥ —বিদ্যাপতি

—শ্রীমতী রাধা কালিন্দীকূলে এক অপরূপ রূপ দেখিয়াছেন: একজোড়া '**কমল**', তাহার উপর 'চাঁদের মালা', তাহার উপর একটি 'তরুণ তমাল,' তাহাকে বেড়িয়া 'বিদ্যুৎ-লতা'। এগুলি উপমান। উপমেয় কৃষ্ণের চরণ, নূপুর, দেহ ও বনমালাকে গ্রাস করিয়া উপমানগুলি এখানে অভেদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপমেয়গুলিকে ব্যঞ্জিত করিতেছে। অলঙ্কার রূপকাতিশয়োক্তি।

[গ] শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে॥
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে॥ —কমলাকান্ত

দেহ-সাধনের কথা প্রকাশ করাই কবির উদ্দেশ্য: কিন্তু উপমেয় '**দেহ**' এখানে পূর্ণগ্রস্ত, আছে কেবল উপমান 'তরু': 'তরু মুঞ্জরে না', 'পবনবলে দোলে,' '**ফল**' হয় না, তাহাতে '**আগুন**' আছে। এগুলি দ্বারা দেহের বায়ু-অস্থির, ষড়্‌রিপু (আগুন) প্রবল—তাহার ফলে ষট্‌পদ্ম বিকশিত হয় না, মোক্ষফলও পাওয়া যায় না—ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

[ঘ] পলাইবে ছাড়িয়া **চাঁদেরে**
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে **সুধাংশু ধনে।** —মধুসূদন

—এখানে উপমেয় 'লঙ্কা' ও 'বৈরিদল'-কে গ্রাস করিয়া যথাক্রমে উপমান 'চন্দ্র' ও 'রাহু' উপস্থিত।

[ঙ] পিতার **স্বরপুর বৃকোদর** জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন **দুঃশাসন** দেখিব।— দীনবন্ধু মিত্র

—স্বরপুর বৃকোদর=নবীনমাধব, দুঃশাসন=নীলকর সাহেব। উপমান দ্বারাই উপমেয়ের ব্যঞ্জনা হইতেছে।

[চ] প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেতশয্যার উপরে কে **নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি** ঢালিয়া রাখিয়াছে। —বঙ্কিমচন্দ্র

– উপমান 'নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি' ; উপমেয় শৈবলিনী।

[ছ] (গোবিন্দমাণিক্য) **ঘন অন্ধকারের মধ্যে** কেবল চারিদিকে **দন্ত ও নখরের ছটা** দেখিতে পাইলেন। —রবীন্দ্রনাথ

ঘন অন্ধকার=হিংসায় খিন্ন পৃথিবী, দন্ত ও নখরের ছটা=হিংস্রতা।

এইরূপ 'ভেদে অভেদ' রূপকাতিশয়োক্তি ছাড়াও যে অন্যপ্রকার অতিশয়োক্তি আছে ইহাদের মধ্যে **অসম্বন্ধে সম্বন্ধ** অতিশয়োক্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহা অসম্ভব, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার কল্পনা করাই এইরূপ অতিশয়োক্তির মূল কথা। ইহাতে সাদৃশ্য প্রতীতি থাকে না, থাকে 'লোকসীমাতিবর্ত্তিনী' উক্তি-বৈচিত্র্য। যথা

[জ] যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমল দল খলই॥ -গোবিন্দদাস

[ঝ] ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥ —ভারতচন্দ্র

—বিদ্যার 'কঙ্কণ ঝঙ্কার' ও 'ভাষ' (বচন) সম্পর্কে কবির অতিশয়োক্তি।

[ঞ] শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে। —ঠাকুরদাস দত্ত

[খ] বিরোধমূলক অলঙ্কার

মানুষের মন স্বাভাবতই বৈষম্যদ্বারা আকৃষ্ট হয় : অন্ধকারে আলো জ্বলিলে, কিংবা শৈত্য হইতে সহসা উষ্ণতার অনুভব হইলে মনে বৈষম্যবোধজনিত আন্দোলন সৃষ্টি হয়। বিরোধমূলক অলঙ্কার এই বৈষম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরুদ্ধবস্তু, ভাব বা ঘটনার সমাবেশে সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই এই সকল অলঙ্কারের মুখ্য লক্ষ্য। যেমন ইংরাজিতে, তেমনই সংস্কৃতে বিরোধমূলক অলঙ্কারের নানা সূক্ষ্ম প্রকারভেদ দেখা যায়। ইংরাজিতে যেমন আছে Antithesis, Oxymoron, Epigram—তেমনই সংস্কৃতে আছে **বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি**। নিম্নে কয়েকটি প্রধান বিরোধমূলক অলঙ্কারের আলোচনা করা যাইতেছে।

বিরোধ বা বিরোধাভাস

দুইটি বস্তু বা একটি বাক্যার্থ আপাতদৃষ্টিতে 'বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান' হইলে ('বিরুদ্ধমিবভাসতে') **বিরোধ** বা **বিরোধাভাস** অলঙ্কার হয়।

'বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান'—কথাটি তাৎপর্য্যবোধক ; এই অলঙ্কারে যে বিরোধ থাকে, তাহা প্রকৃত বিরোধ নয় - বিরোধের আভাসমাত্র - 'আপাততো বিরোধবৎ ভাষণম্'। তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে এই বিরোধের অবসান ঘটে। বিরোধ যদি সত্য বিরোধ হয়, তাহা হইলে অলঙ্কার হইবে না।

অবশ্য ইংরাজিতে 'Antithesis' নামে যে অলঙ্কারটি আছে, তাহাতে থাকে The *explicit Statement* of the contrast *implied* in the meaning of any term or description' : ইহাতে দুইটি বিপরীতার্থক শব্দ পাশাপাশি রাখিলেও 'Figure' হয়, যেমন, 'heat and light', 'industry and frugality', 'sublimity and beauty' : কিন্তু আমাদের আলোচ্যমান 'বিরোধ' অলঙ্কারটি এ ধরণের বিরুদ্ধ শব্দের বিন্যাসমাত্র নয়। ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এই প্রকারের বিন্যাসকে **'প্রতি-বিন্যাস বা বিরুদ্ধ-বিন্যাস'** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিরুদ্ধ বস্তু বা ভাবের বিন্যাসেও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইতে পারে : যেমন, 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম', 'আমরা পূর্ব্ব, তোমরা পশ্চিম—আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ' (বারবল), অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনাটি,—

আধ চন্দ্র, আধ ভানু—আধ গৌরী, আধ শঙ্কর—আধ রাধা, আধ শ্যাম—আধ আশা, আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ, আধ ছায়া—আধ বহ্নি, আধ ধূম [চন্দ্রশেখরের সুকুমার বলিষ্ঠ দেহের রূপ সম্পর্কে অনুতপ্তা শৈবলিনীর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা]।

—সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে সক্ষম হইলে এই প্রকারের 'বিরুদ্ধ বিন্যাস'কে অলঙ্কার বলা চলে। আর এরূপ বিরুদ্ধবিন্যাসের চমৎকার দৃষ্টান্ত বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃতের বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রকৃতি 'বিরুদ্ধবিন্যাস' হইতে স্বতন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে যাহা বিরুদ্ধবৎ, তাৎপর্য্য অবধারণে সেই বিরোধের অবসান হইলে এই অলঙ্কার হয়। সাধারণতঃ একজাতীয় দ্রব্যে আর এক জাতীয় দ্রব্যের আরোপে বা অলৌকিক ভগবদ্ মহিমার বর্ণনায় কিংবা কবি-প্রসিদ্ধি হেতু আপাত বিরোধের ভঞ্জন হয়। যথা,—

[ক] পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চূর॥
মৃগমদ-চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন ভেল আনল শিখ॥ —জ্ঞানদাস

—প্রিয়তম দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, রাধিকার হাসি-খেলা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার নিকট মৃগমদ-চন্দন-লেপন বিষস্বরূপ, মন্দ পবন অনলশিখা-স্বরূপ। স্বভাবস্নিগ্ধ মৃগমদ-চন্দনে জ্বালাময় বিষের (বিখ) এবং স্বভাবশীতল মন্দপবনে দাহকর 'আনল শিখ'-এর আরোপে আপাতবিরোধ সৃষ্টি হইলেও, বিরহদশায় উহা কল্পিত হওয়ায় বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। ইহাই বিরোধাভাস।

[খ] আছইতে আছল কাঞ্চন তুলা ··
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা। —বিদ্যাপতি

—কাঞ্চনতুল্য বর্ণ আজ জলভারাক্রান্ত মেঘবর্ণ হইয়া গিয়াছে: ঔজ্জ্বল্যে ও শ্যামতায় যে বিরোধ, বিরহে তাহার ভঞ্জন। অলঙ্কার বিরোধাভাস। তেমনই,

[গ] বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ। —হরিশ্চন্দ্র মিত্র

—মেয়ের কল্পনায় যাহা বিরোধ, 'উমাই কালী'—এই বুদ্ধিতে তাহার ভঞ্জন।

[ঘ] অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি। —ভারতচন্দ্র

—অচক্ষুর দর্শন, অকর্ণের শ্রবণ, অপদের গতাগতি আপাতবিরোধী, কিন্তু ভগবৎ-সত্তায় এই বিরোধ-কল্পনায় বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে।

বিরোধাভাসের সৌন্দর্য্য সমধিক পরিস্ফুট হয় কবির কল্পনায়। দুইটি আপাত-বিরোধী বস্তু পাশাপাশি রাখিয়া বা একটি বাক্যে অর্থগত বিরোধ সৃষ্টি করিয়া এবং পরিণামে তাহার অবসান ঘটাইয়া কবিগণ এই অলঙ্কার সৃষ্টি করেন। যথা,

[ঙ] ঈশ্বর নশ্বর আমি বুঝাইব কায়? —ঈশ্বর গুপ্ত

—'ঈশ্বর নশ্বর'—শুনিলেই মনে চমক সৃষ্টি হয়, এ যে বিরোধ কল্পনা: কিন্তু ঈশ্বর=ঈশ্বর গুপ্ত—এই অর্থে বিরোধের অবসান। এখানে অলঙ্কার শ্লেষাশ্রিত বিরোধাভাস।

[চ] অশোকতরু উঠত ফুটি প্রিয়ার পদাঘাতে। —রবীন্দ্রনাথ

—প্রিয়ার পদাঘাতে অশোকতরু পুষ্পিত হওয়ার কল্পনায় যে বিরোধের সৃষ্টি, কবি প্রৌঢ়োক্তিতে তাহার অবসান: সুন্দরী রমণীর পদাঘাতে অশোকতরু পুষ্পিত হয়—ইহা কবি-প্রসিদ্ধি।

[ছ] পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক ঝঙ্কার,
ধূলায় মিশাক যা কিছু ধূলার
জয়ী হোক যাহা নিত্য। —রবীন্দ্রনাথ

[জ] মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নয়—শুধু শিব। —সত্যেন্দ্রনাথ

—বারাণসী সম্পর্কে এই বিরোধের কল্পনা, পৌরাণিক বিশ্বাসে অবসিত হয়। কাশীতে মৃত্যু হইবামাত্র শব শিব হইয়া যায়—ইহাই পৌরাণিক বিশ্বাস।

ইংরাজী Oxymoron এবং Epigram -এই দুইটি Figure-এর সহিত বিরোধাভাস অলঙ্কারের সাদৃশ্য আছে। 'Oxymoron' (*Lit. sharp dull*) is the conjunction of words apparently inconsistent with each other, as, 'a cruel kindness.' (Bain): বাঙলায় পাই;—

[ঝ] এনেছিলে সাথে করে **মৃত্যুহীন প্রাণ**—রবীন্দ্রনাথ

[ঞ] ভীষণ মধুর রোল উঠিছে **রুদ্র-আনন্দে**—সত্যেন্দ্রনাথ

[ট] হে দারিদ্র্য!···তুমি মোরে দানিয়াছ **কণ্টক-মুকুট শোভা**

Epigram-এর সহিতও বিরোধাভাসের আংশিক মিল রহিয়াছে: 'In the Epigram the mind is roused by a conflict or contradiction between the form of language and the meaning really conveyed. 'The child is the father to the man' is an epigram. The language contradicts itself, but the meaning is apparent' (Bain) : বাঙলা বিরোধাভাসেও পাওয়া যায়,

[ঠ] মনুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। –সঞ্জীবচন্দ্র

[ড] ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে। – গোলাম মোস্তাফা

[ঢ] মানুষেরি কাছে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর। —ফজলল করিম

বিষম

কারণ ও কার্য্যের গুণ বা ক্রিয়ার বৈষম্য ঘটিলে, আবদ্ধ কার্য্যের নিষ্ফলতা বা অনভিপ্রেত ফলপ্রাপ্তি সূচিত হইলে কিংবা বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের একত্র সম্মেলন হইলে **বিষম** অলঙ্কার হয়।

কারণ ও কার্য্যের বিরুদ্ধতাজনিত 'বিষম' :

[ক] অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥ —চণ্ডীদাস

– কৃষ্ণের বাঁশী অন্তরে অসার, বাহিরে সরল, তাহা অধর সুধা পান করে, – কিন্তু গরল বর্ষণ করে। বিরুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে রাধার 'আক্ষেপানুরাগ'।

[খ] দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে। কুমার নরচন্দ্র

[গ] রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী॥ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

আরব্ধ কার্য্যের নিষ্ফলতা বা তাহা হইতে অবাঞ্ছিত ফল :

[ঘ] পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় ভরল দে॥ —চণ্ডীদাস

[ঙ] সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥ —জ্ঞানদাস

এক আধারে বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সংঘটন :

[চ] যে রামের শয়ন ছিল মণিরত্ন সিংহাসন।
সেই রামের শয়ন হৈল তৃণপত্র কুশাসন॥
যে রামের ভোজন ছিল মিষ্ট অন্ন গঙ্গাজল।
সেই রামের ভোজন হৈল কূপজল আর বনফল॥

—এই অংশটুকু আমারই সংগৃহীত: ইহা মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে একই রামে অবস্থান্তরে বিরুদ্ধ সংঘটন হইয়াছে।

[ছ] তখন মনে হইতেছিল, **অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক**, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম, **বৃক্ষটি বড় শোষক**, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।
—সঞ্জীবচন্দ্র

[জ] এমন উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই; এত মহাপাপ আর কোথাও নাই। —বঙ্কিমচন্দ্র

বিভাবনা

কারণ ছাড়া কার্য্যোৎপত্তি হইলে **বিভাবনা** অলঙ্কার হয়: 'বিভাবনা বিনা হেতুং কার্য্যোৎপত্তিঃ' (সাহিত্যদর্পণ)।

এই অলঙ্কারে প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়া কার্য্যের উৎপত্তি বিচারিত হয় ('বিভাব্যতে')। কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না, কিন্তু দেখা গেল—কোথায়ও কারণ ছাড়াই কার্য্য হইতেছে: কেন হইতেছে, সেই গৌণ কারণটি দ্যোতিত করাই বিভাবনা অলঙ্কারের লক্ষ্য। এই দ্বিতীয় কারণটি কোথাও উক্ত, কোথাও বা অনুক্ত থাকে। যেমন,

[ক] বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতে নিবে গেল মঙ্গল-প্রদীপ। —অমৃতলাল

বজ্রাঘাত, ইন্দ্রপতন, দীপ নির্ব্বাণ প্রভৃতির প্রসিদ্ধ হেতু মেঘ, প্রলয়কাল ও বাতাস। প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়াই এখানে কার্য্যোৎপত্তি হওয়ায় বিরোধ ঘটিতেছে; কিন্তু কবিতাটি রচিত হইয়াছে আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া—তাহাই এই অসম্ভব সংঘটনার দ্বিতীয় কারণ। তাহা অনুল্লিখিত থাকায় অলঙ্কার হইতেছে 'অনুক্ত নিমিত্তা বিভাবনা।'

[খ] শিব্‌শা গহীন নদী সর্ব্বলোকে কয়।
বিনা বাতাসে পানি গাছের আগায় বয়॥

—'শিব্‌শা' সুন্দরবন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নদী; নদীর জল বাতাস ছাড়া উত্তাল হয় না, কিন্তু শিব্‌শার 'পানি' বিনা বাতাসেই উত্তাল হইয়া উঠে। ইহার অপ্রসিদ্ধ কারণ শিব্‌শার 'গহীন'তা। কারণটি এখানে উল্লিখিত। অতএব ইহা উক্তনিমিত্তা বিভাবনা।

বিশেষোক্তি

কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ফলের অভাব হইলে **বিশেষোক্তি** অলঙ্কার হয়: 'সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তিঃ' (সাহিত্যদর্পণ)। যথা,—

[ক] অনঙ্গদেব তবুও করেন এ তিন ভুবন জয়,
অঙ্গ দগ্ধ হলেও যে তার হয়নি শক্তি ক্ষয়।

—অঙ্গ দগ্ধ হইলে শক্তি নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু কারণ থাকা সত্ত্বেও সে কার্য্যের অভাব: অনঙ্গের শক্তি বিনষ্ট হয় নাই, উপরন্তু তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। কারণ এখানে 'অচিন্ত্য': ইহা অনুক্তনিমিত্তা বিশেষোক্তি।

[খ] পরিশেষে বৃদ্ধকাল কালের অধীন ·
আছে চক্ষু কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তাহে শব্দ নাহি পায়॥
আছে কর কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ কিন্তু নাই গতিশক্তি তার॥ — ঈশ্বর গুপ্ত

—কারণ থাকিলেও কার্য্যের অভাবজনিত বিরোধের অন্য কারণ 'বার্দ্ধক্যের আবির্ভাব'। শেষোক্ত কারণটি উল্লিখিত, ইহা উক্তনিমিত্তা বিশেষোক্তি।

[গ] মানস মাঝারে প্রেম-নির্ঝর উথলে।
কি সাধ্য নয়নপথে প্রবাহ নিকলে॥
লজ্জা তার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে তটে।
ফিরে যায় প্রেমস্রোত মনের নিকটে॥ —রঙ্গলাল

—প্রেমনির্ঝর উথলিত হইলেও নয়নপথে তাহার প্রবাহ নির্গত হয় না: কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও ক্রিয়া হয় না। ইহার কারণ 'লজ্জা': অলঙ্কার উক্তনিমিত্তা বিশেষোক্তি।

[ঘ] সেই আমি সেই তুমি
সেই সে স্বরগভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ
সেই প্রাণ, সেই দেহ
কেন মন্দাকিনী তীরে দুপারে দুজন? —বিহারীলাল

—পূর্ব্বে যে কারণে ও যে অবস্থায় কবির মানস-প্রিয়া দেবী সারদার সহিত কবির মিলন হইত, তাহা সবই বর্ত্তমান; তৎসত্ত্বেও মিলন হইতেছে না— 'মন্দাকিনী তীরে দুপারে দুজন': ইহার কারণ 'অভিমান'। কারণটি পরে বলা হইযাছে 'অভিমান সমুখে উদয'—কিন্তু এই অংশে অনুল্লিখিত। বিভাব্য কারণ উল্লিখিত নাই এজন্য এখানে অলঙ্কার অনুক্তনিমিত্তা বিশেষোক্তি।

[ঙ] মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক। —রবীন্দ্রনাথ

—'অযোধ্যার রঘুপতি রাম' সম্পর্কে এই বিশেষোক্তি।

অসঙ্গতি

কার্য্য ও কারণ যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে, তাহা হইলে **অসঙ্গতি** অলঙ্কার হয়: 'কার্য্যকারণযোর্ভিন্নদেশতায়ামসঙ্গতিঃ' (সাহিত্যদর্পণ)। যেখানে কারণ, সেইখানেই কার্য্য ঘটে—জলের কমল জলেই ফুটে—ইহাই নিয়ম: কিন্তু অসঙ্গতি অলঙ্কারে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয় কারণ ও কার্য্যের ভিন্নদেশবর্ত্তিত্বে: যথা,

[ক] একের কপালে রহে আরের কপালে দহে
আগুনের কপালে আগুন। —ভারতচন্দ্র

—শিবের ললাটস্থিত বহ্নি মদনপত্নী রতির কপাল পুড়াইয়াছে। কার্য্য-কারণের ভিন্নদেশবর্ত্তিত্ব হেতু অলঙ্কার অসঙ্গতি।

[খ] লড়ায়ে আজিকে কত মাথা আমি ভাঙ্গিয়াছি দুই হাতে,
আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙ্গেছে তাতে।—জসীমউদ্দীন

—সোনা ও সাজু—পল্লীর বর ও বধূ: সোনা 'কাইজা' করিয়া অনেকের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, ইহার পরিণাম বধূর পক্ষে ভয়ঙ্কর—তাহারই ইঙ্গিত এখানে। একস্থানের ক্রিয়ার ফল অন্যত্র ঘটিতেছে বলিয়া অলঙ্কার 'অসঙ্গতি'।

[গ] গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার

গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূল অলঙ্কারে সাধারণতঃ বর্ণনীয় বিষয় হইতে বিষয়ান্তর ব্যঞ্জিত হয়। সাধারণভাবে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়—তাহা হইতে অন্য একটি ইঙ্গিত প্রদান করাই এই শ্রেণীর অলঙ্কারের মুখ্য লক্ষ্য। ইহাতে নানাদিক হইতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়। অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার এই পর্য্যায়ে পড়ে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা

'অপ্রস্তুত' শব্দটির অর্থ যাহা প্রস্তাবিত নয় অর্থাৎ যাহা মুখ্যভাবে বর্ণনার বিষয় নয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, উপমানকেই 'অপ্রস্তুত' বলা হয়, যেমন 'চাঁদের মত সুন্দর মুখ'—এখানে 'চাঁদ' অপ্রস্তুত বিষয়। কিন্তু 'অপ্রস্তুত' শব্দটি ইহা হইতেও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করিতে পারে; কেবল একটিমাত্র শব্দ নয়, একটি সমগ্র বিষয় অধিকার করিয়া অপ্রস্তুতের প্রকাশ হইতে পারে; যেমন, 'দাঁড়কাক কি কখন ময়ূর হয়'—এখানে গোটা বাক্যটিই অপ্রস্তুত বাক্য। আবার ইংরাজিতে যাহাকে আমরা Allegory বলি, তাহারও সমস্তটাই অপ্রস্তুত বিষয়।

অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা হইতে যদি ব্যঞ্জনায় প্রস্তুত বিষয়ের অবগতি হয়, তাহা হইলে অলঙ্কার হয় **অপ্রস্তুত প্রশংসা** ('অপ্রস্তুতেন প্রস্তুতস্য প্রশংসাব্যঞ্জনম্'—সাহিত্যদর্পণের টীকা)।[১]

'প্রশংসা' শব্দটির অর্থ বর্ণনা। অপ্রস্তুত প্রশংসায় কেবল অপ্রস্তুত বিষয়টিরই বর্ণনা থাকে: সেই বর্ণনা হইতে আসল বিষয়টির প্রতীতি হয়। সমাসোক্তি অলঙ্কারের সহিত ইহার ভেদ এই যে, সমাসোক্তিতে থাকে প্রস্তুত

১ 'অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোঽন্যস্য যা স্তুতিঃ অপ্রস্তুত প্রশংসা সা'—ধ্বন্যালোক টীকা, ১।১৩

বিষয়ের বর্ণনা, তাহা হইতে অপ্রস্তুতের অবগতি হয়, কিন্তু অপ্রস্তুত প্রশংসায় থাকে কেবল **অপ্রস্তুত** বিষয়ের বর্ণনা, তাহা হইতে প্রস্তুত আভাসিত হয়, যেমন,—'বসন্ত আজ চলেছে অভিসারে' —ইহা সমাসোক্তি; এখানে প্রস্তুত 'বসন্তে' অপ্রস্তুত অভিসারিকার ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু যদি বলা যায়, 'বসন্ত কি চিরদিন থাকে?'—তাহা হইলে উহা হইবে অপ্রস্তুত প্রশংসা, কারণ বসন্তের থাকার কথা কবির প্রস্তাবিত বিষয়ই নয়, তাহার বক্তব্য 'জীবনে যৌবন বেশিদিন থাকে না': এই প্রস্তুত বিষয়টিই অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা হইতে ব্যঞ্জনায় প্রতীতি হইতেছে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা ও সমাসোক্তি

অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারটিকে 'অতিশয়োক্তি' বলিযাও ভ্রম হইতে পারে, কারণ, অতিশয়োক্তিতে উপমান উপমেযকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু অতিশয়োক্তি হইতে অপ্রস্তুত প্রশংসার প্রধান পার্থক্য এই যে, অতিশয়োক্তিতে —উপমান উপমেয়কে গ্রস্ত করিয়া অভেদ প্রতিপাদন করে। অপ্রস্তুত প্রশংসায অভেদ-প্রতিপাদনের প্রশ্ন উঠে না, ইহাতে অপ্রস্তুত বর্ণনা হইতে ব্যঞ্জনায় প্রস্তুত বিষয়টি আভাসিত হয়। অতিশয়োক্তি **'অভেদ সর্ব্বস্ব'** অলঙ্কার, অপ্রস্তুত প্রশংসা **'গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূল'**—ইহাতে কোন গূঢ়তর বিষয়ের ইঙ্গিত থাকে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা ও অতিশয়োক্তি

অপ্রস্তুত প্রশংসায় পাঁচ প্রকারে অপ্রস্তাবিত বিষয় হইতে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতীতি হয়: (১) সামান্য অপ্রস্তুত হইতে বিশেষ প্রস্তুতের জ্ঞান; (২) বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে সামান্য প্রস্তুতের জ্ঞান; (৩) অপ্রস্তুত কার্য্য হইতে প্রস্তুত কারণের বোধ; (৪) অপ্রস্তুত কারণ হইতে প্রস্তুত কার্য্যের বোধ এবং (৫) সমান অপ্রস্তুত হইতে সমান প্রস্তুতের গম্য-সাদৃশ্য।[১]

(১) **সামান্য হইতে বিশেষ:**

[ক] বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা স্বরথী
লঙ্কেশ,—'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?' —মধুসূদন

—'বিধির বিধান কে পারে খণ্ডাতে'—ইহা সাধারণ সত্য (universal truth): কিন্তু ইহা রাবণের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য নয়: তিনি লক্ষ্মণকে

১ এই প্রসঙ্গে 'সামান্য' ও 'বিশেষ'-এর অর্থ প্রণিধেয়। সামান্য হইতেছে সাধারণ (Universal), বিশেষ হইতেছে অ-সাধারণ (Particular): সূর্য্য অস্ত যায়, যেমন কর্ম তেমন ফল—এগুলি সামান্য উক্তি।

শক্তিশেলে নিহত করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্মণ আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে। তিনি বুঝিতেছেন, লঙ্কার ধ্বংস আসন্ন। সামান্য অপ্রস্তুত হইতে এই বিশেষ প্রস্তুতটিই এখানে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অলঙ্কার অপ্রস্তুত প্রশংসা।

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন, 'অহো, সংসারের নিষ্ঠুরতা! অহো, বিপদের দৌরাত্ম্য! অহো, স্বভাবক্রূর বিধির দুরন্ত গতি'—এই সকল উক্তিতে দৈবের প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক, ইহা হইতে কোন বিশেষ বস্তুর বিনাশ—এই ইঙ্গিতটিই প্রাসঙ্গিক। অতএব ইহা সামান্য অপ্রস্তুত হইতে বিশেষ প্রস্তুতের প্রসঙ্গবোধক অপ্রস্তুত প্রশংসা। (দ্রষ্টব্য—ধ্বন্যালোক, লোচন-টীকা, ১।১৩)

[খ] বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন, কহিলেন, '...এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?' লুৎফ-উন্নিসা... বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, 'ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে। কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না।' —বঙ্কিমচন্দ্র

—'এক বৃন্তে কি দুইটি ফুল ফুটে না'—বাদশাহের এই উক্তিটি অপ্রাসঙ্গিক: মেহেরউন্নিসা ও লুৎফউন্নিসা উভয়েই কি বাদশাহের মহিষী হইতে পারে না—এই বিশেষ বক্তব্যটিই প্রাসঙ্গিক: অলঙ্কার অপ্রস্তুত প্রশংসা। তেমনই লুৎফউন্নিসার উক্তিতেও সামান্য অপ্রস্তুত হইতে প্রাসঙ্গিক এই বিশেষ বস্তুটির দ্যোতনা হইতেছে যে, মেহেরউন্নিসা ও লুৎফউন্নিসার মত অসাধারণ দুই নারীর একত্র অবস্থান অসম্ভব: এখানেও অলঙ্কার অপ্রস্তুত প্রশংসা।

(২) **বিশেষ হইতে সামান্য**: বহু নীতিকথামূলক কবিতায় এই প্রকারের অপ্রস্তুত প্রশংসার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে: বিশেষ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেনের রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' অপ্রস্তুত প্রশংসায় পূর্ণ। যথা,

[গ] সুবর্ণ সুবর্ণ যিনি চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে করে অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে করে না বিহার॥ —ঈশ্বর গুপ্ত

—চম্পক-ঘটিত এই বিশেষ বর্ণনা কবির মুখ্য বাচ্য নয়, কবির বক্তব্য এই সামান্য সত্যটি—'রূপ দ্বারা মোহ বিস্তার করা যায় বটে কিন্তু গুণ না থাকিলে রসিকজনকে আকর্ষণ করা যায় না।'

[ঘ] প্রাচীরের গাত্রে এক নাম গোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই ! —রবীন্দ্রনাথ

—'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই সামান্য প্রস্তুতটিই এখানে প্রাসঙ্গিক।

(৩) **অন্যান্য উদাহরণ :**

[ঙ] চাতক অনন্যধ্যান অন্যজলে তুচ্ছজ্ঞান
কে তোষে তাহার প্রাণ কাদম্বিনী বিনে ? —বিহারীলাল

—ভালবাসায় নিরাশ হইলেও প্রেমিক একের প্রেম ব্যতীত অন্য প্রেম কামনা করে না, এই সামান্য প্রস্তুতটিই এখানে প্রাসঙ্গিক।

[চ] ভাবি প্রভু, দেখ কিন্তু মনে
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। —মধুসূদন

—পুত্রশোকাতুর রাবণের প্রতি মন্ত্রী সারণের উপদেশ : এখানে 'চূড়াহীন ভূধর' এই অপ্রস্তুত দ্বারা তৎসদৃশ পুত্রহীন রাবণের প্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা সাদৃশ্যভাবের অপ্রস্তুত প্রশংসা।

[ছ] সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে—কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে ; কে খাঁটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে। —বঙ্কিমচন্দ্র

—এখানে কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক অপ্রস্তুতের মালা : ইহাদের প্রাসঙ্গিক ব্যঞ্জনা—'ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধুর প্রেমে ভাঙ্গন ধরিয়াছে'। এখানেও অলঙ্কারটি সাদৃশ্যভাবের।

[জ] ধরণী জন্মিল হেথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥
নূপুর হৈয়াছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥ —রঘুনন্দন

—ইহা বিসদৃশভাবের অপ্রস্তুত প্রশংসা : ধরণী ও নূপুর পুণ্যবান, রাধা পুণ্যহীনা—ইহাই ব্যঞ্জনা।

অর্থান্তরন্যাস

বাক্যার্থরূপ (statement) কোন বস্তুকে প্রকৃতবস্তু ধরিয়া তাহার যথার্থতা সমর্থন করিবার জন্য অন্য একটি বাক্যার্থরূপ বস্তুকে অপ্রস্তুতের মত কীর্ত্তন করিলে **অর্থান্তরন্যাস** অলঙ্কার হয়।[১]

'ন্যাস' কথাটির অর্থ ক্ষেপণ অর্থাৎ কথন বা কীর্ত্তন। একটি বাক্যার্থ দ্বারা অন্য একটি বাক্যার্থের **সমর্থন** এই অলঙ্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাক্যার্থ দুইটি সমানধর্ম্মবৎ অথবা বিপরীত ধর্ম্মী হইতে পারে। মোটের উপর কোন একটি উক্তির সমর্থনে (যাথার্থ্য প্রাতিপাদনে) বাক্যার্থান্তরের 'ন্যাস'ই অর্থান্তরন্যাস। এই অলঙ্কারে (১) বিশেষ বস্তু (বাক্য) দ্বারা সামান্য বস্তুর, (২) সামান্য বস্তুদ্বারা বিশেষ বস্তুর, (৩) কারণদ্বারা কার্য্যের এবং (৪) কার্য্যদ্বারা কারণের সমর্থন করা হয়। বিশেষ হইতেছে particular (statement), আর সামান্য হইতেছে universal (truth or statement) যেমন,

একা যাব বর্দ্ধমান করিযা যতন
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥

—এখানে 'যতন নহিলে কোথা মিলযে রতন' একটি সামান্য (universal) উক্তি এবং 'একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন'—বিশেষ (particular) উক্তি : সামান্য দ্বারা এখানে বিশেষটি সমর্থিত হইযাছে—অতএব অলঙ্কার অর্থান্তর-ন্যাস। **সামান্য-বিশেষ** জ্ঞান এবং একের দ্বারা অন্যের **সমর্থন** এই অলঙ্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অপ্রস্তুত প্রশংসার সহিত অর্থান্তরন্যাসের গোলযোগ উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ অপ্রস্তুত প্রশংসায একটি পক্ষই ('সামান্য' অথবা 'বিশেষ') উপস্থিত থাকে, অপরটি ব্যঞ্জনায় স্থির কবিযা লইতে হয়। বরং প্রতিবস্তূপমা ও দৃষ্টান্ত অলঙ্কারেব সহিত অর্থান্তরন্যাসের বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে : কারণ অর্থান্তরন্যাসের বস্তু দুইটি কথনও কথনও সমানধর্ম্মবৎ হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রতিবস্তূপমায় **সাধারণ ধর্ম্মের অভিন্নত্ব** থাকে, তাহাতে সামান্য-বিশেষ ভাব বা কার্য্য-কারণ ভাব বর্ত্তমান থাকে না, একের দ্বারা অপরের সমর্থনের প্রশ্নও উঠে না। দৃষ্টান্ত অলঙ্কাবে থাকে সামান্য ধর্ম্মের ভিন্নত্বে

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস

---

১ জ্ঞেয়ঃ সোঽর্থান্তরন্যাসো বস্তু প্রস্তুত্য কিঞ্চন।
তৎসাধনসমর্থস্য ন্যাসো যোঽন্যস্য বস্তুনঃ ॥—কাব্যাদর্শ, ২।১৬৯

বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব। ইহাতে **সামান্যে সামান্যে** অথবা **বিশেষে বিশেষে** বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের সাদৃশ্য থাকে। অর্থান্তরন্যাসে সে স্থলে সামান্যদ্বারা বিশেষকে অথবা বিশেষদ্বারা সামান্যকে সমর্থন করা হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করিলেই উহার লক্ষণ আরও পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণ :—

(১) **সামান্যদ্বারা বিশেষের সমর্থন** : এইরূপ স্থলে সাধারণতঃ সামান্য বস্তু (general statement) পরের বাক্যে থাকে, বিশেষটি (particular statement) পূর্ব্বে বসে :

[ক] কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্ঘ রত্ন! দরিদ্র পাইলে
রতন কভু কি তারে রাখে অযতনে ধনি! —মধুসূদন

—'দরিদ্র রত্ন পাইলে তাহাকে অযত্ন করে না'—পরের বাক্যে অবস্থিত এই সামান্য উক্তিটি দ্বারা—কাঙ্গালিনী সীতার পক্ষে মহার্ঘরত্নরূপিনী সরমাকে বিস্মৃত হওয়া যে অসম্ভব—এই বিশেষ বস্তুটি সমর্থিত হইয়াছে; অলঙ্কার অর্থান্তরন্যাস।

[খ] ছাড় এই স্থান রামা ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥ —কবিকঙ্কণ

চণ্ডীদেবীর প্রতি কালকেতুর উক্তি : এখানে পরের বাক্যের সামান্য উক্তি দ্বারা পূর্ব্ব বাক্যের উক্তিটি সমর্থিত হইয়াছে।

[গ] শিখরেতে থাকে শিখী গগনে নীরদ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ॥
কুমুদ বান্ধব কত লক্ষান্তরে রয়।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূরে নয়॥ —রঙ্গলাল

'যে যাহার বন্ধু সে কখনও তাহা হইতে দূরে থাকে না' —এই সামান্য বাক্যটি দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষ কার্য্যগুলি সমর্থিত হইয়াছে।

[ঘ] ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্প গন্ধ বিতরণই তার সুখ।
আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল। —বঙ্কিমচন্দ্র

(২) **বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন** : এস্থলে সামান্য বস্তুটি থাকে প্রথম বাক্যে, বিশেষ বস্তুটি থাকে পরের বাক্যে :

[ঙ] চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥

—দ্বিতীয় বাক্যটিই 'বিশেষ বস্তু'; ইহা দ্বারা প্রথম বাক্যের—সুধীজন ব্যথিতের বেদনা বুঝে না—এই সামান্য উক্তিটি সমর্থিত হওয়ায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে।

[চ] উদ্যোগ বিহনে ধর্ম্ম না হয় অর্জ্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে দেবগণ॥ —রঙ্গলাল

—ক্ষীর সাগর মন্থন করিয়া দেবতাগণ সুধা পান করেন, এই বিশেষ উক্তি দ্বারা 'উদ্যোগ বিহনে ধন উপার্জ্জন হয় না'—এই সামান্য উক্তিটি সমর্থিত হইয়াছে।

[ছ] সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্রী। অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না—অনেকে আপনা আপনি আসিয়া জুটে যায়, কিন্তু অর্থাভাব হইলে সঙ্গী পাওয়া ভার। —টেকচাঁদ

—বিশেষদ্বারা সামান্যের সমর্থন। 'অর্থাভাব হইলে সঙ্গী পাওয়া ভার' —এই অংশেও অর্থান্তরন্যাস আছে বৈধর্ম্ম্য সূত্রে।

[জ] শান্তিসুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই না। ভগবান এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত আছে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না। —রবীন্দ্রনাথ

[ঝ] পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥ —কবিকঙ্কণ

—কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উক্তি: কালকেতু এক ষোড়শী কন্যাকে (চণ্ডীদেবী) গৃহে আনিয়াছেন, সামান্য ব্যাধের পক্ষে এই অনুচিত কার্য্য মারাত্মক—এই বিশেষ কার্য্যটি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে প্রথম বাক্যের সামান্য উক্তিটি।

[ঞ] সবই যায় কিছুই থাকে না; থাকে শুধু কীর্ত্তি। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। —চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

[ট] ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা দৌরাত্ম্য করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন?
—গোবিন্দলালের নিকট ব্রহ্মানন্দের পত্র। — বঙ্কিমচন্দ্র

ব্যাজস্তুতি

অভিধেয় নিন্দা বা স্তুতি দ্বারা যদি যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে **ব্যাজস্তুতি** অলঙ্কার হয়।[১]

'ব্যাজ' শব্দটির অর্থ 'ছল'। এই অলঙ্কারে প্রকারান্তরে (ব্যাজে=ছলে) বাচ্য নিন্দা বা স্তুতি দ্বারা তদ্বিপরীত ভাবটি প্রকাশ পায়। 'শ্লেষ' (শব্দালঙ্কার)-এর সহিত ইহার রূপগত সাদৃশ্য থাকিলেও, এই অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জনা-বোধে, শ্লেষের সৌন্দর্য্য শব্দধ্বনিতে। ব্যাজস্তুতির উদাহরণ :—

[ক] অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

—ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নপূর্ণার উক্তি : ঈশ্বরী পাটনী ইহাকে স্বামী-নিন্দা বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু শব্দার্থের ভেদ বিচারে ইহা শিবের স্তুতি। (দ্রষ্টব্য —শ্লেষ অলঙ্কার)

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে শ্লেষগর্ভ ব্যাজস্তুতির অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর আক্ষেপানুরাগে বা শাক্তপদের সন্তানের মান-অভিমানে সূক্ষ্ম-সুন্দর ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—

[খ] মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই!
থাকলে আসি দিতো দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥ —নরচন্দ্র

—এই উক্তিটির মধ্যে মা-পাগল সন্তানের মায়ের প্রতি কঠিন অপভাষ ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে রহিয়াছে মায়ের স্তুতি : মা (কালী) যে ব্রহ্মময়ী, তিনি 'নিরাকারা', তাঁহাকে চোখে দেখা যায় না, তাঁহার জন্ম-মৃত্যুও নাই : তিনি 'সর্ব্বনাশী'—কালেরও কলনকর্ত্রী কালী : ইহাই ব্যঞ্জনার স্তুতি।

[গ] কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! —মধুসূদন

—সমুদ্রের সেতুবন্ধনকে উপলক্ষ্য করিয়া পুত্রশোকাতুর রাবণের সমুদ্রের প্রশংসা স্থলে নিন্দা।

১ উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।
নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যতে স্তুতিনিন্দয়োঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ

স্বভাবোক্তি

কোন বস্তুর রূপ ও ক্রিয়ার অকৃত্রিম বর্ণনাই **স্বভাবোক্তি**।[১] আচার্য্য বিশ্বনাথ স্বভাবোক্তিকে 'দুরূহার্থ' বলিয়াছেন; ইহার সৌন্দর্য্য অবধারণগম্য। এইজন্যই ইহাও গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কারের পর্য্যায়ে পড়ে। যেন-তেন-প্রকারেণ কোন বস্তুর বর্ণনা করিলেই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয় না। বর্ণনাটি সূক্ষ্ম ও সুন্দর হওয়া চাই। স্বভাবোক্তি দ্বারা একটি বস্তুর বহির্বর্ণনা হইতে বস্তুটির অন্তর্নিহিত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহাতে অন্যান্য অলঙ্কারের ন্যায় বাহিরের কোন বিষয় আক্ষিপ্ত হয় না, ইহা স্বয়ংবেদ্য: নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই ঝলমল করে। এইজন্যই আচার্য্য দণ্ডী স্বভাবোক্তি অলঙ্কারকে বলিয়াছেন,—'আদ্যা সালঙ্কৃতিঃ'। স্বভাবোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টিতে কবি-প্রতিভার প্রয়োজন অর্থাৎ সত্যকারের কবিপ্রতিভার স্পর্শেই এই অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব পরিস্ফুট হয়। কেহ কেহ ইহাকেও 'অলঙ্কারোত্তমা' বলিয়াছেন।

কেবল প্রকৃতির (নিসর্গ) বর্ণনা নয়, যে-কোন বিষয়ের নিখুঁৎ বর্ণনাই স্বভাবোক্তি: বর্ণনাটি এমন যে, বস্তুটি 'সাক্ষাৎ' বলিয়া মনে হয়। যথা,—

[ক] গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমাবে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্য পান
নাহি খায় ক্ষীব-ননী-সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা, ধবে দে উহারে।
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিযা মোরে মারে। —রামপ্রসাদ

—ছোট্ট একটি মেয়ের মান-অভিমানের নিখুঁৎ চিত্র। বর্ণনাটি পাঠ করিলেই একটি ছবি মনে মুদ্রিত হইয়া যায়।

[খ] ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিযা উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে গাছের

১ স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থ-স্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্—সাহিত্যদর্পণ

গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে বড় অন্ধকার ; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল ও পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে। —বঙ্কিমচন্দ্র

—খরস্রোতা ত্রিস্রোতার অকৃত্রিম, সুন্দর বর্ণনা।

[গ] তৃণাঞ্চিত তীরে
জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়েছিল, দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে। —রবীন্দ্রনাথ

[ঘ] পাণ্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে সাজু আঁকে খুব ধীরে ধীরে
আঁকিয়া আঁকিয়া আঁখিজল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।
কাঁথার উপর আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি
তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি,
রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি বিরহীর বেশে
অঘোরে বাজায় বাঁশের বাঁশিটি, বুক যায় জলে ভেসে। —জসীমউদ্দিন

—বিরহিনী পল্লীবধূ কাঁথা সেলাই করিতেছে : কাঁথায় ফুটিয়া উঠিতেছে অতীত স্মৃতি আর তাহার বুকের বেদনা। স্বভাবোক্তিটি বড় সুন্দর।

[ঘ] অন্যান্য অলঙ্কার

কারণমালা

কোন কারণের কার্য্য যদি কারণ হইয়া পরবর্ত্তী কার্য্য জন্মায় এবং এই ভাবে কারণ পরম্পরা চলে তবে **কারণমালা** অলঙ্কার হয়। যথা,

[ক] সঙ্গ হইতে জন্মে কাম, কামে ক্রোধ হয়
ক্রোধ হৈতে হয় মোহ, মোহে স্মৃতিক্ষয়
স্মৃতিনাশে বুদ্ধিনাশ অবশ্য হইবে
বুদ্ধিনাশ হৈতে মৃত্যু ইহাই জানিবে। —গীতোক্ত শ্লোকের অনুবাদ

[খ] 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন'

একাবলী

পর পর বাক্যের বিশেষ্য যদি ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যের বিশেষণরূপে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে **একাবলী** অলঙ্কার হয়। স্থাপনের পরিবর্ত্তে অপোহন (নিরাকরণ) হইলেও একাবলী হয়। বিশেষণরূপে স্থাপন দ্বারা, শব্দটি যে বিশেষণই হইবে, তাহা বুঝায় না, বিশেষণভাবাপন্ন হইবে ইহাই বুঝায়। যথা,

[ক] ওই দেখ সরোবর কমল-শোভিত,
কমলকুসুম পুনঃ ভৃঙ্গ-সুশোভিত ;
ভৃঙ্গসব গুঞ্জরিছে সঙ্গীত-মুখর,
সঙ্গীত জাগায় চিতে স্মৃতি মনোহর।

—পরবর্ত্তী বাক্যগুলির কমল, ভৃঙ্গ, সঙ্গীত—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যে বিশেষণের মত স্থাপিত হওয়াতে অলঙ্কার হইয়াছে একাবলী।

[খ] নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম। পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর উভয়ে উভয় প্রেম-বদ্ধ॥ —দাশরথি রায়

[গ] পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—···ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পর আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম···সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল। —বঙ্কিমচন্দ্র

[ঘ] তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল · বর্ণনা চিত্র-বহুল···চিত্র বর্ণবহুল। —বুদ্ধদেব

সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইলে সার অলঙ্কার হয়: 'উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো বস্তুনঃ সার উচ্যতে' (সাহিত্যদর্পণ)। যথা,—

[ক] সংসারসারচেতনবস্তু, চেতনের সার নর,
নরের মাঝারে সুসার জানিবে বিদ্বান গুণধর।

[খ] প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
ইহার মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

তুল্যযোগিতা

প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুত বিষয়গুলি একই ধর্ম্মের (গুণ বা ক্রিয়া) বন্ধনে **সংযুক্ত হইলে** তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়। মনে রাখিতে হইবে, এই **অলঙ্কারে** একাধিক উপমেয় বা একাধিক উপমান থাকে। এই উপমেয়গুলি একরূপ গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত হয় অথবা উপমানগুলি এক ধর্ম্মদ্বারা **সংযুক্ত হয়।** যথা,—

[ক] পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে
বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম। —হেমচন্দ্র

—ইন্দ্র দধিচীর আশ্রমে নিজেকে প্রকাশ করিলেন: 'প্রকাশিলা' এই ক্রিয়াদ্বারা 'দেবকান্তি', 'কেশ' ও 'বর্ম্ম'-এর প্রকাশও বুঝাইতেছে বলিয়া **অলঙ্কার** তুল্যযোগিতা।

[খ] —কি করে জানিলে
তার চোখে অশ্রু ছিল কিনা? বেশী নয়
একবিন্দু জল। নহে তো নয়ন প্রান্তে
ছল ছল ভাব; কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী! —রবীন্দ্রনাথ

—'ছিল কি না' এই ক্রিয়ার বন্ধনে সংযুক্ত হইয়াছে 'অশ্রু' কিংবা 'ছলছলভাব' ও 'অশ্রুবদ্ধ বাণী'।

[গ] জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল —ছড়া

এখানে 'জবা', 'করবী' ও 'কুসুমফুল'—এই উপমানগুলি এক 'রাঙা'র বন্ধনে আবদ্ধ।

দীপক

তুল্যযোগিতায় কতকগুলি উপমান **অথবা** উপমেয় এক সমানধর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত হয়; **দীপক** অলঙ্কারে **প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত** এক গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হয়। 'দীপক' নামটি সার্থক; একটি দীপ যেমন গৃহের সকল বস্তুকে আলোকিত করে, দীপক অলঙ্কারেও তেমনই অপ্রস্তুত ও প্রস্তুত একটি মাত্র ধর্ম্ম (গুণ বা ক্রিয়া) দ্বারা সংযুক্ত হয়: 'দীপ ইব দীপকং নিগদ্যতে'। যথা,—

[ক] ঘটিলে খলের সঙ্গ সকলে শঙ্কিত।
খলে আর বিষধরে ধরে এক রীত॥

—এখানে 'খল' উপমেয়, 'বিষধর' উপমান, ইহারা উভয়ে 'ধরে' ক্রিয়া দ্বারা 'এক ধর্ম্মাভিসম্বন্ধ'-যুক্ত হইয়াছে।

[খ] যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে। —রবীন্দ্রনাথ

লক্ষণামূল অলঙ্কার

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে **'লক্ষণা'** শব্দের একটি শক্তি। বাচ্য দ্বারা শব্দার্থের বোধ না হইয়া—সেই শব্দের সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ দ্বারা অর্থ-প্রতীতি হইলে অর্থটিকে বলা হয় লক্ষ্যার্থ এবং যে শক্তি দ্বারা এই ভাবে অন্য অর্থ লক্ষিত হয়, শব্দের সেই শক্তিকে বলে 'লক্ষণা-শক্তি'।[১] যেমন, 'তিনিই এ গ্রামের **মাথা**'; 'মাথা' দ্বারা অভিধা-শক্তি বলে 'মস্তক' এই অর্থটিই প্রকাশ পায়, কিন্তু এই বাক্যে 'মাথা' মস্তক নয়, মস্তক-সংশ্লিষ্ট 'বুদ্ধি'র কথাই বুঝায়। ইহাই **লক্ষ্যার্থ**। লক্ষণা দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) রূঢ়ি লক্ষণা ও (২) প্রয়োজন লক্ষণা। লোক-ব্যবহারের দ্বারা যে লক্ষ্যার্থ প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তাহা রূঢ়ি-লক্ষণা, যেমন, 'আমি **রবীন্দ্রনাথ** পড়িতেছি'—এখানে 'রবীন্দ্রনাথ' বলিতে 'রবীন্দ্রনাথের রচনা' এই অর্থটি প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহাই রূঢ়ি-লক্ষণা। যে লক্ষণার লক্ষ্যার্থ লোকসিদ্ধ নয়, বক্তার বা লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী নূতন অর্থের সূচনা করে, তাহাই **প্রয়োজন-লক্ষণা**, যেমন, 'অমঙ্গল স্মরি, এ রাজ্যের **টিকি** যত হবে কণ্টকিত'—এখানে 'টিকি' বলিতে 'ব্রাহ্মণ'কেই বুঝায় না (যদিও ইহা ব্রাহ্মণেরই প্রতীক), বুঝায় তথাকথিত আচার-সর্ব্বস্ব মিথ্যাচারী ব্রাহ্মণকে; লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই অর্থটিই এখানে সূচিত হইয়াছে।

রূঢ়ি-লক্ষণা দ্বারা সাধারণতঃ এই সকল অর্থ প্রকাশ পায়: যথা, (১) অধিবাসী স্থলে দেশ বা ভূখণ্ড: **'পঞ্জাব** আজি গরজি উঠিল' (২) প্রতিনিধিবর্গ স্থলে দেশ বা প্রতিষ্ঠান: **ইষ্টবেঙ্গল** জিতে গেল: **রাজস্থান** হেরে গেল (৩) কর্ম্মের পরিবর্ত্তে কর্ত্তা: 'আমি **কালিদাস** পড়িতেছি।

---

১ মুখ্যার্থবোধে তদযুক্তো যয়াঽন্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা॥—সাহিত্যদর্পণ

প্রয়োজন-লক্ষণার বহু প্রকারভেদ : উক্তির সৌন্দর্য্য এই লক্ষণা দ্বারাই সৃষ্ট হয়। আমরা মোটামুটি কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—(১) প্রতীক দ্বারা মূলবস্তু : **'গেরুয়ার** মাহাত্ম্য', **'লাল-টুপী'** ; (২) বস্তু স্থলে বস্তুর আধার : 'নারিবে শোধিতে ধার **গৌড়ভূমি'** ; (৩) কার্য্যস্থলে কারণ,—'তিনি **শোকে** ম্রিয়মাণ' ; (৪) কারণস্থলে কার্য্য : **'পক্ককেশের** সম্মান করিবে' ; (৫) সমগ্র স্থলে অংশ : 'চার হাত **এক** হওয়া' ; (৬) অংশস্থলে সমগ্র : **'বৌদ্ধজগৎ'** ; (৭) বস্তুস্থলে উপাদান : 'দেহে **স্বর্ণ** ধারণ করিও' ; (৮) সামান্য স্থলে বিশেষ : **'ডালভাত', 'পান খাবার** টাকা' ; (৯) বিশেষ স্থলে সামান্য : তিনি **পথ্য** করিলেন ; (১০) জাতি স্থলে ব্যক্তি : 'রূপে **মদন'** ; (১১) গুণ স্থলে বস্তু : **'মানুষ** হও' ; (১২) বস্তু স্থলে গুণ : **'যৌবনের** জয়যাত্রা'—ইত্যাদি।

ইংরাজিতে কয়েকটি অলঙ্কার লক্ষণা দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান Metonymy (=a transfer of name) এবং Synecdoche : অধ্যাপক Bain বলেন, 'In this class of figures, a thing is *named*, either by some accompaniment or by some part.' যেমন,

> **Metonymy** *:* (1) Sign or symbol for the main subject : *crown* for royalty (2) Instrument for the agent : 'The arbitration of the *sword'* (3) The container for the contained : He drank the *cup* (4) An author is put for his works : I am reading *Mill* and *Spencer.*
>
> **Synecdoche :** (1) Part for the whole : They sought his *blood* (2) Material for the thing made : The glittering *steel* (= sword) (3) Passion for the object : 'My *love'* etc.

সংস্কৃতে 'লক্ষণা' অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। আচার্য্য সুধীরকুমার দাশগুপ্ত Metonymy ও Synecdoche-এর সাদৃশ্যে 'লক্ষ্যোক্তি' এবং Transferred epithet-এর সাদৃশ্যে 'আরোপোক্তি' এই দুইটি অলঙ্কারের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুইয়েরই ভিত্তি—লক্ষণাশক্তি, লক্ষ্য—সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।

লক্ষ্যোক্তি

"লক্ষণাশক্তির প্রয়োগে উক্তিতে যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয়, তাহার নাম **লক্ষ্যোক্তি** অলঙ্কার" (কাব্যশ্রী) :

রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধিমূলক :

[ক] ভাসিছে কনকলঙ্কা আনন্দের নীরে। —মধুসূদন

লঙ্কা = লঙ্কার অধিবাসী

[খ] 'গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।'

গিরি = গিরির অধিপতি।

[গ] 'বরোদার বদান্যতা' = বরোদার অধিপতির বদান্যতা।

[ঘ] '**ইংলণ্ড** ও **অষ্ট্রেলিয়ার** খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে।

প্রয়োজনমূলক :

[ক] 'বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা'—সত্যেন্দ্রনাথ

কমলার ফুল—শ্রীহট্টের প্রতীক, মধুকমালা—সাঁওতাল পরগণার প্রতীক।

[খ] 'বোতলেই তাহার সর্ব্বনাশ করিল। বোতলেই = মদেই।

[গ] পাণিনি আয়ত্ত করিয়াছ কি ?—পাণিনি = পাণিনি-রচিত ব্যাকরণ।

[ঘ] '**চতুর্দ্দশ বৎসরের** একগাছি মালা' —রবীন্দ্রনাথ

—লক্ষণা প্রয়োগে এখানে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা।

[ঙ] 'বিনা উপকারে খায় ধুতি'—ধুতি = বিবিধ ঘুষ।

আরোপোক্তি বা উপচার বিশেষণ

'লক্ষণাশক্তির দ্বারা এক পদের বিশেষণ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অন্য পদে আরোপিত বা উপচারিত হইয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তাহার নাম আরোপোক্তি অলঙ্কার' (কাব্যশ্রী) :

[ক] গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন **ক্লান্ত** বরষের
সর্ব্বশেষ গান। —রবীন্দ্রনাথ

—'ক্লান্ত' প্রকৃতপক্ষে 'হিয়া'র বিশেষণ, এখানে 'বর্ষ'-এর উপর আরোপিত হইয়াছে, অতএব ইহা আরোপোক্তি বা উপচরিত বিশেষণ।' তেমনই,

[খ] স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে,
বিবশ প্রহর অচল **অলস** আবেশে। —রবীন্দ্রনাথ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'লক্ষ্যোক্তি' নামকরণের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহা যে অন্য অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজি অলঙ্কারের মত কতকগুলি

অলঙ্কার যে বাঙলাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন : 'আমাদের অলঙ্কার-পরিভাষায় বাঁধা যায় না এমন কতকগুলি পাশ্চাত্য অলঙ্কারের প্রচুর প্রয়োগ রয়েছে আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে' (অলঙ্কার চন্দ্রিকা) এবং 'কয়েকটি পাশ্চাত্য অলঙ্কার'—এই অধ্যায়ে নূতন নাম দিয়া তাহাদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন Metonymyকে তিনি বলিয়াছেন **'অনুকল্প'**, Synecdoche-কে বলিয়াছেন, **'প্রতিরূপক'**, । Transferred epithet-কে বলিয়াছেন, **'অন্যাসক্ত'** ।

বস্তুতঃ কতগুলি নূতন নূতন অলঙ্কার যে বাঙলাভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'আরোপোক্তি' অলঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু উদাহরণ দেন নাই : তাহা হইতেছে ইংরাজির Personification অলঙ্কার। 'Personification consists iu *attributing life and mind* to imanimate things' (Bain): এই ধরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত বাঙলায় রহিয়াছে। ডাঃ সুধীরকুমার বলেন, 'প্রায়ই অচেতনে চেতনের ধর্ম্ম আরোপ করা হয়, সেই অর্থে ইহা খানিকটা সমাসোক্তি জাতীয়, কিন্তু সমাসোক্তি নহে'। আবার ইহা ঠিক Transferred Epithet-ও নয়, কারণ Transferred Epithet হইতেছে 'shifting of an epithet from its proper subject to some allied subject or circumstances, যেমন, Idle bed ('শুয়ে আছি **অলস শয্যায়**')। Personification অলঙ্কারটি 'আরোপোক্তি'র পর্য্যায়ভুক্ত, ইহাতে বিশেষ ভাবে অচেতন পদার্থে মনুষ্যধর্ম্মারোপ হয় : ইহার সহিত Personal Metaphor-এর সাদৃশ্য আছে।

[ক] 'ঝঞ্ঝাঘন **গরজন্তি** সন্ততি'—বিদ্যাপতি

[খ] নিমিষেকে **জোড়ে** মেঘ গগনমণ্ডল—কবিকঙ্কণ

[গ] **মুদিলা** সরসে **আঁখি বিরসবদনা** নলিনী। —মধুসূদন

[ঘ] আকাশে **হেলান দিয়ে ঘুমায়** পর্ব্বত। —গোবিন্দলাল

[ঙ] চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো **ঢালিয়া দিল**—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে **ভিজিয়া উঠিল**।

—এগুলিকে ঠিক প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষাও বলা চলে না। কারণ, আরোপগুলিতে কোন সংশয় প্রকাশ পায় নাই, যেমন সংশয় পাইয়াছে এই বর্ণনাটিতে :

মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত **যেন** রুদ্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই **যেন** অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।' —রবীন্দ্রনাথ

[ঙ] সংসৃষ্টি ও সঙ্কর অলঙ্কার

সকল অলঙ্কারের আলোচনা অন্তে এই দুইটি অলঙ্কারের আলোচনা অপরিহার্য্য। কবিগণ যখন কাব্য সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারা অলঙ্কার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অলঙ্কার সৃষ্টি করেন না, রসসৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা হওয়ায় অলঙ্কার স্বেচ্ছায় আসিয়া কবি-রঙ্গ-নাট্যশালায় ভিড় করে। এইজন্য একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের সমাবেশ হয়। আলঙ্কারিকগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন: অলঙ্কারের এই মিশ্রণহেতু চারুত্বও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা পরিশেষে একটি মিশ্র-অলঙ্কারের নাম নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার সাধারণ নাম সঙ্কর অলঙ্কার।

'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে সঙ্কর অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে: আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন বলেন, যেখানে একটি অলঙ্কার অন্য একটি অলঙ্কারের ছায়া গ্রহণ করে, তাহাই সঙ্কর অলঙ্কার ('যদালংকারোঽলঙ্কারান্তরছায়ামনুগৃহ্লাতি' ধ্বন্যালোক, বৃত্তি, ১/১৩)। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত সঙ্কর অলঙ্কারের বিস্তৃত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার চারিটি প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিশ্র অলঙ্কারের দুইটি প্রধান ভেদ (১) একই স্থলে দুই বা ততোধিক অলঙ্কারের পরস্পর নিরপেক্ষভাবে অবস্থান এবং (২) দুই বা ততোধিক অলঙ্কারের একস্থলে দুধ ও জলের ন্যায় আত্যন্তিক সংশ্লিষ্টতা। মিশ্র-অলঙ্কারের এই দুইটি প্রকারভেদই—সংসৃষ্টি ও সঙ্কর অলঙ্কার।

সংসৃষ্টি অলঙ্কার

একাধিক অলঙ্কার একই রচনায় পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া বিরাজ করিলে সংসৃষ্টি অলঙ্কার হয়।[১] ইহাতে (১) একাধিক শব্দালঙ্কার, (২) একাধিক অর্থালঙ্কার, কিংবা (৩) একাধিক শব্দ ও অর্থালঙ্কারের মিশ্রণ থাকে। অলঙ্কারগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান করে, যেমন রসায়ন-শাস্ত্রের সাধারণ মিশ্রণ (Mechanical mixture): অতি সহজেই প্রত্যেকটি উপাদানকে মিশ্রপদার্থ হইতে পৃথক করা সম্ভব। তেমনই একটি রচনায় অলঙ্কারগুলির সাধারণ মিশ্রণ হইলে এবং তাহাদিগকে অতি সহজে পৃথক করিয়া লওয়া সম্ভব হইলে অলঙ্কার হয় সংসৃষ্টি। যথা:—

[ক] ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুড় দুড়॥—কবিকঙ্কণ

১ 'মিথ অনপেক্ষৈতেষাং স্থিতিঃ সংসৃষ্টিরুচ্যতে'—সাহিত্যদর্পণ

—এখানে (১) অনুপ্রাস ও (২) ধ্বন্যুক্তির সংসৃষ্টি। প্রথম পংক্তিতে 'ম' ও 'ঘ' ধ্বনির দ্বিরাবৃত্তিতে 'বৃত্ত্যনুপ্রাস', দ্বিতীয় পংক্তিতে 'তুড়তুড়' শব্দে ধ্বন্যুক্তি। দুই-ই নিরপেক্ষ ভাবে বর্ত্তমান। এখানে দুইটি শব্দালঙ্কারের সংসৃষ্টি।

[খ] ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পাবে?
বর্ণহারে বর্ণিবারে সদা বর্ণ হারে।—ঈশ্বরগুপ্ত

—প্রথম পংক্তিতে 'ইচ্ছা' শব্দের একার্থে দ্বিরাবৃত্তিতে লাটানুপ্রাস। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'বর্ণহাবে' দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে ভিন্নার্থে—(১) বর্ণহারে= বর্ণমালায়, (২) বর্ণ হাবে=বর্ণ পরাজিত হয়, অতএব অলঙ্কার যমক। এখানে শব্দালঙ্কারের সংসৃষ্টি।

[গ] সেই অপদার্থ চায় কন্যারত্নে মোর
ভার্য্যারূপে লভিবারে! এত স্পর্দ্ধা তাব!
বামন হইয়া চায় ধরিবাবে চাঁদ
ক্ষুদ্র বাহু মেলি! —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে একই আধারে (১) রূপক ও (২) নিদর্শনা অলঙ্কারের সংসৃষ্টি। 'কন্যারত্ন' রূপক। দ্বিতীয়তঃ অপদার্থেব কন্যাবত্ন লাভ করার সহিত বামনের চাঁদ ধরাব কল্পনায় হইয়াছে অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধেব '**নিদর্শনা**'।

[ঘ] ঝম্‌ঝম্-ছন্‌ছন্-ঝনন্‌ঝনন্—দম্‌দম্-দ্রিম্‌দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, বীণা কখনও কাঁদে, কখনও রাগিয়া উঠে, কখনও নাচে, কখনও আদর করে, কখনও গর্জ্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। —বঙ্কিমচন্দ্র

—এখানে প্রথম অংশে স্পষ্ট ধ্বন্যুক্তি, দ্বিতীয় অংশে অচেতন বীণায় চেতনধর্ম্ম আরোপিত হওয়ায় হইয়াছে 'অন্যাসক্ত' (আরোপোক্তি); শব্দা-লঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সংসৃষ্টি।

সঙ্কর অলঙ্কার

একাধিক অলঙ্কার একই রচনায় (একাশ্রয়ে) যদি অঙ্গাঙ্গী হইয়া এমন ভাবে অবস্থান করে, যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কোন্‌টি প্রধান—তাহা হইলে হয় **সঙ্কর** অলঙ্কার। ইহাতে একাধারে দুইই প্রধানভাবে দোদুল্য-মান, যেন দুধ ও জলের একত্র মিশ্রণ, কোনটিকেই কোনটি হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। এই প্রকারের অলঙ্কারে কোথায়ও দেখা যায়, একটি আর একটির উপকারক হইয়া অবস্থান করে, কোথায়ও বা একেবারে

নীর-ক্ষীরের মত মিশিয়া থাকে। ইহাতে একটিকে অন্যটি হইতে কোনক্রমেই প্রধান বলা চলে না—দুইয়েরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল যুক্তি থাকে। যথা,—

[ক] চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ-সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। —বঙ্কিমচন্দ্র

--চন্দ্রশেখর নিদ্রিত শৈবলিনীকে দেখিতেছেন : কিন্তু কি দেখিতেছেন? —একটি 'পদ্ম'। উপমেয়কে উপমান গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অতএব অলঙ্কার অতিশয়োক্তি। কিন্তু 'গৃহ-সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে' ইহা তো পরম্পরিত রূপক। দুইদিকেই প্রবল যুক্তি। সন্দেহ -ইহা রূপক, না অতিশয়োক্তি? ইহা সঙ্কর অলঙ্কার।

[খ] পুণ্য অদ্রিপদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন। —নবীনচন্দ্র

'পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন'—ইহা কি পুষ্পপাত্ররূপ বৃন্দাবন? রূপক? না, 'পুষ্পপাত্রের মত পবিত্র সুন্দর বৃন্দাবন'—উপমা? আরও একটি সংশয়, অদ্রিপদতলে পুষ্পপাত্রের অবস্থিতি কি সম্ভব? -ইহা কি উৎপ্রেক্ষা নয়? —'পুণ্য অদ্রি-পদতলে বৃন্দাবন যেন পুষ্পপাত্র'। একাধারে তিনটি অলঙ্কারের অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রধান হইয়া অবস্থান : অলঙ্কার সঙ্কর।

[গ] কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥ —ঈশ্বর গুপ্ত

এখানে (১) অনুপ্রাস ও (২) শ্লেষ—এই দুইটি শব্দালঙ্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ 'প্ত' ধ্বনিটি সংযুক্ত অবস্থায় দুইবার ধ্বনিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হইয়াছে, দ্বিতীয় চরণে 'প্রভা' শব্দটি একই অর্থে একাধিকবার পুনরাবৃত্ত হওয়ায় লাটানুপ্রাস হইয়াছে। তৃতীয়তঃ ইহাতে আছে একটি শ্লেষ—'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর'—ইহার এক অর্থ, ঈশ্বর (ভগবান) গুপ্ত নহেন, তিনি চরাচরব্যাপ্ত, দ্বিতীয় অর্থ কবি ঈশ্বর (গুপ্ত)ও গুপ্ত নহেন -তাঁহার বিশ্বব্যাপ্ত খ্যাতি। প্রথম চরণের শ্লেষ দ্বিতীয় চরণেও প্রবেশ করিয়াছে। অলঙ্কার সঙ্কর।

[ঘ] নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়া-মৃগীকে রাজা চকিতে দেখতে পাচ্ছেন।

—এখানে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সঙ্কর হইয়াছে : ইহাতে আছে (১) অনুপ্রাসের ঘটা ও (২) রূপকের বিন্যাস। প্রথমতঃ, 'ন', 'ব' ধ্বনির বহুবার আবৃত্তিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস : দ্বিতীয়তঃ 'নন্দিনীর'—'নীর'—'যৌবনের'—'নের',

নবীনের 'নের'—ক্রমসাদৃশ্য অনুসারে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস ; আবার 'নিবিড়'-এর 'নিবি' ও যৌবনের 'বনে'তে আছে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছের স্বরূপ সাদৃশ্যানুসারে দ্বিরাবৃত্তি—ইহাও বৃত্ত্যনুপ্রাস। দ্বিতীয়তঃ—'যৌবনের ছায়া-বীথিকায় নবীনের মায়ামৃগী'তে রহিয়াছে রূপক (পরম্পরিত)। অনুপ্রাস রূপকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অলঙ্কার সঙ্কর।

[ঙ] 'এই রমণী চন্দ্রবদনা অসিতপদ্মনয়না'।

—চন্দ্রই ইহার মুখ অথবা তদ্বৎ মুখ ; পদ্মই ইহার নয়ন অথবা তদ্বৎ নয়ন—এইভাবে এস্থলে 'রূপক' ও 'উপমা' দুইয়েরই উল্লেখ হইতে পারে, দুই পক্ষই সমান প্রবল। অলঙ্কার সঙ্কর।

[চ] মেঘ দেখে তুই করিস্‌নে ভয়
আঁড়ালে তার সূর্য্য হাসে
হারা শশীর হারা আলো
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

—সাধারণ ভাবে দেখিলে ইহা দৃষ্টান্ত অলঙ্কার ; মেঘের আড়ালে সূর্য্য হাসে, শশীর হারা আলো অন্ধকারেই ফিরে আসে। কিন্তু এ বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক : প্রাসঙ্গিক প্রস্তুত বিষয়টি হইতেছে—দুঃখের মধ্যেই সুখ আসে : অতএব অলঙ্কার অপ্রস্তুতপ্রশংসা। দৃষ্টান্তটি অপ্রস্তুতপ্রশংসায় অবসিত হইয়াছে।—অলঙ্কার সঙ্কর

[চ] অলঙ্কার বিচার

অলঙ্কার বিচার করিবার সময় সকল দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণ অলঙ্কার বিচার করিতে গোলযোগ উপস্থিত হয় না, কারণ তাহাতে একটিই মাত্র অলঙ্কার থাকে। কিন্তু যেখানে একাধিক অলঙ্কারের মিশ্রণ থাকে, তাহা সাবধানে বিচার্য্য। আমরা নিম্নে কয়েকটি অলঙ্কারের বিচার-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতেছি :—

[ক] প্রীতি-মন্ত্রবলে
শান্ত কর, বন্দী কর নিন্দা-সর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

—'নিন্দা' সর্পরূপে কল্পিত হওয়ায় প্রীতি মন্ত্র-রূপে, হাস্যমুখ বংশীরব রূপে কল্পিত হইয়াছে। অলঙ্কার পরম্পরিত রূপক। 'ন্ত' ও 'ন্দ' ধ্বনির অনুপ্রাসও লক্ষণীয়।

[খ] কাচ পড়ে থাকে যেথানে সেথানে
ফিরেও দেখে না কেহ,
হীরকখণ্ড লভিতে সবার কতই না আগ্রহ।

–কাচ ও হীরক-ঘটিত বিষয়টি প্রধান বক্তব্য নয়, বক্তব্য—'লোকে ভাল জিনিষের আদর করে, মন্দ জিনিষকে পরিহার করে'—এই সামান্য উক্তিটি। অলঙ্কার অপ্রস্তুতপ্রশংসা।

[গ] ঝরণার ধারা নয় ওতো নয়
চেয়ে দেখ ভাল করে,
কার মণিহার ছিঁড়ে গেছে তাই
মণিরাশি ঝরে পড়ে।

-উপমেয় ঝর্ণাধারাকে অপহ্নব করিয়া, উপমান মণিহারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অলঙ্কার—অপহ্নুতি।

[ঘ] বসুন্ধরা দিবসের কর্ম্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

--'বসুন্ধরায়' উদাসীন রমণীর ব্যবহার আরোপিত হওয়ায় অলঙ্কার—সমাসোক্তি।

[ঙ] পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥ -কৃত্তিবাস

—প্রথম চরণে 'পদ্মালয়া পদ্মমুখী'তে আছে লাটানুপ্রাস : পদ্মমুখী লুপ্তোপমা—'পদ্মের মত মুখ' : প্রথম চরণ দুইটি মিলাইয়া বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা—'বুঝি' উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ। দ্বিতীয় দুই চরণে অলঙ্কার রাহুপক্ষ হইতে ভ্রান্তিমান।

[চ] সুদূর গোঠেব শ্যাম-বার্তা কি
স্মরিছে রে বার্তাকু!
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু।

—'সু', 'শ্যা' ও 'স্ম' তে শ্রুত্যনুপ্রাস : বার্তা (সংবাদ), বার্তাকুর 'বার্তা' নিরর্থক ; এইদিক হইতে অলঙ্কার যমক : আবার 'বার্তা কি', 'বার্তা কু'তে—অলঙ্কার ছেকানুপ্রাস। প্রস্তুত বিষয়টিতে একটি পৌরাণিক বিষয়ের স্মরণ প্রসঙ্গও রহিয়াছে ; ইহাকে 'স্মরণ' অলঙ্কার বলে। আবার শেষ দুই পংক্তিতে অলঙ্কার অতিশয়োক্তি : উপমেয়কে গোপন করিয়া এখানে উপস্থিত উপমান 'কচি বুক' : 'ফলে ফালা'র মধ্যেও ছেকানুপ্রাস রহিয়াছে। 'চাকু'তে কসাইরূপী মনুষ্য-ব্যবহারের আরোপে ইহাতে 'সমাসোক্তি'ও হইয়াছে।

[ছ] তার চেয়ে এসো প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূরে দূরে
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।

—'জড়ায় জড়ির ডুরে'—অলঙ্কার ছেকানুপ্রাস : য, ও জ-এ শ্রুত্যনুপ্রাস : ইহা হইতে প্রধান হইয়াছে—'বাঁকা নদীতে নায়িকা ব্যবহার আরোপ করাতে 'সমাসোক্তি'। কিন্তু 'এহো বাহ্য' : কবির প্রকৃতিকেই বড় ভাল লাগিতেছে, 'তার চেয়ে' কথাটির মধ্যে ব্যঞ্জনা রহিয়াছে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কারের : বক্তব্যটির মধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে সংসারের স্বার্থপরতা হইতে প্রকৃতির উৎকর্ষ।

[জ] হে ভৈরব, যে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

—ছন্দটির মধ্যে রহিয়াছে শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের ঘটা : ধ্বনি-সৌন্দর্য্য যেমন উপভোগ্য, তেমনই উপভোগ্য, অচেতন বৈশাখে, চেতন রুদ্রের ধর্ম্মগুলির আরোপে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য : কিন্তু সমাসোক্তিও এখানে অবসিত হইয়াছে রূপকের মধ্যে : বৈশাখ এখানে ভৈরবরূপী। এখানে অলঙ্কারগুলির অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাব। অলঙ্কার সঙ্কর।

[ঝ] তব হে জনম অতি বিপুলে।
ভুবন-বিদিত অজের কুলে॥
জনক-দুহিতা বিবাহ করি।
তাহাতে ভাসালে যশের তরী॥

—ইহা রামচন্দ্রের প্রতি বালকগণের উপহাস। আপাত দৃষ্টিতে ইহা নিন্দা : রামচন্দ্রের জন্ম অজের কুলে (ছাগ-বংশে), সহোদরা ভগ্নীকে (জনক-তনয়াকে) বিবাহ করিয়া তিনি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 'কাকু'র সাহায্যে নিন্দা আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই নিন্দার মধ্যে আবার প্রশংসাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে : ভুবনবিদিত অজ-রাজার বংশে রামচন্দ্রের জন্ম, জনক-দুহিতা সীতাকে বিবাহ করিয়া তিনি অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অতএব ইহা 'ব্যাজস্তুতি' অলঙ্কার (নিন্দা স্থলে প্রশংসা)। কিন্তু ইহাকে শ্লেষও বলা চলে। শ্লেষ-বক্রোক্তির সাহায্যেই 'ব্যাজস্তুতি' অলঙ্কারটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব অলঙ্কার সঙ্কর।

১

ধ্বনি

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে 'ধ্বনি'বাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ধ্বনি-প্রস্থানের প্রথম আচার্য্য কে, তাহা আজও নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হয় নাই: 'ধ্বন্যালোক' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থখানিই ধ্বনিবাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহা চারিটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি উদ্দ্যোতে তিনটি করিয়া অংশ—(১) কারিকা, (২) বৃত্তি ও (৩) টীকা। কারিকায় রহিয়াছে কবিতাকারে গ্রথিত কতগুলি সূত্র; বৃত্তিগুলি এই সূত্রের ব্যাখ্যা; টীকা—সূত্র ও বৃত্তির বিস্তৃত ভাষ্য। সাধারণতঃ কাবিকা ও বৃত্তি —একই লেখকের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই গ্রন্থেব স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যাহাতে কারিকা ও বৃত্তি দুই বিভিন্ন লোকের রচনা বলিয়া মনে হয়। বৃত্তি 'রাজানক' শ্রীআনন্দবর্দ্ধনেব (৮৫৫—৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) রচনা এবং টীকা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅভিনবগুপ্তের (খ্রীষ্টীয় দশম—একাদশ শতাব্দী) রচনা। এই টীকা, 'লোচনটীকা' নামে বিখ্যাত। সম্ভবতঃ অভিনব গুপ্তের পূর্ব্বে 'চন্দ্রিকা' নামে ধ্বন্যালোকের আরও একখানি টীকা রচিত হইয়াছিল; তাহা আজিও উদ্ধার হয় নাই: অভিনবগুপ্তের লোচনটীকা যে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহা অভিনবগুপ্তেব নিজস্ব উক্তি হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে:

কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।

তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥ (টীকা ১/১৯)

—'লোচন' বিনা কি কেবল 'চন্দ্রিকা' দ্বারাই 'আলোক' (=ধ্বন্যালোক) উদ্ভাসিত হয়? সেইজন্যই অভিনবগুপ্ত লোচন-উন্মীলন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে কাব্যের আত্মতত্ত্ব বিষয়ে নানারূপ মতবাদ প্রচলিত ছিল। কেহ অলঙ্কারকে, কেহ রীতিকে, কেহ বা রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ধ্বনিবাদের আচার্য্যগণ সেখানে প্রচার করিলেন, 'ধ্বনি'ই কাব্যের আত্মা: 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'। অবশ্য তাঁহারাও রসের

কাব্যাত্মত্বকে স্বীকার করিলেন, বলিলেন, রস ছাড়া কাব্যই হয় না ('ন হি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি'—টীকা): যথাক্রমে করুণ ও শান্তরস প্রধান হইয়াছে বলিয়াই রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেষ্ঠ কাব্য: রামায়ণে তো শোকই শ্লোক হইয়া উঠিয়াছে ('শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ')। তাহা হইলে রসে ও ধ্বনিতে পার্থক্য কি? ধ্বনিবাদিগণ বলিলেন, রসই ধ্বনি—রসই সর্বোত্তম ব্যঙ্গ্য, 'স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ'। কাব্যের আত্মা-স্বরূপ 'ধ্বনি' একটি ব্যাপক সংজ্ঞা, 'রস' তাহার প্রকারভেদ, শুধু তাই নয়, 'রসধ্বনি'ই শ্রেষ্ঠ ধ্বনি। 'অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' বলে যাঁরা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা 'রস' বলে তাঁরা উপসংহার করেছেন।'[১]

ধ্বনির স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ

ধ্বনির স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ অনুধাবন করিতে হইলে শব্দ ও অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। শব্দার্থই কাব্যশরীর। শব্দের সহিত অর্থের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে: শব্দকে অর্থ হইতে বা অর্থকে শব্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, ইহা যেন শিব-শক্তির যুগনদ্ধ মূর্তি। শব্দ ও অর্থের এই সম্পর্ক শব্দ-শক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকগণ শব্দের দুইটি শক্তিকে স্বীকার করিযাছেন—**অভিধা ও লক্ষণা**।

একটি শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রচলিত, সুবিদিত অর্থ প্রকাশ পায়; 'জনক' এই শব্দটি উচ্চারিত হইলেই, 'যিনি জন্ম দেন', তাহাকেই বুঝায়। ইহাই 'জনক' শব্দটির মুখ্যার্থ। যে শক্তিবলে একটি শব্দ এই মুখ্যার্থ প্রকাশ করে, তাহাকে **অভিধা-শক্তি** (Power to express the literal sense) বলে। শব্দটিকে বলা হয় বাচক বা অভিধায়ক, অর্থটিকে বলা হয় **বাচ্যার্থ** বা মুখ্যার্থ বা অভিধেয়। বাচ্যার্থ সর্ব্বদাই লোকপ্রসিদ্ধ কিংবা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, কিংবা ব্যুৎপত্তিগত ও লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। 'পঙ্কে **পঙ্কজ** প্রস্ফুটিত হয়'—ইহার বাচ্যার্থ 'পাঁকে পদ্মফুল ফোটে': তেমনই '**নগাধিরাজ হিমালয়**' বলিলে 'পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়'—এই বাচ্যার্থই প্রকাশ করে।

অভিধাশক্তি ও বাচ্যার্থ

কোথায়ও আবার দেখা যায়, কোন বাক্যের কোন শব্দের বাচ্য

[১] কাব্যজিজ্ঞাসা—অতুল গুপ্ত।

অর্থটির দ্বারা সেই শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না,—ব্যাচ্যার্থ ধরিলে সমগ্রভাবে অর্থটি সঙ্গতিহীন বলিয়া মনে হয়; যেমন, 'তুমি পাণিনি পড়িয়াছ কি?' 'পাণিনি' বিখ্যাত বৈয়াকরণের নাম, তাহাকে তো পড়া যায় না। অতএব এখানে অর্থ করিতে হয়—'পাণিনি রচিত ব্যাকরণ'। কোন বাক্যে প্রযুক্ত কোন শব্দের বাচ্যার্থ বাধিত হইলে, তৎসংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ ধরিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। ইহাকে বলা হয়—**লক্ষণা**। লক্ষণাও শব্দশক্তি, ইহা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থ স্থলে গৌণ-অর্থটি বোধিত হয়: শব্দটিকে বলা হয় 'লক্ষক' এবং লক্ষণাশক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাকে বলা হয় **লক্ষ্যার্থ** (Indirect or Secondary meaning): লক্ষ্যার্থও রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে দুই প্রকার, যেমন, '**কলিঙ্গ** (=কলিঙ্গবাসী) সাহসিক'—ইহা রূঢ়ি-লক্ষণা। 'তিনি এ গাঁয়ের **মাথা**' (=মোড়ল)—ইহাকে বলা হয় প্রয়োজন-লক্ষণা: বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে এখানে গৌণ অর্থটি অনুমান করিয়া লইতে হয়।

লক্ষণা শক্তি ও লক্ষ্যার্থ

ইহা ছাড়াও কেহ কেহ শব্দের আর একটি শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইতেছে শব্দের তাৎপর্য্য শক্তি। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দের পরস্পর অন্বয়বোধ দ্বারা সামগ্রিকভাবে যে অর্থ বোধিত হয়, তাহাই তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা শব্দসমূহের অন্বয় করিয়া বাক্যের অর্থটি গৃহীত হয়। যেমন, 'ক্ষুধার্ত্ত সাহেব ছুরীকাঁটা লইয়া **খানায়** বসিয়াছেন': 'খানা' শব্দের দুইটি অর্থ—(১) পরিখা, (২) আহার ক্রিয়া, এখানে 'ক্ষুধার্ত্ত' ও 'ছুরীকাঁটা' শব্দসান্নিধ্যে দ্বিতীয় অর্থ বুঝাইতেছে: এইভাবে সমগ্র উক্তি হইতে অন্বয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই তাৎপর্য্যার্থ: শক্তিটিকে বলা হয় তাৎপর্য্য শক্তি।

তাৎপর্য্য শক্তি

অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য্য—শব্দের এই তিনটি শক্তি এবং যথাক্রমে বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও তাৎপর্য্যার্থ—শব্দের এই তিন প্রকার অর্থ ব্যতীত শব্দের আর অন্য কোন শক্তি বা অর্থ কেহই স্বীকার করেন নাই। আর এই তিন প্রকার অর্থই কোন না কোন প্রকারে বাচ্যার্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। বাচ্যার্থ,—বাচ্যার্থ বাধিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যার্থ বোধ হয়; অতএব লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থেরই একপ্রকার সম্প্রসারণ মাত্র। ধ্বনিবাদের সমর্থক আচার্য্যগণ দেখিলেন, এই প্রকারের বাচ্যার্থ দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। বাচ্যার্থের চারুত্বসম্পাদক বাচ্যালঙ্কার দ্বারা মণ্ডিত হইলেও

বাক্য কাব্যত্ব লাভ করে না: কাব্য-ব্যাপার ইহাদের অতিরিক্ত অন্য কিছু। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া একটি 'লাবণ্য' বর্ত্তমান থাকে: তাহা কাব্য-দেহকে আশ্রয় করিলেও দেহাতিরিক্ত, তাহা নিজ অঙ্গপ্রভায় নিজেই ঝলমল করে। ইহা সহৃদয়জনের আহ্লাদকর। প্রচলিত শব্দশক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একপ্রকার শক্তি, পরমাহ্লাদজনক এই অতিরিক্ত অর্থকে দ্যোতিত করে। শব্দের এই তুরীয় শক্তির নাম ব্যঙ্গ্য বা ব্যঞ্জনা এবং এই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সামর্থ্যে যে অর্থ প্রকাশ পায় তাহা ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ। শব্দের এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি ধ্বনি-বাদীদের নবতম আবিষ্কার।

প্রতীয়মান অর্থ

ব্যঞ্জনা বৃত্তি ও ব্যঙ্গ্যার্থ (ধ্বনি)

অভিধা ও লক্ষণাশক্তি নিজ নিজ অর্থ বুঝাইযা ক্ষান্ত হইলে, যে শক্তি-সামর্থ্যে একটি শব্দ বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ (লক্ষ্যার্থও একপ্রকার বাচ্যার্থ, কারণ উহা বাক্যার্থেরই 'পুচ্ছভূত') অবলম্বন কবিয়া এতদুভয়ের অতিরিক্ত একটি নূতন অর্থের দ্যোতনা করে, তাহাই শব্দের **ব্যঞ্জনা** বৃত্তি।[১] এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি বা শক্তির সাহায্যে শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহার নাম **ব্যঙ্গ্যার্থ** বা **প্রতীয়মান অর্থ**। শব্দটি **ব্যঞ্জক**, অর্থটি **ব্যঙ্গ্যার্থ** বা **ব্যঙ্গ্য**। ইহা বাচ্যার্থ হইতে ভিন্ন, লক্ষ্যার্থ হইতে ভিন্ন; প্রতীযমান বলিয়াই ইহা স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। বাচ্য অর্থকে যে ভাবে জানা যায়, ইহাকে সেভাবে জানা যায না। মহাকবিদের বাণীতে এই মধুব প্রতীয়মান অর্থটি পরিস্ফুরিত হয়; 'অপূর্ব্ববস্তুনির্ম্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা' (কবি-প্রতিভা) এই বাচ্যাতিবিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থকে পরিস্ফুট করিতে পারে। বাচ্যার্থ অতিক্রমকারী এবং বাচ্যার্থ হইতে প্রধান এই যে প্রতীয়মান অর্থ, ধ্বনিবাদীরা ইহাকেই বলেন **ধ্বনি**:

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জ্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ সঃ ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥[২]

—'যেথানে কাব্যের অর্থ বা শব্দ আপনাদিগকে অপ্রধান করিয়া সেই প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, সেখানে সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্যবিশেষই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ধ্বনি বলিয়া কথিত হয়।' (ডাঃ সুধীরকুমার দাসগুপ্ত)

১। বৃত্তিনাং বিশ্রান্তেরভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণাখ্যানাম্।
অঙ্গীকার্য্যা তুর্য্যাবৃত্তির্বোধে রসাদীনাম্॥ —সাহিত্যদর্পণ (৫ম পরিচ্ছেদ)

২। ধ্বন্যালোক, কারিকা, ১।১৩

'ধ্বনি' একটি পারিভাষিক নাম। ধ্বনি বলিতে যেমন ধ্বনি-কাব্যকে বুঝায়, তেমনই কাব্যের ধ্বনি বলিতে বুঝায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত এবং বাচ্যার্থ হইতে প্রধান প্রতীয়মান অর্থ। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা: **'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ'** (ধ্বন্যালোক, ১।১)।

ধ্বনিবাদের বিরোধীমত ও তাহার খণ্ডন

ধ্বনিই কাব্যের আত্মা—এই মতবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ধ্বনির অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছিলেন, কেহ বলিতেন—শব্দের ভাক্তত্ব বা লাক্ষণিক অর্থের মধ্যেই ধ্বনি রহিয়াছে, আবার মনোরথ নামক এক ব্যক্তি কটাক্ষ করিয়াছিলেন,—যাহাতে সালঙ্কৃত বস্তু নাই, বাক্যের নৈপুণ্য নাই, যাহা বক্রোক্তিশূন্য, একমাত্র জড়মতি ব্যক্তিরাই তাহাকে ধ্বনি-সমন্বিত বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ধ্বনিবাদের আচার্য্যগণ অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া এই সকল প্রতিবাদী মত খণ্ডন করিয়া ধ্বনির অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং কাব্যাত্মত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, ধ্বনি প্রতীয়মান অর্থের দ্যোতনা করে, ইহা বাচ্য হইতে স্বতন্ত্র। যদিও বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়াই ধ্বনির ব্যঞ্জনা, তথাপি ইহা বাচ্যার্থাতিশায়ী। যেমন,

> হে ধার্ম্মিক, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই গোদাবরী তীরে অবস্থিত লতাকুঞ্জবাসী কুকুর এক দৃপ্ত সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।—(ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত শ্লোকের গদ্যানুবাদ)

—ইহা এক রুচিসম্পন্না নায়িকার উক্তি: একটি ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে। গোদাবরী তীরের এক রমণীয় লতাকুঞ্জে নায়িকাটি থাকিতেন। ব্রাহ্মণটি সেই কুঞ্জে আসিয়া গাছের ফুল তুলিয়া, লতা ছিঁড়িয়া

'ভম ধম্মিঅ' শ্লোকের প্রসঙ্গ

কুঞ্জের শোভা নষ্ট করিতেন। মহিলাটি ইহা পছন্দ করিতেন না, অথচ ব্রাহ্মণকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। সেই কুঞ্জে একটি কুকুর থাকিত, সে ব্রাহ্মণের কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিত। বিদগ্ধা মহিলা ধ্বনি-সমন্বিত এই উক্তিটি দ্বারা নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, হে ব্রাহ্মণ, এখন তুমি নিশ্চিন্তে লতাকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে পার, কারণ যে কুকুরটির ভয়ে তুমি লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিতে ভয় পাইতে, সে দৃপ্ত সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। 'ভ্রমণ করিতে পার'—ইহা বাচ্যার্থে **'বিধি'** বাচক। কিন্তু এই

বিধি তো অভিপ্রেত নয়। কুকুর নিহত হইয়াছে, কিন্তু লতাকুঞ্জে সিংহের আবির্ভাব হইয়াছে—অতএব, ব্রাহ্মণের আসা উচিত নয়—এই 'নিষেধ' এখানকার 'ধ্বনি' বা প্রতীয়মান অর্থ। প্রতীয়মান অর্থটিই এখানকার সৌন্দর্য্য : তাহা বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া অথচ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ অন্য অর্থের ব্যঞ্জনা করিতেছে। অতএব ধ্বনি যে আছে এবং তাহা যে কাব্য হইতে স্বতন্ত্র তাহা প্রমাণিত হইল।

লক্ষণা ও ধ্বনি

ধ্বনি যেমন বাচ্যার্থ হইতে ভিন্ন, তেমনি লক্ষ্যার্থ হইতেও ভিন্ন। লক্ষণাশক্তি শব্দের লক্ষ্যার্থ দেখাইয়াই বিশ্রান্তি লাভ করে আর ধ্বনি প্রতীয়মান অর্থের দ্যোতনা করে। যেমন, 'গঙ্গায় ঘোষেরা বাস করে,'—এখানে 'গঙ্গায়' বলিতে লক্ষণায় 'গঙ্গার সামীপ্য' বুঝায় : উহাতো বাচ্য গঙ্গারই পুচ্ছভূত, উহাতে ব্যঞ্জনা নাই। ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য **ব্যঞ্জনা** এবং বাচ্য হইতে উহার **সমধিক চারুত্ব**। লক্ষণা বাচ্যের সম্প্রসারিত অর্থ জ্ঞাপন করে ; ধ্বনি বাচ্য হইতে অতিরিক্ত এবং ভিন্ন অর্থ দ্যোতনা করে। অতএব শব্দের ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ কখনই ধ্বনি হইতে পারে না। ধ্বনি—অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য্যের অতিরিক্ত, ইহা **শব্দের এক চতুর্থ ব্যাপার**।

এইরূপে ধ্বনি যেমন বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ হইতে স্বতন্ত্র, তেমনই বাচ্য ও বাচকের চারুত্ব সম্পাদক 'বাচ্যালঙ্কার' হইতেও স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, বাক্যের চারুত্ব তো অলঙ্কার দ্বারাই বিহিত হয়। যাহাদ্বারা শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাই কাব্যের সারভূত পদার্থ। অলঙ্কারই সেই সার পদার্থ, 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ' অতএব ধ্বনির প্রতি অত্যধিক অনুরাগের কারণ কি? আর প্রসিদ্ধ প্রস্থানাতিরিক্ত (যেমন, অলঙ্কার-প্রস্থান, রীতি-প্রস্থান ইত্যাদি) অন্য একটি নাম (ধ্বনি) স্বীকার করারই বা সার্থকতা কি? —ইহার উত্তরে ধ্বনিবাদিগণ বলেন, একমাত্র ধ্বনিই সকল সৌন্দর্য্যের সারভূত, ইহা অঙ্গনাদিগের দেহলাবণ্যের ন্যায় সহৃদয়-হৃদয়-আহ্লাদকর। শুধু তাই নয়, ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, তাহাই অঙ্গী—অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি তাহার অঙ্গমাত্র। ধ্বনির প্রতি বা রসাকর্ষণের উপযোগিতা না থাকিলে অলঙ্কার অলঙ্কার মধ্যেই গণ্য হয় না। তাহা ছাড়া, সাধারণ বাচ্যালঙ্কারের ধ্বনন-যোগ্যতা নাই। ধ্বনি 'বাচ্য' হইতে অতিরিক্ত এবং তাহা হইতে সুন্দরতর, কিন্তু বাচ্যালঙ্কার বাচ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সাধারণ বাচ্যালঙ্কার দ্বিবিধ: অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার এবং উপমাদি অর্থালঙ্কার। ইহারা সকলেই নিজেদের রূপমাত্রে অবস্থিত, অতএব উহারা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নয়। কোন কোন অলঙ্কার যেমন শ্লেষ, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুত প্রশংসা, সঙ্কর প্রভৃতি অর্থান্তর জ্ঞাপন করে বটে, কিন্তু তাহাতে ধ্বনি (ব্যঙ্গ্য) থাকে না। ব্যঙ্গ্য সর্ব্বদাই বাচ্য হইতে প্রধান। যেখানে অর্থ ও শব্দ নিজেকে গৌণ করিয়া অপর অর্থ প্রকাশ করে তাহাই ধ্বনি।[১] বাচ্যালঙ্কারে শব্দ ও অর্থ তো গৌণ হয় না। কোন বাচ্যালঙ্কারই বাচ্য হইতে স্বতন্ত্র প্রতীয়মান অর্থের দ্যোতনা করে না, তাহা বাচ্য হইতে প্রধানও হয না। মনে হইতে পাবে সমাসোক্তি বা অপ্রস্তুত প্রশংসা বা সঙ্কর-অলঙ্কার বুঝি ধ্বনির দ্যোতক, কিন্তু তাহা নয়। যেমন:

বাচ্যালঙ্কার ও ধ্বনি

[ক] অতিশয় অনুরাগ বশে চন্দ্র, রাত্রির (সন্ধ্যার) বিলোল-তারক মুখখানি এমন ভাবে গ্রহণ করিলেন যে, তাহার সম্মুখে যে অন্ধকার নীলবসনখানি খসিযা পড়িল তাহা লক্ষ্যই করিলেন না।

[ধ্বন্যালোকেব কারিকায উদ্ধৃত শ্লোকের গদ্যানুবাদ]

—এখানে অলঙ্কার সমাসোক্তি। সমাসোক্তিতে বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষণ দ্বারা অন্য অর্থের প্রকাশ হয় এবং সংক্ষেপে অর্থের প্রকাশ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলিয়া থাকেন। আলোচ্য অংশে চন্দ্রে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে নায়ক ও নাযিকার ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই অলঙ্কার হইতে বাচ্য 'সন্ধ্যার আগমন' বর্ণিত হইয়াছে। বাচ্যার্থ ছাড়া এই বর্ণনায অন্য কোন প্রতীয়মান অর্থ নাই। অলঙ্কারটি বাচ্য হইতে প্রধানও নয়, বরং তাহার অনুগামী। অতএব ইহাতে ধ্বনি নাই: 'ব্যঙ্গ্যানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে সমারোপিত নাযিকানাযক ব্যবহারয়োর্নিশাশশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ।' (কারিকা, ১।১৪)

[খ] চন্দ্রবদনা, অসিতপদ্মনযনা, সিতকুন্দদন্তী এই রমণীকে বিধাতা আকাশ, জল ও স্থলের মনোহারী বস্তুদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

[লোচন টীকায উদ্ধৃত শ্লোকের গদ্যানুবাদ]

—এখানে সঙ্করালঙ্কার। একই রচনায দুইটি পৃথক্ অলঙ্কার সমান প্রাধান্য লইয়া বর্ত্তমান থাকিলে সঙ্কর অলঙ্কার হয়। আলোচ্য অংশে একটি রমণীর

১। 'অর্থো গুণীকৃতাত্মা গুণীকৃতাভিধেয়ঃ শব্দো বা যত্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি।'
—ধ্বন্যালোক, বৃত্তি ১।১৩।

সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনায়—'চন্দ্রবদনা', 'অসিত পদ্মনয়না,' 'সিতকুন্দদন্তী' প্রভৃতিকে রূপকও বলা চলে আবার উপমাও বলা চলে; দুয়েরই সমান প্রাধান্য। এখানেও ধ্বনি নাই, কারণ এখানে প্রতীয়মান কোন নূতন অর্থের ব্যঞ্জনা নাই এবং উপমা ও রূপক-এর মধ্যে কোন্‌টি প্রধান তাহারও সুনিশ্চিত কোন ইঙ্গিত নাই।

এইভাবে ধ্বনিকারগণ অন্যান্য বাচ্যালঙ্কারের উদাহরণ দিয়াও দেখাইয়াছেন যে, ধ্বনি (ব্যঙ্গ্য) এক স্বতন্ত্র বস্তু। প্রতীয়মান অর্থব্যঞ্জনাই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ; বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া ইহার প্রকাশ হইলেও ইহা বাচ্যাতিরিক্ত।

ধ্বনির স্বরূপ

ধ্বনি বাচ্য নয়, লক্ষ্যও নয়—ইহা ব্যঞ্জনা; ইহা অলঙ্কার নয়, অলঙ্কার্য্য; ইহা রমণীদেহের লাবণ্যের মত অবয়বাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য। এই ধ্বনিকে অনেকেই অনুধাবন করিতে পারেন না, কেহ কেহ ইহার অংশমাত্র স্পর্শ করেন 'ধ্বনিমার্গো মনাক্ স্পৃষ্টোঽপি ন লক্ষিতঃ'। মহাকবিদের সৎকাব্যে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে: যাঁহারা সহৃদয়, তাঁহারা অতি সহজে ইহার আস্বাদ লাভ করিতে পারেন। ধ্বনি সহৃদয়জনের আহ্লাদজনক: ইহা 'সহৃদয়শ্লাঘ্য', ইহাই কাব্যের আত্মা।

ধ্বনিবাদের ভিত্তি 'স্ফোট'

ধ্বনির অস্তিত্ব প্রতিপাদনে এবং ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় ধ্বনিবাদিগণ বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকদের অভিধা ও লক্ষণাবৃত্তিকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা 'ব্যঞ্জনা' নামে শব্দের এক নূতন শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। এই শক্তিদ্বারা বিজ্ঞাপিত শব্দার্থকে তাঁহারা বলিয়াছেন ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনি। ইহা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ইহা কাহারও অন্তর্ভুক্ত নয়, ইহা অঙ্গী। অলঙ্কার, রীতি, গুণ প্রভৃতি ইহার অঙ্গ। এই যে 'ধ্বনি'—ইহা বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান হয়। আলোকার্থী যেমন দীপশিখার প্রতি যত্নবান হইয়াই আলো লাভ করিতে সমর্থ হন, তেমনই বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান হইয়াই ব্যঙ্গ্যার্থে বা ধ্বনিমার্গে প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

'ধ্বনি' শব্দটি এবং এই ধ্বনির অনুভব কি ভাবে হয়, তাহার সূত্র—ধ্বনিবাদিগণ ব্যাকরণশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈয়াকরণেরা বলেন, একটি শব্দের অর্থবোধ শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণের সঙ্গে হয় না। শব্দে যে ধ্বনিপ্রবাহ থাকে, তাহা পর পর উচ্চারণ করিতে করিতে অন্ত্যবর্ণে

আসিয়া উপস্থিত হইলে শব্দটির সমগ্রতা অনুভূত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণ হইতে হইতে শেষ বর্ণের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চরম অনুভব জন্মে। তাই বৈয়াকরণেরা বলেন, অন্ত্যবর্ণের শব্দই (ধ্বনিই) শ্রূয়মাণ। ইহাকে তাঁহারা বলেন ধ্বনি। অন্ত্যবর্ণের শ্রূয়মাণ ধ্বনিদ্বারাই সমগ্র শব্দ, পদ ও পদার্থের বোধ হয়। 'শ্রোত্রে অনুভূত পদই **স্ফোট**'। অন্ত্যধ্বনির অনুরণনক্রমে স্ফোটের প্রতীতি হয় ('অন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য স্ফোট')। বস্তুতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভবক্রমে শেষ বর্ণটি ধ্বনিত হইবামাত্র যে বোধ হয়, তাহাই স্ফোট। ধ্বনি বা নাদ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের ধ্বনিকে নাদও বলা হয়) স্ফোটের অভিব্যঞ্জক।

অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণ ইহাই বলিতে চান যে, ব্যাকরণে যেমন চরম বর্ণের ধ্বনিটি প্রধান স্ফোটের দ্যোতক, ধ্বনিবাদেও তেমনই **বাচ্যার্থ** ব্যঙ্গ্যার্থের দ্যোতক। বাচ্যার্থ দ্বারাই কাব্যের আত্মা ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়:

যথা পাদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থ সম্প্রতীয়তে।
বাচ্যার্থ পূর্ব্বিকা তদ্বৎ প্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ॥ ধ্বন্যালোক, ১/১০,

[এই স্ফোটবাদের সহিত শৈব প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন বা শাক্ত-দর্শনের খুব মিল রহিয়াছে। ধ্বনিবাদের আচার্য্যগণ শৈব প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের সমর্থক। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত উভয়েই তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আচার্য্য অভিনব গুপ্তের 'তন্ত্রালোক' তান্ত্রিক দর্শনের বিখ্যাত গ্রন্থ। নিজস্ব জীবন-দর্শনের প্রভাব সাহিত্য সন্দর্শনেও যে প্রভাব বিস্তার করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমরা সেই দর্শনের আভাসমাত্র দিতেছি। এক এবং অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব (শক্তি-বিশিষ্ট শিব) স্বপ্রকাশ। পরানাদ ও বিন্দুর ক্রমাভিব্যক্তির ফলে শব্দব্রহ্মের উদ্ভব হয়, তাহাই স্থূলজগতের সৃষ্টির কারণ। এই শব্দব্রহ্মও নাদেরই একটি রূপভেদ মাত্র। দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থ এই

ধ্বনিতত্ত্ব

নাদরূপী শব্দব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত। মানব-দেহেও এই নাদ অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, বিশেষ ও স্পষ্ট 'তার' রূপে অবস্থিত। মানুষের কণ্ঠোচ্চারিত শব্দধ্বনি অতি স্পষ্ট নাদ—ইহাও সেই পরানাদের একটি রূপ মাত্র। এই শব্দরূপী নাদকে অবলম্বন করিয়াই সাধক পরানাদকে উপলব্ধি করেন। স্থূল-নাদের সহিত পরা-নাদের সম্পর্কটি ঘণ্টাধ্বনির অনুরণন সদৃশ। **স্ফোট** হইতেছে সেই চরম বোধ, অর্থাৎ পরতত্ত্বের বোধ। স্থূল শব্দধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াই সেই চরমবোধের অনুভব হয়। এখানেও তাই বলা হইয়াছে,

'নাদ (ধ্বনি) স্ফোটের অভিব্যঞ্জক'। এইভাবে ধ্বনিবাদের আচার্য্যগণ 'ধ্বনি'কে যেমন পরাধ্বনির (নাদের) দ্যোতক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনই আবার ধ্বনিকে চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত নয়ঃ শব্দাভিব্যক্তির যাবতীয় কারণ ধ্বনি। ব্যঞ্জক শব্দ ও অর্থও ধ্বনি। অভিধা, লক্ষণা, তাৎপর্য্যও ধ্বনি। তাহাদের সংযোগে যে কাব্য সৃষ্টি হয়, তাহাও ধ্বনি। ধ্বনি সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বান্তরাত্মা। তাই বলা হইতেছে, 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ']

ধ্বনির প্রকারভেদ

ধ্বনি দুই প্রকারের—(১) অবিবক্ষিত বাচ্য ও (২) বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য।

ধ্বনিবাদিগণ, অভিধেয় (বাচ্যার্থ) ধ্বনি নয়, লক্ষ্যার্থ ধ্বনি নয়, বাচ্যালঙ্কার ধ্বনি নয়,—এইরূপ নেতি নেতি করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং ব্যঙ্গ্যার্থই ধ্বনি—ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু ধ্বনি-সৃষ্টিতে যে বাচ্যার্থ তুচ্ছ নয়, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। দীপ যেমন নিজে প্রকাশিত হইয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, বাচ্যার্থও তেমনই নিজে প্রকাশিত হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থের দ্যোতনা করে। ব্যঙ্গ্যার্থকে কেহ কেহ তীরের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, 'সোঽযমিষোরিব দীর্ঘদীর্ঘতবোঽভিধাব্যাপারঃ'। শব্দ শুনিবামাত্র অর্থের প্রতীতি হইলেই অভিধার কার্য্য শেষ হয়, অভিধার এই সামান্য লক্ষণ, ধ্বনিবাদের অভিধা সম্পর্কে খাটে না। ধ্বনিসৃষ্টিতে অভিধার শক্তি অপরিসীমঃ একটি তীর যেমন একটি লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াও লক্ষ্যান্তর বিদ্ধ করিতে পারে, অভিধাও তেমনই নিজের বাচ্য অর্থটি প্রকাশ করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ আনয়ন করে। শব্দের লক্ষণাও অভিধার একপ্রকার সম্প্রসারণ মাত্র। এইজন্য যে সকল শব্দে উপচরিত বা লাক্ষণিক ব্যাপার থাকে, তাহাতেও ধ্বনির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অন্যপ্রকারে। ধ্বননব্যাপারে লক্ষণার লক্ষ্যার্থ একেবারেই অভিপ্রেত নয়, ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই কবির লক্ষ্য। এক্ষেত্রে শব্দের বাচ্যার্থই লক্ষণার পথে ব্যঞ্জনার অভিব্যঞ্জক হয়। বাচ্যার্থের এই দুই রূপ ভূমিকাই অবিবক্ষিত বাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য ধ্বনির ভিত্তি।

অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি

যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ একেবারেই অভিপ্রেত নয় (অ-বিবক্ষিত=অনভিপ্রেত), ব্যঙ্গ্যার্থই কবির অভিপ্রেত, সেখানে যে ধ্বনি থাকে, তাহাকে

বলা হয় **অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি**। এখানে বাচ্য লক্ষণার পথে ধ্বনির দ্যোতনা করে বলিয়া ইহাকে **লক্ষণামূল ধ্বনি**ও বলা হয়। যেমন,

[ক] বীর, কৃতবিদ্য ও সেবাপরায়ণ পুরুষেরাই **সুবর্ণপুষ্পা** পৃথিবী চয়ন করিতে পারেন।

—'সুবর্ণকে পুষ্পরূপে প্রসব করে'—ইহাই 'সুবর্ণপুষ্পা' শব্দটির অর্থ, কিন্তু বাক্যে এই অর্থ অসম্ভব। অতএব এই বাচ্যার্থ এখানে অবিবক্ষিত (অনভিপ্রেত): কবির অভিপ্রেত—বীর, কৃতবিদ্য ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তির প্রশংসা। এই অর্থটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই উহা সুন্দর। ইহাই এস্থলে **ধ্বনি**।

[খ] 'বিশ্বজয়ী ভাবুক কবি চক্ষে আঁকা **স্বর্ণ-ছবি**'—যতীন্দ্রপ্রসাদ

—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই উক্তি: 'স্বর্ণছবি' শব্দটি লক্ষণীয়। ইহার বাচ্যার্থ 'সোনার জলে আঁকা ছবি', চক্ষে কি এরূপ ছবি আঁকা থাকিতে পারে?—পারে না। তাই এই অর্থ কবিব অভিপ্রেত নয়। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ—রবি কবিব অসাধারণ 'কল্পনাপ্রবণতা'। অতএব ধ্বনি অবিবক্ষিত বাচ্য।

অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনিব আবার দুই প্রকারভেদ—(১) অর্থান্তরে সংক্রমিত ও (২) অত্যন্ত তিরস্কৃত। অবিবক্ষিত বাচ্যটি দুই প্রকারের হয় বলিয়াই ধ্বনির এই দুই প্রকারভেদ।

(১) **অর্থান্তরে সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি**: অর্থটি এখানে বাচ্যভাবেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু সমগ্রের সহিত বিচার করিলে তাহা অনুপযোগী বলিয়া মনে হয়। কাজেই বাচ্যভাবে উৎপন্ন হইলেও উহা বাচ্যার্থ না বুঝাইয়া অর্থান্তরের দ্যোতনা করে। বাচ্য অর্থেব নিজে উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও, যেখানে তাহা বিশেষভাবে অন্বয়বোধার্থ অন্য অর্থে প্রবেশ কবে, সেখানে হয় অর্থান্তরে সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি। যথা,—

[ক] রবিকিরণ দ্বারা গৃহীত হইলেই কমল **কমল**পদ বাচ্য হয়।

—দ্বিতীয় 'কমল'-এ অর্থান্তরে সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি: 'কমল' শব্দটিকে মুখ্য অর্থে গ্রহণ করিতে বাধা সৃষ্টি হওয়ায়, উহা একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। মুখ্য অর্থ এখানে একেবারে আচ্ছন্ন নয়।

[খ] হে **বিক্রম**, ক্ষান্ত কর এ সংহার খেলা!
এ শ্মশান নৃত্য তব থামাও থামাও;
নিবাও এ চিতা! —রবীন্দ্রনাথ

—'রাজা ও রাণী' নাটকের রাজা 'বিক্রম'এর উক্তি : 'বিক্রম' বলিতে বাচ্যার্থে রাজাকেই বুঝাইতেছে বটে। কিন্তু এ 'বিক্রম' কোন্ রাজা ? যিনি রাণী সুমিত্রার প্রেমে বিহ্বল, তিনি কি ? উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ইনি সে বিক্রম নহেন, ইনি সেই 'বিক্রম' যাঁহার প্রতিশোধ স্পৃহা উদ্দাম হইয়া উঠায় চারিদিকে সংহার লীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাই 'বিক্রম' সংজ্ঞার অর্থান্তরে সংক্রমণ : ধ্বনি অর্থান্তরে সংক্রমিত বাচ্য ধ্বনি।

অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি : যেখানে বাচ্যার্থ সর্ব্বপ্রকারে নিজের অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ বুঝায়, সেখানে মুখ্যার্থটি অত্যন্ত তিরস্কৃত (দূরীভূত) হওয়ায় ধ্বনির নাম হয় অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি।[১] যথা,—

[ক] **নিশ্বাসান্ধ** দর্পণের ন্যায় চন্দ্রমা প্রকাশিত হইতেছে না।

—ইহার সংস্কৃত রূপ—'নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে' (রামায়ণ) এখানে দর্পণের বিশেষণরূপে 'নিশ্বাসান্ধ'-এর বাচ্য অর্থ গ্রহণে বাধা হয় : ইহা লক্ষণায় দর্পণের 'অসাধারণ শোভাহীনতা'—এই প্রয়োজন প্রকাশ করিতেছে। মুখ্য অর্থ এখানে অত্যন্ত আচ্ছন্ন : ধ্বনি 'অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য।'

[খ] **অন্ধ** আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে
চলিয়াছি।

—ইহা রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি। ধৃতরাষ্ট্র বাহিরে অন্ধ, কিন্তু অন্তরে অন্ধ হওয়া তো সম্ভব নয়। লক্ষণায় 'অন্তরে অন্ধ' = বিচারবোধহীন। বাচ্যার্থ অত্যন্ত আচ্ছন্ন (তিরস্কৃত) হওয়ায় এখানে লক্ষ্যার্থই ব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ধ্বনি অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি

ইহা ধ্বনির অন্য এক প্রকারভেদ। কাব্যের শ্রেষ্ঠ ধ্বনি (রসধ্বনি) ইহারই অন্তর্ভূত। যদিও ধ্বনিবাদিগণ সাধারণ বস্তু ও অলঙ্কারকে ধ্বনি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহারা দেখিয়াছেন, বস্তু ও অলঙ্কারও ধ্বনির পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। বস্তু ও অলঙ্কার যখন ব্যঞ্জনার বিষয়ীভূত

---

১ 'যত্র পুনঃ স্বার্থং সর্ব্বথা পরিত্যজন্ অর্থান্তরে পরিণমতি, তত্র মুখ্যার্থস্য অত্যন্ত তিরস্কৃতত্বাদত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যত্বম্'—সাহিত্যদর্পণ' (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

হয়, তখন আর তাহারা সাধারণ বস্তু ও অলঙ্কার থাকে না, তখন তাহারা নিজেরাই ধ্বনি হইয়া উঠে। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির মধ্যে আলঙ্কারিকগণ ধ্বনির অনন্ত সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধ্বনি সৃষ্টিতে বাচ্যার্থের দুইটি ভূমিকা আছে: প্রথম ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ অ-বিবক্ষিত—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ বিবক্ষিত (অভিপ্রেত)। যে ধ্বনিতে বাচ্যার্থ বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) হইয়াও তাহা 'অন্য-পর' অর্থাৎ অন্য একটি অর্থকে প্রধান (পর) রূপে দ্যোতিত করে—সেখানে হয় **বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য** ধ্বনি। বিবক্ষা ও অবিবক্ষার মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। একটিতে বাচ্য অভিপ্রেত অর্থাৎ বাচ্যটিকে প্রকাশ করাও কবির উদ্দেশ্য; বাচ্যকে অবলম্বন করিয়াই এস্থলে ধ্বনির প্রকাশ ('ধ্বনিশব্দ-সান্নিধ্যাদ্বিবক্ষিতাভিধেয়ত্বেনান্যপরত্রমত্রাক্ষিপ্তমিতি' —লোচনটীকা, ২/২); কিন্তু অন্যটিতে বাচ্যকে প্রকাশ করা কবির লক্ষ্যই নয়। প্রথম প্রকারে অর্থাৎ বিবক্ষিত অন্য-পর বাচ্যধ্বনিতে, বাচ্য প্রদীপের মত নিজে প্রকাশিত হইয়া অন্যকে প্রকাশ করে। বাচ্য অবশ্য গৌণ, ব্যঙ্গ্যই প্রধান, তাই বাচ্যকে বলা হইতেছে 'অন্যপর'। বাচ্য এস্থলে বাচ্য হইয়াই থাকে কিন্তু আর একটি অর্থকে (ব্যঙ্গ্যার্থকে) প্রধান করিয়া তুলে। যেমন, রামপ্রসাদের এই পদ্যাংশটি:

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?'

—বাচ্য অর্থ এখানে অতি স্পষ্ট। কবি দুঃখকে ভয় পান না। কিন্তু এইখানেই কি ওই বক্তব্যের শেষ? উহা যে তীরের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে, এক লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে, আর একটিকেও ভেদ করিতে চায়: বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া দ্যোতনা করে 'দুঃখ-ক্লান্ত ভক্তের অসীম সহনশীলতা'। ইহাই এখানকার ধ্বনি। বাচ্য অর্থকে প্রকাশ করিয়াও কবি ওই দ্বিতীয় ব্যঙ্গ্যার্থকেই প্রধান করিয়াছেন। ইহা বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিরও দুই প্রকারভেদ—(১) **সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি** ও (২) **অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি**। এই ভেদটি কিন্তু ধ্বনির দিক হইতে; অর্থাৎ বাচ্যার্থ হইতে যে ব্যঙ্গ্যার্থ টি দ্যোতিত হইতেছে, তাহার ক্রম কি লক্ষ্য করা যায়? না, যায় না।

সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি:—যে বিবক্ষায় বাচ্যার্থ হইতে কিভাবে ধ্বনির দ্যোতনা হইতেছে, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য (পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ = consecutiveness)

লক্ষ্য করা যায়, তাহাকে বলা হয় **সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি**। ইহাকে 'অনুস্বান-সন্নিভ' ধ্বনিও বলা হয়। 'অনুস্বান' শব্দটির অর্থ অনুরণন, অতএব অনুস্বান-সন্নিভ মানে অনুরণনের মত। সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিটি অনুরণনের মত। কিভাবে বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থকে দ্যোতিত করে, শব্দশক্তি বা অর্থশক্তি দ্বারা এস্থলে তাহার ক্রমটি অনুধাবন (লক্ষ্য) করা সম্ভব,—তাই এই নাম। **বস্তুধ্বনি** ও **অলঙ্কারধ্বনি**—সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি।

অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি :—যে বিবক্ষায় (বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে) বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্ভবের ক্রমটি লক্ষ্য করা যায় না, তাহাকে বলা হয় **অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি**। এস্থলে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ যুগপৎ প্রকাশিত হয়। বাচ্যার্থ প্রকাশিত হইতে হইতেই চট্‌ করিয়া ব্যঞ্জনাবোধ্য ব্যঙ্গ্যটির প্রতীতি হয়। কেমন করিয়া, কখন যে বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থের দ্যোতনা করিল, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রমটি লক্ষ্যই করা যায় না। সেইজন্যই ইহার নাম অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি। সংক্ষেপে ইহাকে **অলক্ষ্যক্রম** বা আরও সংক্ষেপে ইহাকে **অক্রম** নামেও অভিহিত করা হয়। **ভাবধ্বনি** ও **রসধ্বনি**—অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি। এই প্রকারের ধ্বনিতেও যে ক্রম না থাকে তাহা নয়, ক্রম অবশ্যই থাকে: বিভাব প্রতীতি হইলে অনুভাব প্রতীতি হয়, তাহা হইতে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু একটি হইতে আর একটির প্রতীতি যেন মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া যায়। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন, একটি পদ্মের শত পত্র যেমন মুহূর্ত্তে বিদ্ধ হয়, তেমনই অলক্ষ্যক্রমধ্বনিতে বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্য অতি দ্রুত প্রতীত হয় ('উৎপলপত্রশতব্যতিভেদবৎ লাঘবাৎ ন সংলক্ষ্যতে'—সাহিত্যদর্পণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। অলক্ষ্যক্রম ধ্বনিই উৎকৃষ্ট ধ্বনি। আমরা একে একে ইহাদের উদাহরণ দিতেছি।

সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি

(১) বস্তুধ্বনি

প্রত্যেক কাব্যেই একটি 'বস্তু' (বিষয়বস্তু) থাকে। বাচ্যদ্বারাই সাধারণতঃ এই বস্তু বর্ণিত হয়। তাহা ধ্বনি নয়। বাচ্যাতিরিক্ত বিষয়ান্তরের অভিব্যঞ্জনাই ধ্বনি। ইহা অবয়বাতিরিক্ত এক লাবণ্য। বাচ্যার্থ হইতে ব্যঞ্জনায় এই ধ্বনি-লাবণ্যের প্রতীতি হয়। বাচ্য হইতে ব্যঞ্জনায় বাচ্যাতিরিক্ত বস্তু ব্যঞ্জিত হইলে হয় **বস্তুধ্বনি**। মনে রাখিতে হইবে, ব্যঞ্জিত পদার্থটি

বাচ্য হইতে প্রধান হওয়া চাই। বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্যের যদি অধিকতর চমৎকারিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহা ধ্বনিপদবাচ্য হয় না।

নানাভাবে বস্তুধ্বনি ধ্বনিত হইতে পারে। বাচ্যের 'বিধি', ব্যঙ্গ্যে 'নিষেধ' হইয়া বা 'নিষেধ' 'বিধি' হইয়া প্রধান হইলে বস্তুধ্বনি হয়। কখনও কখনও বাচ্য অলঙ্কার, বস্তুকে অভিব্যঞ্জিত করে। নিম্নে বস্তুধ্বনির কয়েকটি উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হইল :

[ক] করহ ভ্রমণ ওগো ধার্ম্মিক, গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে,
সেই যে শুনক নিহত সে আজ, দৃপ্তসিংহ এসেছে বনে।

—অংশটির যে প্রসঙ্গ : তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বাচ্য বস্তুরূপে আছে—'করহ ভ্রমণ'—এই বিধি : কিন্তু ব্যঞ্জনায় যে বস্তুটি পাওয়া যাইতেছে, তাহা 'নিষেধ'। শুনক (কুকুর) নিহত হইয়াছে কিন্তু সিংহ আসিযাছে, অতএব, হে ব্রাহ্মণ, লতাকুঞ্জে তোমার আসা আর নিরাপদ নয়—ইহাই ধ্বনি। এখানে 'বস্তু' হইতে 'বস্তু' ধ্বনিত হইয়াছে, কারণ বিধি ও নিষেধ বিভিন্ন বস্তু (দ্রষ্টব্য লোচন টীকা, ১।৫)

[খ] গোবিন্দলাল · রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন। সেই সময়ে ভ্রমর একটি লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

—এখানে বাচ্যার্থ হইতে জানা যাইতেছে, গোবিন্দলাল জলমগ্ন রোহিণীকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহার মুখে ফুৎকার দিলেন, ঠিক তখনই ভ্রমর-বিড়াল-ঘটিত ঘটনাটি ঘটিল। বাচ্য বস্তু হইতে অনুরণনক্রমে ধ্বনিত হইয়াছে—**'ভ্রমরের আসন্ন সর্ব্বনাশ'**। বাচ্য ঘটনা হইতে ইঙ্গিতটিই এখানে প্রধান।

[গ] নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই। —মধুসূদন

—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাইবার প্রাক্কালে মেঘনাদের প্রতি রাণী মন্দোদরীর উক্তি : উক্তিটির মধ্যে রহিয়াছে 'নয়নের তারা' রূপক। কিন্তু এই রূপক অলঙ্কারটিকে গৌণ করিয়া মন্দোদরীর অজ্ঞাতসারেই প্রধানভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে **মেঘনাদের মৃত্যুরূপ বস্তুধ্বনি**। এখানে অলঙ্কার হইতে বস্তুর ব্যঞ্জনা।

(২) অলঙ্কারধ্বনি

'সাহিত্যের অলঙ্কার অধ্যায়ে আমরা বাচ্যালঙ্কারের অলঙ্কার্য্য হওয়ার যোগ্যতার আভাস দিয়াছি। বাচ্য বস্তু বা অলঙ্কার যখন নিজেদিগকে গৌণ করিয়া অলঙ্কারান্তরের ব্যঞ্জনা করে, তখন হয় **অলঙ্কার-ধ্বনি**। ধ্বনিতে অলঙ্কারের কোন লক্ষণ থাকে না, তাহা ব্যঞ্জিত হয়। আনন্দবর্দ্ধন বলেন, বাচ্যত্ব অবস্থায় যে সকল অলঙ্কার বাহিরের বস্তু হইয়া থাকে, ধ্বনির পর্য্যায়ে উন্নীত হইলে তাহাই—'পরাং ছায়াং যান্তি' অর্থাৎ তাহারাই 'কান্তিমাত্মরূপতাং-যান্তি' (অভিনবগুপ্ত)। বস্তুতঃ তখন অলঙ্কার আর অলঙ্কার থাকে না, তাহাই অলঙ্কার্য্য হইয়া উঠে। যথা,

[ক] দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥—কৃত্তিবাস

—বাচ্যার্থ এখানে অতি স্পষ্ট: এই বাচ্যার্থ হইতে অনুরণনক্রমে ধ্বনিত হইতেছে সূর্য্য, চন্দ্র, দীপ, নক্ষত্র হইতে সীতার উৎকর্ষ। ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হইতে অধিক মনোহর। ইহা বস্তু হইতে অনুস্বানসন্নিভ সংলক্ষ্যক্রম **অলঙ্কারধ্বনি**। ধ্বনিত অলঙ্কাবটি ব্যতিবেক।

[খ] তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেযে থাকি দূরে দূরে,
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।

—এখানে বাচ্যার্থ হইতে পাওয়া যাইতেছে একটি সমাসোক্তি অলঙ্কার: বাঁকা নদীতে নায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইযাছে। কিন্তু বাচ্য এই সমাসোক্তিটিই ব্যঞ্জিত করিতেছে একটি **ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনি**। 'তার চেয়ে'—অংশটি ইঙ্গিত করিতেছে, লোভ-কুটীল সংসার হইতে অনেক ভাল এই প্রকৃতি-সন্দর্শন।

[গ] মাঝে মাঝে দুই তীর বিদীর্ণ করিয়া ছোট ছোট নির্ঝর শিশুদিগের ন্যায় আকুল বাহু, চঞ্চল আবেগ ও কলকল শুভ্র হাস্য লইয়া নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। —রবীন্দ্রনাথ (রাজর্ষি)

—রাজা গোবিন্দমাণিক্য নির্ব্বাসিতভাবে চট্টগ্রামে আসিয়া পার্ব্বত্য নির্ঝরের শোভা দেখিতেছেন: আজ 'হাসি' নাই, 'তাতা' নাই: কিন্তু হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাদের স্মৃতি। আলোচ্য অংশে বাচ্য অলঙ্কার

একটি 'প্রতীপ' (প্রতীপে প্রসিদ্ধ উপমান প্রসিদ্ধ উপমেয়বৎ হয়); কিন্তু এই বাচ্য অলঙ্কার ব্যঞ্জিত করিতেছে **স্মরণোপমা ধ্বনি**: গোমতী নদীতীরে হাসি ও তাতাও যে এমনি নির্ঝরের মত খেলা করিত! বলা বাহুল্য ধ্বনিত অলঙ্কারটি বাচ্য অলঙ্কার হইতে সুন্দরতর।

অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি

(১) ভাবধ্বনি

অক্রমধ্বনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি—ইহাই ধ্বনিবাদীদের চরম মীমাংসা এবং রসধ্বনিই ধ্বনি-সম্রাট, তাহাই কাব্যের আত্মা। কিন্তু সব সময় কেবল রসাদিই ধ্বনি হয় না। রসের জন্যই কাব্য প্রাণবান্ একথা সত্য, তথাপি কোন কোন স্থলে ইহার প্রয়োজন অংশ অধিকতর চারুত্ববিশিষ্ট হয়। এইরূপ স্থলে যেখানে ব্যভিচারী ভাব (=সঞ্চারী) অতিশয় পুষ্ট হইয়া চমৎকারিত্ব অর্জ্জন করে, সেখানে হয় **ভাবধ্বনি**। ভাবধ্বনি অর্থ, ব্যঙ্গ্য-প্রধান ব্যভিচারী ভাব।[১]

অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, হর্ষ, আবেগ, বিষাদ, চিন্তা, ত্রাস বিতর্ক—প্রভৃতি তেত্রিশটি 'সঞ্চারী ভাব' স্বীকার করা হইয়াছে। ভাব-ধ্বনিতে ইহাদের যে-কোন একটি প্রধান ও চারুত্ববিশিষ্ট হয়। ইহাতে প্রধানতঃ ভাবটিরই আস্বাদন হইয়া থাকে। ইহাও অলক্ষ্যক্রম ধ্বনির পর্য্যায়ভুক্ত, কারণ ইহাতে বাচ্য হইতে ধ্বনির ক্রমটি লক্ষিত হয় না। উদাহরণ,—

[ক] দেবর্ষি যবে কহিলা এ কথা,
পিতার পার্শ্বে আনত আনন,
লীলাকমলের দলগুলি সব
পার্ব্বতী তখন করে গণন।

—উপরের কবিতাংশ কালিদাসের কুমারসম্ভবের 'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ' শ্লোকটির মুক্তানুবাদ। বাচ্যার্থ এখানে সুস্পষ্ট। দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন পিতা হিমরাজের নিকট শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন,

---

১ 'যদ্যপি চ রসেনৈব সর্ব্বং জীবতি কাব্যম্ তথাপি তস্য রসস্য একঘন চমৎকারাত্মনোঽপি কুতশ্চিদংশাৎ প্রযোজকীভূতাদ্, অধিকোঽসৌ চমৎকারো ভবতি। তত্র যদা কশ্চিদুদ্রিক্তাবস্থাং প্রতিপন্নো ব্যভিচারী চমৎকারাতিশয় প্রযোজকো ভবতি, তদা ভাবধ্বনিঃ' —লোচনটীকা, ২।২

তখন পার্ব্বতী অধোমুখে হস্তধৃত লীলাকমল গণনা করিতে লাগিলেন। বাচ্যার্থ হইতেই ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাইতেছে পার্ব্বতীর অনুরাগজনিত '**লজ্জা**'র **ভাব**। আচার্য্য অতুল গুপ্ত ইহাকে '**পূর্ব্বরাগের লজ্জা**'র ব্যঞ্জনা বলিয়াছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহাকে বলিয়াছেন 'অবহিত্থা ভাবধ্বনি'। মূল রস নয়, ব্যভিচারী ভাবটিরই এখানে চমৎকারিত্ব—তাই ইহা ভাবধ্বনি।

[খ] মেহেরউন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' —বঙ্কিমচন্দ্র

—মতিবিবি মেহেরউন্নিসার নিকট যুবরাজ সেলিমের ভারত সিংহাসন-প্রাপ্তির সংবাদ দেওয়ায় মেহেরউন্নিসা এই উক্তি করিতেছেন। উক্তিটির আপাতনৈরাশ্যের মধ্য দিয়া সেলিমের প্রতি মেহেরউন্নিসার **অনুরাগের স্মৃতি** ধ্বনিত হইয়াছে: 'স্মৃতি' একটি ব্যভিচারী ভাব—'নিশ্বাস ত্যাগ' —তাহার অনুভাব।

[গ] উমা এলো বাহির দুয়ারে
কোলে করি ত্বরা করি জিজ্ঞাসি উমারে,
'আমার শিব তো আছেন ভাল?'
উমা বলে, 'আছেন ভাল'—চোখে দেয় অঞ্চল
বলে, 'চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?'

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

—উমা মায়ের কাছে আসিযাছেন, শিব আসেন নাই। শিবকে ছাড়িয়া থাকিতে উমার কষ্ট হয়। মায়েব প্রশ্নে শিবের প্রসঙ্গে উমার মধ্যে বিরহ-জনিত '**বিষাদ**' (বেদনা) ধ্বনিত হইয়াছে। 'বিষাদ' ব্যভিচারী ভাব: 'জামায়ের প্রসঙ্গ' বিভাব, অনুভাব 'চোখের জল'। ভাবধ্বনির চমৎকারিত্ব সহজেই অনুমেয়। ভাবটির মূলে অবশ্য রহিয়াছে 'রতি'—কিন্তু তাহা ধ্বনিতে পরিণত হয় নাই। 'বিষাদ'-বেদনাই এখানে ধ্বনি। মায়ের নিকট লজ্জায় চোখের জল গোপন করিবার প্রয়াস, ভাবটিকে আরও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে।

(২) রসধ্বনি

সাধারণভাবে 'ধ্বনি'কে কাব্যের আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়া রসধ্বনিই যে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি, আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত নানাভাবে

তাহা প্রকাশ করিয়াছেন : ('রসধ্বনেঃ এব সর্ব্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বম্'—লোচনটীকা)। আনন্দময় চর্ব্বনা দ্বারা যাহা আস্বাদিত হয়, তাহাই রস। এই রসই ধ্বনি এবং ইহাই কাব্যের আত্মা। পূর্ব্বে যে সকল ধ্বনির ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, রসধ্বনিতেই তাহাদের পর্য্যবসান। বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনিও রসে পর্য্যবসিত হয়। রসরূপ এই ধ্বনি কি?—যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অলক্ষ্যক্রম হইয়া সাক্ষাৎভাবে রসকে জাগায়, সেখানে **রসধ্বনি**। কাব্যের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী (ব্যভিচারী) ভাবের সংযোগে চিত্তে স্থায়ী ভাবের যে আনন্দময়ী প্রতীতি হয়, তাহাই রস। রসধ্বনিতে বাচ্যার্থ হইতে সোজাসুজি ব্যঙ্গ্যার্থরূপ রস প্রতীত হয়। যথা,

[ক] রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥ —চণ্ডীদাস

—এখানে কৃষ্ণ আলম্বন বিভাব : মেঘ উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব হইতেছে রাধিকার বিরলে বসিয়া থাকা, ধ্যান-নেত্রে মেঘের পানে তাকানো ইত্যাদি। সঞ্চারী ভাব—চিন্তা ও আবেগ। স্থায়ী ভাব রতি : রতি পূর্ব্বরাগজনিত। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবের সংযোগে স্থাযী 'রতি'ই এখানে শৃঙ্গার নামক আস্বাদ্যমান রসে অভিব্যক্ত হইযাছে। অতএব এখানে ধ্বনি—**বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসধ্বনি**।

[খ] অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,
'ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে।' —মধুসূদন

—'মেঘনাদ' আলম্বন বিভাব; অনুভাব প্রলাপোচ্ছ্বাস; ব্যভিচারী ভাব 'স্মৃতি ও বিষাদ'; ইহাদের সংযোগে স্থায়ী শোকের অভিব্যক্তি **করুণ রসধ্বনি**।

[পরবর্ত্তী 'রস' অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে; এজন্য এখানে বেশি উদাহরণ দেওয়া হইল না।]

ধ্বনিবাদমতে কাব্যের বিভাগ

ধ্বনির স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করিয়া আচার্য্যগণ যাবতীয় কবিকর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। কোন প্রকার রচনাই তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহাদের মতে কাব্য দুই প্রকারের—(১) ব্যঙ্গ্য ও (২) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য : ইহা ছাড়া যে রচনা তাহা (৩) চিত্র :

'ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রাধান্যে **ধ্বনি** সংজ্ঞিতকাব্যপ্রকারঃ গুণভাগে তু **গুণীভূত ব্যঙ্গ্যতা**। ততোঽন্যৎ রসভাবাদি তাৎপর্যরহিতং ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ-শক্তিশূন্যং চ কাব্যং কেবল বাচ্যবাচকবৈচিত্র্য-মাত্রাশ্রয়েণোপনিবদ্ধ-মালেখ্যং যদা ভাসতে তৎ **চিত্রম্**।—ধ্বন্যালোক বৃত্তি ৩।৪২।

আমরা ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এখন সংক্ষেপে গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্রের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

গুণীভূত ব্যঙ্গ্য

ধ্বনিবাদে শব্দের দুইটি অর্থ প্রধানভাবে স্বীকৃত হইয়াছে—বাচ্য ও প্রতীয়মান। প্রতীয়মান অর্থই ব্যঙ্গ্য। যেখানে এই প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্য, তাহা ধ্বনির বিষয়, প্রতীয়মান অর্থ (ব্যঙ্গ্য) অপ্রধান হইলে, তাহা হয় **গুণীভূতব্যঙ্গ্য**।

বস্তু, অলঙ্কার, রস—তিনটি ব্যাপারেই ব্যঙ্গ্য গৌণ বা গুণীভূত হইয়া থাকিতে পারে। ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য লইয়া কথা। কাব্যে ব্যঙ্গ্য আছে, অথচ তাহা অপ্রধান—এইরূপ হইলে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হয় : তাই গুণীভূত ব্যঙ্গ্যও কাব্য। অনেক কাব্য আছে, যাহা ধ্বনি-প্রধান নয়, অথচ তাহাও কোন কোন দিক হইতে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহার কারণ, তাহাতেও ধ্বনি থাকে, কিন্তু অপ্রধান ভাবে। ধ্বনির স্পর্শ আছে এই জন্যই সাধারণ বস্তুও অলঙ্কার ও কাব্য হইয়া উঠে। অভিনবগুপ্ত বলেন, গুণীভূত ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারতার মর্ম্মস্বরূপ। রূপক, নিদর্শনা, তুল্যযোগিতা —প্রভৃতি ঔপম্যগর্ভ অলঙ্কারের সাদৃশ্যধর্ম্ম তো ব্যঙ্গ্যদ্বারাই অনুভূত হয়; সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, সঙ্কর প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কারও যে অতিশয় শোভাশালিনী হয়, গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের স্পর্শই তাহার কারণ। ব্যঙ্গ্য যেন স্পর্শমণি, ইহা লোহাকেও সোনা করিয়া তুলে। নিম্নে গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

[ক]   কি আমার সাধু রে!

—উক্তিটির মধ্যে রহিয়াছে একটি ‘কাকু’: ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে একটি ব্যঙ্গ্যার্থ—‘সাধুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ’। কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত এই ধ্বনিটি প্রধান হয় নাই, মূল অলঙ্কারেরই অঙ্গীভূত হইয়া আছে। ইহা গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। তেমনই,—

[খ]   ‘চলনে খঞ্জন নাচে, বলনে কুকিলা’   —পল্লীগাথা

—এখানে ‘অতিশয়োক্তি’ দ্বারা একটি নায়িকার রূপ-বর্ণনাই বাচ্য: ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাইতেছে একটি উপমাধ্বনি—নায়িকার চলন খঞ্জনের মত চঞ্চল, ভাষণ কোকিলের মত মধুর। কিন্তু এই উপমাধ্বনি এখানে অপ্রধান, বাচ্যের মধ্যেই ইহা অবসিত, অতএব গুণীভূত ব্যঙ্গ্য।

[গ] ‘বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মতো সেই আয়তলোচনার চঞ্চল দৃষ্টি,
সে কি হরিণীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, না হরিণীরাই তার কাছ
থেকে গ্রহণ করেছে, তা সংশয়ের কথা।’   —(‘অনুবাদ—অতুল গুপ্ত)

—এখানে ব্যঙ্গ্যটি হইতেছে উপমা: যৌবনারূঢ়া নায়িকার দৃষ্টি হরিণীর মত চঞ্চল; কিন্তু বাচ্যার্থ হইতে পাওয়া যাইতেছে—একটি সন্দেহ অলঙ্কার। বাচ্য ‘সন্দেহ’—ব্যঙ্গ্য ‘উপমা’। কিন্তু এই ব্যঞ্জনা ধ্বনি হইয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ শ্লোকটির সৌন্দর্য্য বাচ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এইভাবে গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধার করা যাইতে পারে। গুণীভূত ব্যঙ্গ্যে বাচ্য অনেক সময় এত উৎকর্ষ লাভ করে যে, প্রকৃত ধ্বনি হইতে তাহাকে পৃথক করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। এস্থলে অতি সাবধানে ধ্বনিকাব্য ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্যের পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক। গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য কাব্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায় কাব্য ও কবি-প্রতিভার অনন্ততাই স্বীকৃত হইয়াছে।

চিত্র

চিত্রকে কবি-কর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইলেও, ইহাকে ধ্বনিবাদীরা কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে রচনা রসভাবাদি তাৎপর্য্যরহিত, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে শক্তিশূন্য—যাহা কেবল বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়, তাহাই চিত্র। তাহা কাব্য নহে, প্রাণহীন আলেখ্যমাত্র।

আচার্য্য অভিনবগুপ্তের খর রসনা চিত্রের প্রতি অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এইরূপ রচনাকে কোথাও বলিয়াছেন, 'ক-চ-ট-ত-পাদিবৎ' অর্থাৎ একেবারে অর্থহীন, কোথাও বলিযাছেন—'দশদাড়িমবৎ' অর্থাৎ যাহাতে প্রত্যেকটি শব্দ ব্যষ্টিগতভাবে অর্থযুক্ত, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অর্থহীন : কোথাও বা ইহা 'দধি, গুড়, মরিচেব সামঞ্জস্যহীন সংযোগ'।

চিত্রের দুইটি প্রকারভেদ দেখা যায় : কোথাও ইহা শুষ্ক শব্দচিত্র, কোথাও বা নিষ্প্রাণ বাচ্যার্থের বিবৃতিমাত্র। যখন কোন কবি ইচ্ছা করিয়াই রস-সৃষ্টির দিকে মনোভিনিবেশ না করিয়া বস্তু বা অলঙ্কার সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দেন তখনই চিত্রের সৃষ্টি হয়। আবাব অক্ষম, বিশৃঙ্খলবাক্ ব্যর্থ অনুকরণকারীর কাব্যসৃষ্টির প্রযাস হইতেও চিত্রের সৃষ্টি হয়। মোটের উপর চিত্র সর্ব্বত্রই রসাদিশূন্য এবং নিষ্প্রাণ। যেমন,

[ক] শঙ্করী সুরেশী শুভঙ্করী সর্ব্বানী সর্ব্বেশ্বরী সুরশরণী।
শিশু শশধর শিরসুশোভিনী,
শরণাগত সাধকজনে সকল সম্পদ-দায়িনী॥ —রঘুনাথ দেওয়ান

—অনুপ্রাসের ছডাছডি। ইহা কি চাটু, না স্তুতি? ধ্বনিবাদীরা বলিবেন, ইহা চিত্র।

অতিরিক্ত নীতি প্রচাবেব ইচ্ছাবশেও এইরূপ চিত্র সৃষ্টি হয়। যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' : অপ্রস্তুত প্রশংসা বা অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কাবে [illegible]ও একেবারে প্রাণহীন :

[খ] মন্ যদি যথা তথা সদা করে গতি
বৃথা তবে মুনিনাম নির্জ্জনে বসতি।
যে গৃহীব বিভুপদে সদা মন রয
প্রকৃত নির্জ্জনবাসী মুনি সে নিশ্চয। —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

বস্তুতঃ রসসৃষ্টি কবির লক্ষ্য হইলেই রচনা কাব্য হয়; নচেৎ তাহা প্রাণবর্জ্জিত, মুখ্যবস্তুর প্রতিকৃতিমাত্রই হইয়া থাকে। বাঙলা দেশের কবিওয়ালা বা পাঁচালিকারদের রচনা হইতে 'চিত্রে'র অসংখ্য উদাহরণ সমাহৃত হইতে পারে।

ধ্বনিবাদের আচার্য্যবৃন্দ কবি-কর্ম্মকে স্থূলভাবে কিরূপ ভাগ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত তালিকা-চিত্রটি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে : ইহাদ্বারা আমাদের বক্তব্যের সারাংশও সূচিত হইবে :—

২
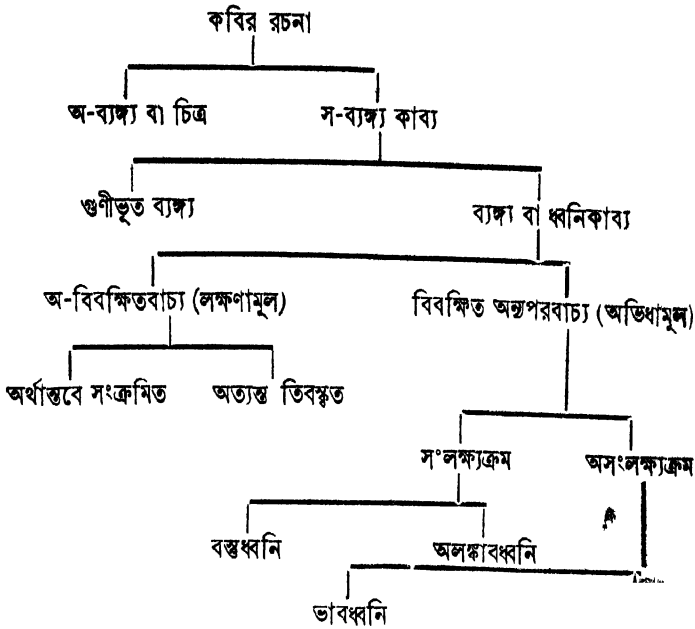
রস

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—ইহাই ভারতীয় আলঙ্কারিকদের চরম মীমাংসা। এই রস কি? রসের উপাদানই বা কি? কিভাবে রসনিষ্পত্তি হয়? রসাস্বাদ বলিতেই বা কি বুঝায়? এই সকল প্রশ্ন লইয়া আলঙ্কারিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের অবধি নাই। এক একজনের মত এক একখানি মহাভারতসদৃশ, মতবিরোধও পর্ব্বতপ্রমাণ। আমরা অতি সংক্ষেপে রসের স্বরূপ, উপাদান, রসনিষ্পত্তি ও রসাস্বাদের বিষয় আলোচনা করিতেছি। বলা বাহুল্য আমাদের এই আলোচনা 'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ'—এই বাক্যতুল্য।

রসের স্বরূপ

রস কি? ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে বলিতে হয়, রস একপ্রকার আস্বাদন। যাহা আস্বাদ্য তাহাই 'রস'। বস্তুগত অর্থ করিলে 'রস'-এর মানে হয় 'নির্য্যাস'—যেমন, মধুর, অম্ল, তিক্ত ইত্যাদি। (সাহিত্যের 'রস' বলিতেও সাহিত্যের নির্য্যাসই বুঝায়: কিন্তু নির্য্যাস তো স্বাদনীয়। এই 'স্বাদ'ই রস। সাহিত্যের 'রস' মানে সাহিত্যের 'স্বাদ'।)

কিন্তু এই স্বাদ ঠিক বস্তুজগতের মধুর, অম্ল কটু-রসের স্বাদ নয়। বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা হয় একটি বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়া: 'রসনা' সেই ইন্দ্রিয়। সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদিত হয় অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া, সহৃদয়জনের চিত্ত সাহিত্য-রসের আস্বাদক। আর সাহিত্যরসের স্বাদটি স্থূল স্বাদও নয়—ইহা 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'—পরমাত্মার আস্বাদতুল্য। অতএব ইহা অলৌকিক। রসাস্বাদজনিত আনন্দও লোকোত্তর। এইসব বিচার করিয়া আচার্য্য অভিনব গুপ্ত রসের এই সংজ্ঞাটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ' (লোচনটীকা, ১/৪): রস নিজের আনন্দময় সম্বিতের (চেতনার) আস্বাদরূপ: সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তে ইহা রস্যমান (আস্বাদ্যমান) হয় বলিয়া ইহার নাম 'রস'। ইহা একপ্রকার লোকোত্তর আনন্দঘন প্রতীতি।

রসের উপাদান

'রস' উৎপন্ন হয়, না অনুমিত হয়, না অভিব্যক্ত হয়—এই সকল প্রশ্ন লইয়া আলঙ্কারিকদের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। জটিলতা বর্জ্জন করিয়া যাহাতে জিনিষটি বোধগম্য হয়, আমরা সেইভাবেই অগ্রসর হইতেছি।

রস আস্বাদ্যমান। কয়েকটি প্রধান উপাদানের সংযোগে এই আস্বাদন সম্ভব হয়। স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব—রসের উপাদান।

(১) স্থায়ী ভাব

(মানুষের হৃদয়ে অসংখ্য 'ভাব' আছে। কখনও মানুষের হৃদয় প্রেমভাবে পূর্ণ হয়, কখনও হাসিতে উদ্বেল হয়, কখনও শোকে অধীর হয়, কখনও ক্রোধে অশান্ত হয়, কখনও বা উৎসাহে উদ্দীপিত হয়। এমনই করিয়া কখনও হৃদয়ে ভয় জাগে, কখনও জাগে ঘৃণা, কখনও বিস্ময়, কখনও বা শমভাব। আরও অনেক ভাব আছে, যেমন—চিন্তা, মোহ, হর্ষ, আবেগ ইত্যাদি। যুগের অগ্রগতির সহিত নূতন নূতন ভাবেরও উদ্ভব হয়, আবার এক যুগের ভাব অন্য যুগে লুপ্ত হইয়া যায়।) হৃদয়-সমুদ্রে ভাব যেন সংখ্যাহীন ঊর্ম্মি—তাহা গণনা করে কাহার সাধ্য? মানুষ এই ভাবের প্রতিমূর্ত্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অসংখ্য সংস্কার (ভাব) মানুষের চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করে।

এই অসংখ্যকোটি ভাবের মধ্যে কতকগুলি ভাব আবার চিরন্তন: তাহারা অক্ষয়, অক্ষর, অব্যয়। তাহাদের উদয় নাই, ব্যয় নাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চিরন্তন সংস্কাররূপে ইহা বর্ত্তমান থাকে। পণ্ডিতেরা এই উদয়বিলয়-বিহীন শাশ্বত ভাবগুলিকেই বলেন **স্থায়ী ভাব**:

> অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
> আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ)

—অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ অন্য কোন ভাব যাহাকে আচ্ছাদন করিতে পারে না, যাহা রসাস্বাদ অঙ্কুরের মূল, তাহাই স্থায়ী ভাব বলিয়া অভিহিত।

বস্তুতঃ স্থায়ী ভাবই ভাবগুলির সম্রাট, ইহারাই ভাবসমূহের গুরু ('যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যানাঞ্চ যথা গুরুঃ')। অসংখ্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে ইহাদের বিশিষ্ট রূপ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, এই স্থায়ী ভাবগুলিই রসরূপে আস্বাদিত হয়: 'স চ রসো রসীকরণ যোগ্যঃ।'

(অভিনবগুপ্ত) ; ইহাই 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ' রসাঙ্কুরের মূল উপাদান। অসংখ্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে স্থায়ী ভাব মাত্র নয়টি :

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ॥ (সাহিত্যদর্পণ)

—রতি (মনের অনুকূল প্রেমার্দ্র ভাব), হাস (বিকৃত ভাবহেতু মনের স্ফুরণ), শোক (প্রিয়নাশ হেতু মনের বৈক্লব্য), ক্রোধ (প্রতিকূল বিষয়ে উগ্রতার ভাব), উৎসাহ (কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদ্যম), ভয় (ভীতির ভাব), জুগুপ্সা (ঘৃণার ভাব), বিস্ময় (অলৌকিক বিষযে চিত্তের বিস্ফারিত ভাব) এবং শম (বিষয়-পরাঙ্মুখতা হেতু আত্মায় মনের বিশ্রামজনিত সুখ)—এই নয়টি স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাবগুলিই যথোপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী (ব্যভিচারী) ভাবের সংযোগে যথাক্রমে এই সকল আস্বাদ্যমান রসে পরিণত হয়,—

শৃঙ্গার হাস্যকরুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।

বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ)

—অর্থাৎ এক একটি স্থায়ী এক একটি রসে রূপান্তরিত হয়। স্থায়ীর রস-পরিণাম এইরূপ :—রতি-ভাব > শৃঙ্গার রস ; হাস > হাস্যরস ; শোক-ভাব > করুণরস ; ক্রোধ > রৌদ্ররস ; উৎসাহ > বীররস ; ভয় > ভয়ানক রস ; জুগুপ্সা > বীভৎস রস ; বিস্ময় > অদ্ভুত রস ; শমভাব > শান্ত রস।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রসের মূল উপাদান স্থায়ী ভাব : স্থায়ী ভাবই রসে অভিব্যক্ত হয়। এই রসাভিব্যক্তির কার্য্যে আবার কারণস্বরূপ হয় আর তিনটি উপাদান **বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী (ব্যভিচারী) ভাব।**

(২) বিভাব

আমরা বাহ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা বহির্বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে অনুভব করি। বহির্বস্তুর সান্নিধ্যেই মনোভাব জাগ্রত হয়। একটি ফুল দেখিলে আমাদের মনে আনন্দ হয়, একটি সাপ দেখিলে ভয়ে অভিভূত হই, কাহারও দুঃখ দেখিলে মনে শোকভাব জাগে। অন্তরের ভাবোদ্বোধনের কারণ এই বহির্বিশ্বের কোন-না-কোন পদার্থ। লৌকিক জগতে যাহা রতি-হাস-শোক প্রভৃতি ভাবোদ্বোধনের কারণ, কাব্যে-সাহিত্যে নিবেশিত হইলে তাহার নাম হয় **বিভাব** : 'রত্যাদ্যুদ্বোধকাঃ লোকে বিভাবাঃ কাব্য নাট্যয়োঃ' (বিশ্বনাথ)।

মনে রাখিতে হইবে, লৌকিক জগতের অনুভূতির কারণ স্থূল বাহ্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা কাব্যের বিষয় নয়। কাব্যের যাবতীয় অনুভূতি মানস-ব্যাপার, তাহার সহিত প্রত্যক্ষাদি ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই: ইহা অলৌকিক। কাব্যের জগৎ অলৌকিক আস্বাদের জগৎ। এইজন্য ইহাদের অনুভূতি স্বতন্ত্র, নামগুলিও স্বতন্ত্র। লৌকিক জগতের 'কারণ'—কাব্যজগতের 'বিভাব'। অভিনবগুপ্ত বলেন, 'অলৌকিক এব বিভাবাদি ব্যবহারঃ। যদাহ—বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ লোকে কারণমেব অভিধীয়তে, ন বিভাবঃ' (লোচনটীকা, ১।১৮): লৌকিক জ্ঞানের উপায়কে 'কারণ' বলে, বিশিষ্ট জ্ঞানের উপায়কে বলে 'বিভাব'। বিভাব দুই প্রকার—(১) আলম্বন বিভাব ও (২) উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন বিভাব: মুখ্যভাবে যে বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া রসের উদ্গম হয়, তাহাকে বলে আলম্বন বিভাব। শৃঙ্গার রস বিষয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে রসেব প্রথম অঙ্কুর দেখা দেয়, তাহাতে নায়িকা বা নায়ক অন্যোন্যের আলম্বন বিভাব:

[ক] আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক বেলা॥ —বিদ্যাপতি

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি: কামিনী রাধার রূপ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে শৃঙ্গার রসের প্রথম অঙ্কুর দেখা দিযাছে: এখানে 'কামিনী' (রাধা) আলম্বন বিভাব।

[খ] সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি। —মধুসূদন

চণ্ডীর দেউল-দ্বারে ভীষণ-দর্শন মহাদেবকে দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত হইতেছেন: হৃদয়ে যুগপৎ রৌদ্র ও ভয়ানক রসের অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে; ইহার প্রধান অবলম্বন 'ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি' (মহাদেব)। উহাই আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাব: যে সকল বস্তু রসকে উদ্দীপিত করে, তাহা উদ্দীপন বিভাব: উদ্দীপন বিভাব রসাঙ্কুর উদ্গমের মুখ্য কারণ নহে, আলম্বন বিভাবই মুখ্য। আলম্বনে যে রসের অঙ্কুর উদ্গত হয়, উদ্দীপন তাহাকে স্ফুটতর করে। 'চন্দ্র-চন্দন-কোকিলালাপ-ঝঙ্কারাদয়ঃ' কিংবা বসন্ত, বর্ষাসমাগম প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। উদাহরণ,—

[ক] এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥ —বিদ্যাপতি

এখানে উদ্দীপন বিভাব 'ভরা বাদর' ও 'মাহ ভাদর'; ইহারাই রাধিকার বিরহ রতিকে উদ্দীপিত করিতেছে : আলম্বন বিভাব 'কৃষ্ণ' অনুপস্থিত।

[খ] সুনীল আকাশে ওই শশী দেখি
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী ? —গোবিন্দ চৌধুরী

এখানে 'শশিমুখী' (উমা) আলম্বন বিভাব ; 'শশী'—উদ্দীপন বিভাব।

(৩) অনুভাব

হৃদয়ে কোন ভাবের উদয় হইলে বাহিরে তাহার প্রকাশ হয় : শোক উপস্থিত হইলে চোখে 'অশ্রু' দেখা দেয়, ক্রোধভাব জাগ্রত হইলে চক্ষু 'আরক্ত' হইয়া উঠে। এই যে ভাব-বিকারের বহিঃপ্রকাশ, কাব্যে নিবেশিত হইলে তাহাকে বলা হয় **অনুভাব**। বিভাব হইল ভাবোদ্গমের কারণ, অনুভাব হইল সেই কারণের ক্রিয়া। বিশ্বনাথ বলেন,

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ)

—লৌকিক জগতের ভাবের বহিঃপ্রকাশ (কার্য্য) কাব্যজগতে 'অনুভাব' বলিয়া কথিত হয়। অনুভাবও বিভাবের মতই অলৌকিক, 'অনুভাবোঽপ্যলৌকিক এব। যদয়মনুভাবয়তি বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয়স্তস্মাদনুভাবঃ' (লোচন টীকা, ১।১৭)

ভাব অনুযায়ী অনুভাবের ক্রিয়াগুলি পৃথক পৃথক হয় : রত্যাদিভাবের অনুভাব প্রসিদ্ধ আটটি সাত্ত্বিক ভাব :

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

আমরা বাঙলা সাহিত্য হইতে অনুভাবের দৃষ্টান্ত দিতেছি—

[ক] প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ ভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শকতি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার।
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥

দুই নেত্রে বহি **অশ্রু** বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা দুই ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে **কম্প** উঠে যেন জলধি তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু **ভূমেতে পড়িল**। —চৈতন্যচরিতামৃত

—মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-রতির অত্যাশ্চর্য্য বিকার এই অনুভাবগুলি,—স্তম্ভ, রোমোদ্গম, প্রস্বেদ ইত্যাদি।

[খ] **হস্ত প্রসারণ করিয়া** জ্ঞানানন্দ কহিলেন, 'এ বাহুতে কি বল নাই?' **বক্ষে করাঘাত করিয়া** কহিলেন, 'এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?' —বঙ্কিমচন্দ্র

—'হস্ত প্রসারণ', 'বক্ষে করাঘাত' প্রভৃতি কার্য্যগুলি এখানে উৎসাহ ভাব-প্রকাশক অনুভাব।

[গ] শিবুবাবু **চোখ রাঙা করিয়া** কহিলেন 'গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব, ভেবে পাই না। —শরৎচন্দ্র

—'রাঙাচোখ' ক্রোধের অনুভাব।

(৪) ব্যভিচারী (সঞ্চারী) ভাব

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ ভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি। মনুষ্য-হৃদয়ে যে কত অসংখ্য কোটি ভাব আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাবগুলির মধ্যে যে ভাবগুলি 'ভাবস্থির', চিরন্তন-আলঙ্কারিকগণ তাহাদিগকে বলিয়াছেন স্থায়ী ভাব, অন্যান্য ভাব ব্যভিচারী। আলঙ্কারিকদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে ভাব স্থায়ীর অভিমুখে সঞ্চরণ করে, স্থায়ী ভাবের মধ্যেই যাহার উদয় ও বিলয়, তাহাই **ব্যভিচারী ভাব**:

'বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িনি উন্মগ্ননিমগ্নাঃ॥ —সাহিত্য-দর্পণ

অনেকেই ব্যভিচারী ভাবের এই লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম—এই নয়টি মাত্র স্থায়ী ভাব: অন্যান্য যাবতীয় ভাব ব্যভিচারী। স্থায়ী ভাবগুলিই মুখ্য চিত্তবৃত্তি: তাহারাই রসে রূপান্তরিত হয়। ব্যভিচারী ভাব রসে রূপান্তরিত হয় না—উহারা স্থায়ীকে পরিপুষ্ট করে মাত্র। ব্যভিচারী ভাব সর্ব্বথা পরতন্ত্র অর্থাৎ স্থায়ীর অধীন; স্থায়ীতেই উহাদের উদয়, স্থিতি ও বিলয় ('স্থায়িনি উন্মগ্ননিমগ্নাঃ')। ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা তেত্রিশ

('ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ') : নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিরোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, আশঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক। এই সঞ্চারী ভাবগুলি স্থায়ীর মুখাপেক্ষী থাকিয়া এবং তাহাদের সহকারী হইয়া রসনিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

কিন্তু ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাবের এই অঙ্গাঙ্গী (অঙ্গ ও অঙ্গী) ভাব অনেকেই স্বীকার করেন না। স্থায়ীই মাত্র প্রধান, ব্যভিচারী অপ্রধান—এই বিভাগ তাঁহারা অযৌক্তিক বলিযা মনে করেন। কারণ, এমনও অনেক সময় দেখা যায়, একই কাব্যে যখন একাধিক রস থাকে, তখন একটি রস প্রধান হয়, অন্যান্য রস তাহার অধীন হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্যান্য রস (ভাব) তখন সেই রসের (ভাবের) ব্যভিচারীর কাজ করে। স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাব সম্পর্কে এই বিতর্কের সমাধান কবিযাছেন আচার্য্য অভিনবগুপ্ত। তিনি বলেন, স্থায়ী দ্বারাই সঞ্চারী বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়, একথা খুবই সত্য : ব্যভিচারী ভাবগুলি স্থায়ীর সূত্রে গ্রথিত স্ফটিক খণ্ডেব মত। স্থায়ী যেন মালার সূত্র ('স্রকৃসূত্রকল্প স্থায়ী')—এই সূত্রের রঙেই ব্যভিচারী ভাব অনুরঞ্জিত হয়, তথাপি স্থায়ী ভাব 'অঙ্গী' এবং ব্যভিচারী তাহার 'অঙ্গ'—এ বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয় ('ন তু রসানাং স্থায়িসঞ্চারিভাবেন অঙ্গাঙ্গিতা যুক্তা'—লোচনটীকা, ৩।২৪)। কোন কোন স্থলে রস-চর্ব্বনা হইতেও ব্যভিচারী ভাবের আস্বাদন অধিকতর মধুর হয়। সে স্থলে ব্যভিচারী ভাব অতিশয় পুষ্ট হইয়া চমৎকৃতির কারণ হইয়া উঠে; যেখানে ধ্বনি ভাবধ্বনি, সেখানে স্থায়ী হইতেও ব্যভিচারীর চমৎকারিত্ব বেশি (দ্রষ্টব্য—লোচন-টীকা, ধ্বন্যালোক, ২।২)। অতএব একটিকে অঙ্গী, অপরটীকে অঙ্গ না বলিয়া বলা চলে, পরস্পর পরস্পরের উপকারী। স্থায়ীর রঙেই ব্যভিচারী অনুরঞ্জিত হয়, আবার এই অনুরঞ্জিত রঙে ব্যভিচারী স্থায়ীকেও অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। ইহাই স্থায়ী ও ব্যভিচারীর প্রকৃত সম্পর্ক।

কিন্তু রসনিষ্পত্তিতে ব্যভিচারী যে স্থায়ীরই অধীন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এ স্থলে ব্যভিচারী বিভাব-অনুভাবের মতই রসের উপাদান। পার্থক্য এই যে বিভাব-অনুভাব রসাভিব্যক্তির বাহ্য উপাদান, ব্যভিচারী তাহার আন্তর উপাদান। স্থায়ীর (মুখ্যচিত্তবৃত্তির) অধীন ও সহকারী

হইয়া ব্যভিচারী সেখানে অশেষ বৈচিত্র্য সম্পাদন করে এবং সর্ব্বথা রসের পুষ্টি-সাধক হইয়া বিরাজ করে। উদাহরণ-স্বরূপ চণ্ডীদাসের এই পদটিকেই যদি ধরা যায়,—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশাস সঘন
কদম্বকাননে চায়॥

—এখানে মূল স্থায়ী ভাব রাধিকার পূর্ব্বরাগমূলক 'রতি', রসপরিণাম বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। স্থায়ী রতিকে কত না বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে—'চপলতা', 'ঔৎসুক্য', 'আবেগ'—এই ব্যভিচারী ভাবগুলি। স্থায়ী রতি-সমুদ্র হইতেই এই ব্যভিচারী-তরঙ্গগুলি উত্থিত হইয়া স্থায়ীর অভিমুখেই মনকে চালিত করিতেছে। রসনিষ্পত্তিতে ইহাই ব্যভিচারীর উপযোগিতা।

রসস্থষ্টির কৌশল

রসের উপাদান কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে। এখন কি কৌশলে বা প্রক্রিয়ায় রস-নিষ্পত্তি হয়, তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে। কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন, তাহাতে তিনি রসসৃষ্টিতেই অভিনিবিষ্টমনা হন: রসাত্মক বাক্য-দ্বারাই কাব্য রচিত হয়। রসের উপাদানগুলির যথাযথ সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন,—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥

—সামাজিকগণের (সচেতসাম্) রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব—বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের দ্বারা প্রকটিত (ব্যক্ত) হইয়া রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ স্থায়িরূপ মুখ্যচিত্তবৃত্তি উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সংযোগে রসে রূপান্তরিত হয়।

কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ: কবি শব্দার্থসম্পদদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এ সৃষ্টিক্রিয়ায় বাস্তব জগৎকে তিনি অস্বীকার করেন না। মানুষের মুখ্য চিত্তবৃত্তিই রসরূপতা লাভ করে। শুধু তাই নয়, রসোদ্বোধক কারণ ও কার্য্যগুলিও বাস্তব কার্য্য ও কারণের উপর নির্ভর করে। বাস্তব জগতের ভাব, সেই ভাবোদ্বোধনের কারণ ও কার্য্য কবিদ্বারা শব্দে

সমর্পিত হইয়া, কবি-বর্ণিত ব্যভিচারীদ্বারা বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া রসাত্মক কাব্যে পরিণত হয়। শব্দে সমর্পিত হইয়াই লৌকিক ব্যাপার অলৌকিক হইয়া উঠে।

কাব্যের বিভাব, অনুভাব—সব কিছুই অলৌকিক। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে কাতর বাল্মীকি মুনির মুখ হইতে যে অপূর্ব্ব 'মা নিষাদ' শ্লোক নির্গত হইয়াছিল, বাস্তব শোক-করুণ ঘটনাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন তাহা কাব্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন কিন্তু আর তাহা বাস্তব শোক নয়, তখন তাহা অলৌকিক। তখন তাহা লৌকিক শোক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুনির বাস্তব শোক তাঁহার নিজের হৃদয়ে অলৌকিক শোকে (স্থায়ীতে) পরিণত হইয়াছে। সেই শোক উপযুক্ত বিভাব (প্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চী), অনুভাব (ক্রৌঞ্চীর করুণ ক্রন্দন), সঞ্চারী (মুনির বিষাদ, আবেগ) ইত্যাদির সহযোগে অলৌকিক করুণ রসে রূপান্তরিত হইয়া মুনি-হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছে। আস্বাদনযোগ্য সেই করুণ-রস 'মা নিষাদ' শ্লোকরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহাই রসসৃষ্টির ক্রম ও কৌশল।

ধ্বনিবাদের আচার্য্যগণও রসাভিব্যক্তিতে এই ক্রম ও প্রক্রিয়াকে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা: ধ্বনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি আবার রসধ্বনি ('রসধ্বনেঃ এব সর্ব্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বম্')। এই রস-ধ্বনি কিরূপে ধ্বনিত হয় বা রসধ্বনি কি? আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন,

> রসধ্বনিস্তু স এব যোঽত্র মুখ্যতয়া বিভাবানুভাব-
> ব্যভিচারিসংযোজনোদিত স্থায়িপ্রতিপত্তিকস্য প্রতিপত্তুঃ
> স্থায়্যংশ চর্বণা প্রযুক্ত এব আস্বাদপ্রকর্ষঃ। —লোচনটীকা, ২/৪

বিভিন্ন রসের উদাহরণ

উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও স্থায়ী ভাবের সংযোগে কিভাবে রস বা রসধ্বনি হয়, কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট করা যাইতেছে:—

[ক] কালিয় বরণ হিরণ-পিন্ধন যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া সব সখী জনে জনে॥ —চণ্ডীদাস

আলম্বন বিভাব—কৃষ্ণ; উদ্দীপন বিভাব—কৃষ্ণের 'কালিয় বরণ ও হিরণ-পিন্ধন'; অনুভাব—'মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে'; ব্যভিচারী ভাব—স্মৃতি, আবেগ।

ইহাদের সংযোগে স্থায়ী 'রতি'—'শৃঙ্গার'রসে রূপান্তরিত হইয়াছে : ধ্বনি বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার।

[খ] ঈশান। বাবু খাবার এসেছে।
বৈকুণ্ঠ। তাকে একটু বসতে বল!
ঈশান। বসতে বলব কাকে? খাবার এসেছে। —রবীন্দ্রনাথ

'বৈকুণ্ঠ' বাবুই এখানে আলম্বন বিভাব : অনুভাব—বৈকুণ্ঠ বাবুর অসঙ্গত উক্তি ; এখানে ব্যভিচারী ভাব—বিতর্ক : ইহাদের সংযোগে হাস্যরস-নিষ্পত্তি হইয়াছে।

[গ] করুণ ক্রন্দন রোল উত-উত উতরোল
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে,
হেরিলেন রক্তমাখা, মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্নপাখা
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে। —বিহারীলাল

বিভাব—ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী : অনুভাব—'করুণ ক্রন্দন রোল' : ব্যভিচারী ভাব– বিষাদ (বিহ্বলতা) : ইহাদের সংযোগে স্থায়ী শোকের সুস্পষ্ট ধ্বনি করুণরস।

[ঘ 'এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ',—কহিলা সরোষে
রাবণ, 'এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?··
কে তোরে রক্ষিবে পামর, আজি?' —মধুসূদন

– এখানে স্থায়ী ভাব ক্রোধ : আলম্বন বিভাব—শত্রু লক্ষ্মণ : অনুভাব—লক্ষ্মণের প্রতি 'তর্জ্জন' ব্যভিচারী ভাব মদ ও উগ্রতা। আস্বাদ্যমান রস—রৌদ্র।

[ঙ] সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি!' —মধুসূদন

—এখানে আলম্বন বিভাব—শত্রু রঘুকুলমণি রাম : অনুভাব—স্ব-পরাক্রম ঘোষণা : ব্যভিচারী ভাব—গর্ব্ব ও মতি (কর্ত্তব্যনিশ্চয়) : ইহাদের সংযোগে স্থায়ী ভাব উৎসাহের বীররস রূপে অভিব্যক্তি।

[চ] পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি।
বিদ্যুৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী॥ —রবীন্দ্রনাথ

—কালবৈশাখীর মেঘ—আলম্বন বিভাব: 'পিঙ্গল আভাস', 'রাঙাইছে আঁখি'—অনুভাব: 'ত্রাস', (দিক্‌প্রেক্ষণ=পলায়ন) ও উৎকণ্ঠা ব্যভিচারী ভাব: ইহাদের সংযোগে **ভয়ানক** রস নিষ্পত্তি হইয়াছে।

[ছ] 'তথায় পেতিনী, দানা খাইছে সখের খানা
একখানা পচা ঠ্যাং নিয়া।
পোকা তাহে মুড়ি প্রায় বিজবিজ করে তায়
আগে তাই খাইছে বাছিয়া॥'

—'পেতিনী, দানা'—আলম্বন বিভাব: তাহাদের 'পচা ঠ্যাং খাওয়া' প্রভৃতি কর্ম্ম অনুভাব: ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই 'থুৎকার' ইচ্ছা জাগে—ইহাই ব্যভিচারী ভাব। ইহাদের সংযোগে স্থায়ী জুগুপ্সা (ঘৃণার ভাব) **বীভৎস** রসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

[জ] যোজনেক প্রমাণ গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥…
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কামিনী উগারে যে যথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥ —কবিকঙ্কণ

—কালিদহের জলে ধনপতি সওদাগর 'কমলেকামিনী' দর্শন করিতেছেন। আলম্বন বিভাব 'পদ্মিনী রামা' (কমলে কামিনী): অনুভাব—গজগ্রাস ও গজ-উদ্গারণ: ব্যভিচারী—বিতর্ক ও ত্রাস: স্থায়ী ভাব 'বিস্ময়': **অদ্ভুত** রস।

[ঝ] মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

—আলম্বন বিভাব—মাধব : মাধবের দয়া—অনুভাব : স্মরণ, মতি ইত্যাদি ব্যভিচারী ভাব : ইহাদের সংযোগে শম ('নিঃশেষে আত্মসমর্পণ') ভাব শান্তরসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, বহু ভাবের মধ্যে কেবল নয়টি ভাব স্থায়ী বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়—উহা অনেকের মনঃপূত হয় নাই (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৬৯)। 'বৎসলতা'কেও কেহ কেহ স্থায়ীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ 'প্রেমভক্তি'কেই একমাত্র স্থায়ী ভাব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'প্রীতিভাব'কে মানবচিত্তের একটি গূঢ় ভাবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতিশয় চমৎকারিত্বহেতু অলঙ্কারশাস্ত্রে 'বাৎসল্য' দশম রস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সন্তানস্নেহ এই রসের স্থায়ী ভাব—পুত্রাদি ইহার আলম্বন বিভাব ; তাহার চেষ্টা, বিদ্যাশৌর্য্যাদি গুণ উদ্দীপন বিভাব ; সন্তানাঙ্গ আলিঙ্গন, শিরশ্চুম্বন, দর্শন, পুলকানন্দ, বাষ্পাশ্রু এই রসের অনুভাব : ব্যভিচারী ভাব—অনিষ্টাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব ইত্যাদি। যথা,—

[এ] এলো গিরি নন্দিনী লয়ে, সুমঙ্গল ধ্বনি ওই শুন গো রাণি।…
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী॥
আঙ্গিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি উমা মুখ শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥ —কমলাকান্ত

শাক্ত পদাবলীতে মেনকার মিলন-বাৎসল্যের একটি অপূর্ব্ব চিত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগেই স্থায়ী ভাব আস্বাদ্যমান রসরূপতা লাভ করে। সকল অঙ্গ উপস্থিত থাকিলেই পূর্ণাঙ্গ রসের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু তাই বলিয়া দুই একটি অঙ্গ অনুপস্থিত থাকিলেই যে রসপ্রতীতি হইবে না, তাহা বলা চলে না।

'রস-নিষ্পত্তির মূল কথা ভাবের অতিসম্পন্নতা'—ভাবকে অতিসম্পন্ন করিবার জন্যই উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের আবশ্যকতা। অভিধ্যেয় রসে অর্থাৎ কাব্য রসে দুই একটি অঙ্গের দুর্ব্বলতা বা অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও যদি ভাব-শাবল্য থাকে, তাহা হইলে তাহার রসপ্রতীতি অসিদ্ধ হইবে না। অভিধ্যেয় রস বলিতে বুঝায় সেই রস, 'যে রস অভিধ্যান অর্থাৎ বিশেষ চিন্তন করিয়া আস্বাদন করিতে হয় ; স্থায়ী

ভাবের বহিঃপ্রকাশ কার্য্য স্বয় বলিয়া অভিনীত হইতে পারে না, কাব্য পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা অভিধ্যানের সাহায্যে জ্ঞান-গোচরতা প্রাপ্ত হয়; ইহাই বিশিষ্ট কাব্যরস' (কাব্যালোক, দ্বিতীয় অধ্যায়)। বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের রসও অভিধ্যেয় রস। আধুনিক গীতিকবিতার প্রাচুর্য্যের যুগে কবিতার রস-নির্ণয়ে এই কথাটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, 'অভিধ্যেয রস বাহ্যতঃ বিকলাঙ্গ হইলেও কার্য্যতঃ পূর্ণাঙ্গ।'

রসাস্বাদের রহস্য

কবির রচনাকুশলতায় এই যে রসাত্মক কাব্য রচিত হয়, ইহার আস্বাদের রহস্য কি? কাহার চিত্তে রসবোধ হয়? কে-ই বা ইহার আস্বাদক? কি ভাবেই বা রসপ্রতীতি হয়?—এই প্রশ্নগুলি লইয়া আলঙ্কারিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। ভরতাচার্য্য সংক্ষেপে রসসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'। এই ভরত-বাক্যটিই বিভিন্ন রস-ভাষ্যের ভিত্তি। এই মহাবাক্যটিকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ জীবন-দর্শনের আলোকে এক একজন আলঙ্কারিক ইহার এক এক-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে রসভাষ্য হিসাবে (১) ভট্ট লোল্লটের **উৎপত্তিবাদ**, (২) ভট্ট শঙ্কুকের **অনুমিতিবাদ**, (৩) ভট্ট নায়কের **ভুক্তিবাদ** এবং (৪) আচার্য্য অভিনবগুপ্তের **অভিব্যক্তিবাদ** বিখ্যাত। আচার্য্য অভিনব গুপ্তের রসসিদ্ধান্তই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। উহাই ভারতীয় রস-প্রতীতির চরম মীমাংসা। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সহিতও পরিচয় থাকা আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

(১) ভট্ট লোল্লট মনে করেন, রস উৎপন্ন হয়। শকুন্তলা নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, আদৌ রস (শৃঙ্গাররস) রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়েই উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকৃত রসবোধ তাঁহারই। শকুন্তলা-রূপ আলম্বন বিভাব, তাঁহার ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষাদি অনুভাব—রাজার হৃদয়েই ব্যভিচারিসংযোগে শৃঙ্গার-রস উৎপন্ন করিয়াছে। অভিনয়কালে নটনটীর অভিনয় দর্শনে সামাজিকগণের (দর্শকগণের) হৃদয়ে নটনটীতে ঐতিহাসিক শকুন্তলার প্রতি রতিমান দুষ্মন্তের অভেদবোধ জন্মে। এই বোধটি অনুমান নয়, **সাক্ষাৎকার**; এই সাক্ষাৎকার

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গম্য নয়, তাই ইহা অলৌকিক। নটে আরোপিত রতির এই অলৌকিক সাক্ষাৎকারমূলক বোধটিই সামাজিক দর্শকের হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। সামাজিকের দিক হইতে রসের বোধটি একান্তই গৌণ, প্রকৃত আস্বাদক ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত--তাঁহার চিত্তেই রসনিষ্পত্তি (রসোৎপত্তি) হইয়াছে। ইহাই ভট্ট লোল্লটের উৎপত্তিবাদের চুম্বক।

(২) ভট্ট শঙ্কুকের রস-মীমাংসা **অনুমিতিবাদ** বলিয়া পরিচিত। তিনি মনে করেন, কাব্য-নাট্যের রসাস্বাদ ঐতিহাসিক দুষ্যন্তের নয়, সহৃদয় সামাজিকের: 'সহৃদয় কর্তৃক স্থায়ীর অনুমানই রসানুভূতি'।

ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

যখন অভিনয় হয়, তখন সামাজিক দর্শক নাটকের কুশীলবে স্থায়ী রতির অনুমান করিয়া থাকেন। অবশ্য অভিনেতাতে স্থায়ীর বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু অভিনয়কালে নটগত বিভাব অনুভাবাদি এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করে, যাহার ফলে অভিনেতাতেই দুষ্যন্তবোধ জন্মে। এই বোধ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, আরোপও নয়—ইহা **অনুমান**। অভিনয়গত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সংযোগে—'অভিনেতা দুষ্যন্তই শকুন্তলার প্রতি রতিমান'—সামাজিক হৃদয়ে এই অনুমান হয়, ইহা হইতেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে: 'রসেরনুমিতিরেব রসনিষ্পত্তিঃ'।

(৩) ভট্ট নায়ক রসনিষ্পত্তি বিষয়ে উৎপত্তিবাদ বা অনুমিতিবাদ কোনটিকেই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা নূতন, ইহা **ভুক্তিবাদ** বলিয়া বিখ্যাত। তিনি মনে করেন, বিভাবাদির সংযোগে ভোজ্য-ভোজক সংসর্গে শৃঙ্গারাদি রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

ভট্ট নায়কের ভুক্তিবাদে কবি ও সামাজিক উভয়েরই স্ব স্ব ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন, কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে দুইটি বিশেষ ব্যাপার ঘটে—**ভাবকত্ব** ও **ভোজকত্ব**।

'ভাবকত্ব' ব্যাপারটি কবির এবং 'ভোজকত্ব' সহৃদয়ের। 'ভাবকত্ব' অভিধা হইতে এক স্বতন্ত্র ব্যাপার: ইহাদ্বারা বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদিত হয়।[১] অর্থাৎ 'শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্ত রতিমান'--এই বিষয়টি এমনভাবে কাব্যে নিবেশিত হয় যে, ইহার বিভাবাদি এক নির্বিশেষ সাধারণ রূপ ধারণ করে। ইহাদ্বারা শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের

'ভাবকত্ব'

১। 'শব্দশাদভিধা বিলক্ষণৈব ত্রৈচ্ছেৎ ভাবকত্বং নাম রসান্ প্রতি যৎ কাব্যস্য তদ্বিভাবাদিনাং সাধারণত্বাপাদানং নাম'—ভট্ট নায়ক।

ব্যক্তিগত রতি তত্তৎ বিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সর্ব্বসাধারণের হইয়া উঠে। ইহাই 'ভাবকত্ব'। ইহা শ্রোতা বা দর্শকের সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ লুপ্ত করিয়া দেয় এবং হৃদয়কে রসাস্বাদনের যোগ্য করিয়া তুলে।

ইহার পরে ঘটে দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ সহৃদয়ের 'ভোগ': ইহাই ভট্ট নায়কের মতে 'ভোজকত্ব'। ইহা সম্পূর্ণরূপে সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার।

ভোজকত্ব

'রসভাবনা' দ্বারা সহৃদয়ের এমন একটি ক্ষমতা জন্মে, যাহাতে তিনি অতি সহজে ভাবিত নির্ব্বিশেষের আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হন। এই যে 'ভোগ' – ইহা অনুভব নয়, স্মরণও নয় —ইহা 'পর-ব্রহ্মাস্বাদসবিধঃ'। তামসিক ও রাজসিক আবরণ অপসৃত হইলে জ্ঞানী বা যোগী যেমন ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া পরমানন্দ হইয়া যান, 'ভোজকত্ব' দ্বারা সহৃদয়ও তেমনই স্বচৈতন্যে অবস্থিত হইয়া অলৌকিক আনন্দে বিশ্রান্তি লাভ করেন। রসাস্বাদ– পরিপূর্ণ আনন্দের আস্বাদ: ইহাতে হৃদয় বিগলিত, বিস্তৃত ও বিকশিত হয় ('ভোগঃ···দ্রুতি-বিস্তর-বিকাশাত্মা')।

[ভট্ট নায়কের 'ভুক্তিবাদ' সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যদর্শন বলিতে বর্ত্তমানে আমরা কপিল-প্রণীত প্রকৃতি-প্রধান সাংখ্যদর্শনই বুঝি। আদৌ সাংখ্যদর্শন ছিল বেদান্ত দর্শনেরই নামান্তর। 'ব্রাহ্মীস্থিতিঃ'—ইহার লক্ষ্য, উপায় 'জ্ঞান-যোগ' ('জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্'—গীতা)। জীব (পুরুষ) ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন: অবিদ্যা (প্রকৃতি) দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় জীবের অহংবোধ হয়, জীব সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণের অধীন হইয়া থাকে এবং জীবই যে জ্ঞানস্বরূপ—এই বোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবেকোদয়ে অবিদ্যা অপসৃত হয়—ক্রমে রজঃ ও তমোগুণের অপসারণে সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষে পরম ঐক্যবোধ জন্মে: তখন পুরুষের এক আনন্দঘন অবস্থা—স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি: ইহাই 'ব্রহ্মাস্বাদ'। ভট্ট নায়কও বলেন, 'ভাবকত্ব' দ্বারা সহৃদয়ের রজঃ ও তমঃ অপসারিত হয়। কাব্যগত বিভাবাদি সহৃদয়কে 'স্বরূপাবস্থানের' স্তরে উন্নীত করে এবং তিনি সকলের সহিত একাত্ম হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। এই অবস্থায় উন্নীত হইলেই 'ভোগ' (ব্রহ্মাস্বাদ) হয়: ইহা শুদ্ধান্তঃকরণ চিত্তের লোকোত্তর আনন্দে বিশ্রান্তি ('দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্']

(৪) আচার্য্য অভিনবগুপ্ত যে রসসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা 'অভিব্যক্তি-বাদ' বলিয়া বিখ্যাত। ভট্ট নায়কের মতকে কোন কোন স্থলে খণ্ডন করিলেও, তাঁহার রস মীমাংসায়, ভট্ট নায়কের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। ভট্ট নায়ক রসনিষ্পত্তি বিষয়ে 'ভাবনা' ও 'ভোগীকৃতি' নামে যে দুইটি অতিরিক্ত অপ্রসিদ্ধ ব্যাপার কল্পনা করিয়াছেন, আচার্য্য অভিনবগুপ্ত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাহাদের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া রস-নিষ্পত্তির চরম মীমাংসা করিয়াছেন। গুপ্তাচার্য্যের রসসিদ্ধান্তই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

অভিনবগুপ্ত যে রসসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার সকল রহস্য একটি সুন্দর সুগঠিত সমাস-বাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। ধ্বন্যালোক-লোচনে (১।৪) তিনি যে রসের সংজ্ঞাটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই রসাভিব্যক্তির মূল কথা নিহিত আছে। সংজ্ঞাটি এইরূপ

> শব্দসমর্প্যমাণ-হৃদয় সংবাদ সুন্দর-বিভাবানুভাব সমুচিত-
> প্রাগ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগ সুকুমার-স্বসংবিদানন্দ
> চর্ব্বণাব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ।

—এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ইঙ্গিত রহিয়াছে, অনুবাদ-মুখী ব্যাখ্যায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে

(ক) লৌকিক ভাবের কারণ ও কার্য্য কবি-গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হইয়া সকল হৃদয়ে সম্বাদী সুন্দর বিভাব ও অনুভাবাদি রূপ প্রাপ্ত হয়,

(খ) এই সকল বিভাব-অনুভাবই সহৃদয়ের অন্তর্বর্ত্তিত পূর্ব্বসংস্কাররূপ বাসনাকে উদ্বুদ্ধ করে,

(গ) প্রাগ্‌নিবিষ্ট এই বাসনাদ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া সহৃদয়ের স্ব-সংবিদ্ (=আত্মচৈতন্য) আনন্দময় সৌকুমার্য্য লাভ করে,

(ঘ) এই বাসনানুরঞ্জিত আনন্দময় সংবিৎ-এর যে চর্ব্বণা, তাহাই রসনীয় (আস্বাদরূপ) রস।

এই রস-সূত্রে গুপ্তাচার্য্য কাব্যরচনায় ও রসাস্বাদনে কবি ও সহৃদয়ের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি কাব্য রচনা করেন, সহৃদয় তাহার আস্বাদন করেন। সহৃদয়-হৃদয়ে আস্বাদরূপ প্রতীতিই রস। 'প্রতীয়মান এব হি রসঃ। প্রতীতিরেব বিশিষ্টা রসনা।' ভট্ট নায়কের 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব'কে তিনি গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু উহাদিগকেই প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত বলেন, ভট্ট নায়ক যাহাকে 'ভাবকত্ব'

বলিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিবাদীদের ব্যঞ্জনা-ব্যাপারই। 'ভাবনা' বলিয়া কোন বৃত্তি নাই, ব্যঞ্জনাবৃত্তি বলেই শব্দার্থ বাচ্যকে গৌণ করিয়া প্রতীয়মান অর্থের দ্যোতনা করে। কবি শব্দদ্বারা রসানুযায়ী যে বিভাব ও অনুভাব গঠন করেন, তাহাতেই **'সাধারণীকরণ'** সম্পাদিত হয়। অভিনবগুপ্ত ইহাকে বলেন **'হৃদয় সংবাদ'**। শব্দে সমর্পিত হইলেই, লৌকিক কারণ ও কার্য্য একটি সাধারণ রূপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই হয় কাব্যের বিভাব ও অনুভাব। বিভাব, অনুভাব যেমন কবির বর্ণনায় সাধারণ রূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনই লৌকিক 'রতি' প্রভৃতি আন্তর ভাবও সাধারণরূপ প্রাপ্ত হইয়া পাঠকের চিত্তে অভিব্যক্ত হয়। ইহার ফলেই কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের সহিত পাঠকের হৃদয়-সম্মিলন ঘটে। **সংবাদ** (সমবাদ = সাধর্ম্ম্য)-সূত্রে সহৃদয় পাঠক কাব্য-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার সহিত একাত্ম হইয়া যান। ইহাকে **তন্ময়ীভবনও** বলে।

'তন্ময়ীভবন'-এর পশ্চাতে একটি নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা 'বাসনা'র উদ্বোধন। স্মৃতি ও সংস্কাররূপ চিত্তবৃত্তিই **বাসনা**। জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও ইহা মানব-হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে। কাব্য-বর্ণিত বিভাবাদি দ্বারা এই বাসনা উদ্বোধিত হয়। ইহার ফলেই কাব্যের সহিত পাঠকের হৃদয়-সংবাদ ঘটে : ইহাই তন্ময়তা। সহৃদয় ব্যক্তিই সহজে তন্ময় হন। সহৃদয়ের বাসনা-লোক অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অভিনবগুপ্ত বলেন, (লোচনটীকা, ১।১)

> যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে
> বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।

—কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যে সকল পাঠকের চিত্তবৃত্তি মুকুরের মত স্বচ্ছতা লাভ করিয়া বর্ণনীয় বিভাবাদির সহিত একাত্ম হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহারাই **সহৃদয়**। এই জন্যই কাব্যপাঠে সহৃদয়ের বাসনা অতি সহজে জাগ্রত হয় এবং তিনি কাব্য-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার ভাবে তন্ময় হইয়া পড়েন।

ইহার পরেই আসে 'ভোগ'এর কথা। অভিনবগুপ্ত বলেন, ভট্ট নায়ক-বর্ণিত 'ভোগীকরণ'ও কাব্যাত্মক রসের বিষয়। ধ্বনন ব্যাপার ছাড়া উহা অতিরিক্ত কিছু নয় ('রস্যমানতোদিত চমৎকার অনতিরিক্তত্বাৎ ভোগস্যেতি')। কাব্য-বর্ণিত বিভাবাদি দ্বারা যে বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা সহৃদয়ের স্ব-সংবিৎকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাহাকে অতিশয় সুকুমার করিয়া তুলে। **এই বাসনানুরঞ্জিত সংবিৎরূপ আনন্দের চর্ব্বণাই রস্যমান (আস্বাদ্যমান) রস।**

অভিনবগুপ্তের মোট বক্তব্য এই যে: সামাজিক-চিত্তে যে সকল স্থায়ী ভাব অনভিব্যক্ত থাকে, কাব্য-বর্ণিত বিভাবাদি দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হয়: এই অভিব্যক্ত স্থায়ীর আস্বাদনই (প্রতীতি) রস। আস্বাদটি অলৌকিক এবং আনন্দঘন।

[অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' শৈব তান্ত্রিক দর্শন (প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যের (সংবিৎ-এর) অভিব্যক্তিই এই দর্শনের মূল কথা। পরম শিব সচ্চিদানন্দ; শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া ইহা সতত পরিস্পন্দমান। শিব ও শক্তি অভিন্ন। স্পন্দনের মধ্য দিয়াই শক্তির প্রকাশ। এই স্পন্দনই নাদ (ধ্বনি)। সৃষ্টি নাদময়ী। সুসূক্ষ্ম নাদ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাশ্রয়ে বিশ্বে অভিব্যক্ত হয়। শব্দ ব্রহ্ম এই নাদেরই বিশিষ্ট রূপ: জীবদেহেও এই নাদের লীলা। ইহা তথায় পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী রূপে প্রকাশিত হইতেছে। পরানাদ কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে জীবদেহে অবস্থান করিতেছেন। নাদ এখানে কুণ্ডলীকৃত অর্থাৎ জটপাকানো। ইহার কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আবরণ। এই নাদরূপিণী কুণ্ডলী শক্তির উদ্বোধন অনুসন্ধান, তাঁহার স্বরূপ ও বিশেষরূপ উপলব্ধি করাই সাধনার লক্ষ্য। শুদ্ধ চৈতন্য ঘন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন জন্যই স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। নানারূপ মলদ্বারা চৈতন্য আচ্ছাদিত। সাধন-শক্তিতে এই মল অপসারিত হয়, ক্রমে ক্রমে জীব-হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণের মত হইতে থাকে এবং পরিশেষে ইহাতে চৈতন্যস্বরূপ নাদ-এর প্রকাশ হয়; তখন জীব আনন্দময় হইয়া যায়।]

ধ্বনিবাদীরা সংবিদানন্দের অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন কাব্য-জগতে। কাব্যের 'ধ্বনি' সেই নাদ। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা এই ধ্বনির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, তাহার স্বরূপ আস্বাদন করাই ধ্বনিবাদের লক্ষ্য। কবি-বর্ণিত বিভাবাদি সহৃদয়ের হৃদয়-মল অপসারিত করে: ক্রমে মোহাচ্ছন্নতা দূরীভূত হইয়া যায়, হৃদয় দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়। এই বিশদীভূত মনোমুকুরে তখন সংবিৎ-এর প্রকাশ ঘটে। এ সংবিৎ আনন্দ-স্বরূপ: রসধ্বনিই সেই সংবিদানন্দ। উহার চর্বণা বা আস্বাদনই রসাস্বাদ। এই ভাবে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের ভিত্তিতে ধ্বনিবাদিগণ দেখাইয়াছেন, আনন্দস্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তিই কাব্য। আবার এই কাব্যই ঘন মোহান্ধকার রূপ আবরণের উন্মোচক—ইহার মধ্যেই সহৃদয়ের

লোকোত্তর আনন্দে বিশ্রান্তি। কাব্যের রসাস্বাদ—ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর, ইহা চিত্তের অলৌকিক বিগলন-বিস্তার-বিকাশাত্মক। তবে পার্থক্য এই যে, যোগীর ব্রহ্মাস্বাদ শুদ্ধ সংবিদের আস্বাদ আর সহৃদয়ের রসাস্বাদ বিভাবানুরঞ্জিত সংবিদের আস্বাদ।

আচার্য্য বিশ্বনাথের বাক্যেও রসাস্বাদের এই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বাক্য দ্বারাই রসাস্বাদ রহস্যের ইঙ্গিত প্রদান করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করা যাইতেছে:

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তর চমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ —সাহিত্যদর্পণ

—কাব্যের বিভাবানুভাবাদি দ্বারা সামাজিক-হৃদয়ে সত্ত্ব উদ্রিক্ত হয় অর্থাৎ রজঃ ও তমোমল অপসারিত হওয়ায় হৃদয় সাধারণীকৃত হইয়া বিগলিত হয়: এই অবস্থায় রস নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া আস্বাদিত হয়। এই যে রস, ইহা অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময়, জ্ঞানঘন (চিন্ময়), অন্য বেদ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য এবং ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য; অলৌকিক চমৎকৃতি ইহার প্রাণস্বরূপ। ইহাই রসাস্বাদের নিগূঢ় তত্ত্ব।

শব্দ-নির্ঘণ্ট

গ্রন্থ-পঞ্জী

=এই পুস্তক রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অবলম্বিত হইয়াছে=

Poetics—Aristotle (Translation by E. S. Bouchier)

Essays in Criticism—Matthew Arnold.

The story of Philosophy—Will Durant.

English Composition and Rhetoric—Alexander Bain

The Principles of Criticism—Worsfold

Judgment in Literature—Worsfold

An Introduction to the study of Literature—Hudson

কাব্যাদর্শ—দণ্ডী (নৃসিংহদেব শাস্ত্রী কৃত টীকা)

ধ্বন্যালোক ও লোচন—শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য-দর্পণ—বিশ্বনাথ (শ্রীমজ্জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত টীকা)

অলঙ্কার কৌস্তুভ—কবি কর্ণপূর

ছন্দোমঞ্জরী—মহামহোপাধ্যায় রামতারণ শিরোমণি সম্পাদিত

ছন্দোমঞ্জরী—শ্রীরামধন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ সম্পাদিত

শব্দ কল্পদ্রুম—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সম্পাদিত

প্রপঞ্চসার তন্ত্র—আর্থার এভেলন সম্পাদিত

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরি

সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধুসূদনের জীবন চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু

মধুসূদন কাব্য পরিচয়—দীননাথ সান্ন্যাল

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

কাব্য জিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুল গুপ্ত

কাব্যালোক—ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

কাব্যশ্রী—ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

অলঙ্কার চন্দ্রিকা—অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী
সমালোচনা-সংগ্রহ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত
সমালোচনা সাহিত্য—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য বিচার—মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
কল্লোল যুগ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ইশারা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার
বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র সেন
ছন্দোবিজ্ঞান—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য
বাংলা ছন্দ—অধ্যাপক শ্রীগৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাষা বিজ্ঞান—শ্রীদুর্গাচরণ সান্ন্যাল
ভাষার ইতিবৃত্ত—ডাঃ সুকুমার সেন
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—আচার্য্য দীনেশ চন্দ্র সেন
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়, ৩য়)—ডাঃ সুকুমার সেন
সঙ্কীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাস
সঙ্গীত-সার সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)—বঙ্গবাসী সংস্করণ
সাহিত্য মীমাংসা—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য